আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনমূলক বয়ান সংকলন

ইসলাহী মাজালিস

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

শাইখুল ইসলাম
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনমূলক বয়ান সংকলন

ইসলাহী মাজালিস

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদীআরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহাতমিম : জামি'আ দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ [তৃতীয় খণ্ড]

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
মুহাদ্দিস : টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা, গাজীপুর

অনুবাদ [চতুর্থ খণ্ড]

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

মুদাররিস : মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব : আফতাবউদ্দীন জামে মসজিদ, পল্লবী, ঢাকা
সহ-সম্পাদক : মাসিক আল কাউসার, ঢাকা

ইসলাহী মাজালিস

মূল ঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদকমণ্ডলী
মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ
মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মুমতায লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৮৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

তৃতীয় মুদ্রণ : জুলাই, ২০১১ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ, ২০১০ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল, ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-70250-0013-1

মূল্য : তিনশত ষাট টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইনতেসাব

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা ছাহেব রহ. যিনি বাহ্যিক আকার-আকৃতি,
পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা ও আভ্যন্তরীণ চরিত্র
তথা বাতেনী আখলাকসহ সর্বক্ষেত্রে হযরত থানভী রহ.-এর সাথে
সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

যিনি স্বীয় শায়খের তা'লীম ও তারবিয়াতকে আত্মস্থ করে তার সংক্ষিপ্তসার
বিস্ময়কর দু'খানা কিতাব [কামালাতে আশরাফিয়া ও আনফাসে ঈসা]
সংকলন করে উম্মতের জন্য রাহনুমায়ীর ব্যবস্থা করে গেছেন।
যা থেকে অসংখ্য মানুষ যুগ যুগ ধরে সত্যিকারের
মানুষরূপে গড়ে উঠার পাথেয় সংগ্রহ করছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি তাঁকে আপনার রহমতের ধারায় সিক্ত করুন।
এবং আমাদেরকে তাঁর রেখে যাওয়া এ কিতাব দু'খানা থেকে উপকৃত
হয়ে আপনার সন্তুষ্টি লাভ করার তাওফীক দান করুন।
আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন। — প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আমাদের বর্তমান গ্রন্থ 'ইসলাহী মাজালিস' যে মহান ব্যক্তিত্বের বয়ানের সংকলিতরূপ, তিনি হলেন বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যুগসচেতন আলেম শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম।

হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী 'মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ'-এর দাস্তারবন্দি মাহফিলে যোগদানের জন্য ৫ দিনের এক সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে তাশরীফ এনেছিলেন। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহপাকের বিশেষ মেহেরবানী ও বন্ধুবর শামছুল আরেফীন খালেদের ব্যবস্থাপনায় এ সময়টা হযরতের সোহবতে কাটানোর তাওফীক হয়েছে। হযরতের এ সামান্য কয়েক দিনের প্রায় সার্বক্ষণিক সাহচর্য আমাকে যে কিরূপ উপকৃত করেছে তা আমি লিখে প্রকাশ করতে অক্ষম। ১৩ ফেব্রুয়ারী দুপুরে হযরত ঢাকায় পৌঁছে বসুন্ধরা মারকায মসজিদে জুমুআর নামাযে ইমামতী করেন। আছর নামাযের পর হযরত প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী হাটতে বের হন। হযরতের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ তাঁকে হাটার জন্য একটি বিখ্যাত উদ্যানে নিয়ে যান। সেখানে মাগরিব নামাযের সময় হলে ময়দানের চাদর বিছিয়ে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা নামাযে শরীক হলাম। হযরত নিজে নামায পড়ালেন। নামায শেষে সালাম-মোসাফাহা করলাম। হযরত পরিচয় জানতে চাইলে শাহেদ ভাই আমার বিস্তারিত পরিচয় দিলেন এবং সাথে সাথে এ কথাও বললেন, আপনার রচিত কিতাব সমূহের বাংলা অনুবাদ যে প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বাধিক হয়েছে এবং যে প্রতিষ্ঠান দ্বীনী কিতাব-পত্রকে আধুনিক আঙ্গিকে প্রকাশ করে থাকে সেই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল আশরাফ'-এর স্বত্বাধিকারী। হযরত খুব দু'আ দিলেন। আমি সুযোগ পেয়ে বললাম, হযরত! 'ইসলাহী মাজালিস'-এর পুরো ছয় খণ্ডের অনুবাদ শেষ হয়েছে এবং প্রথম খণ্ড ছাপা হয়ে আজ বাঁধাইয়ের কাজ হচ্ছে। আগামীকাল হযরতের হাতে তাঁর মোড়ক উন্মোচন করা হবে ইনশাআল্লাহ!। এ কথা শুনে হযরত খুব দু'আ দিলেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর আমরা হোটেলে চলে আসলাম।

পরদিন সকাল দশটায় হোটেল শেরাটনের বলরুমে 'বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড' কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনারে হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম প্রধান

অতিথি ছিলেন। ঠিক দশটার কয়েক মিনিট আগে হযরতকে নিয়ে আমরা হোটেল শেরাটনে পৌঁছে গেলাম। সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে আমাদের আলেম সমাজের দুর্বলতা থাকলেও হযরতকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখলাম। ঠিক সোয়া দশটায় ইংরেজীতে হযরত বয়ান আরম্ভ করলেন। প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের দীর্ঘ অথচ সাবলীল বক্তৃতায় হযরত ইসলামের মৌলিক দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্পাক ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালনের ক্ষেত্রে নিজ মস্তিস্কপ্রসূত যুক্তিকে ত্যাগ করাই ইসলামের মূল দাবী। একদিকে যেমন যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের নারী ও শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয় খলীল হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে নিজ পুত্র হযরত ঈসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

হযরত বলেন, ইসলামী বিধানের সম্পর্ক কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের সাথেই নয় বরং ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক জীবনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রের সাথে ইসলামী বিধানের সম্পর্ক ...। আলোচনা শেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর হযরত দেন। সেমিনার শেষে হযরত হোটেলে ফিরে এসে জোহর নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের নিয়ে নিকটস্থ মসজিদে জোহর আদায় করলেন।

মাগরিব নামাযের সামান্য পূর্বে 'ইসলাহী মাজালিস'-এর বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ডের কিছু কপি আমার হাতে পৌঁছলো। মাগরিব নামাযে হযরত নিজে ইমামতী করলেন। সুন্নাত, অযীফা ইত্যাদি শেষ করার পর আমি সুদৃশ্য মোড়কযুক্ত এক কপি ইসলাহী মাজালিস হযরতের হাতে তুলে দিলাম, হযরত মোড়ক উন্মোচন করে ভালোমতো পাতা উল্টিয়ে দেখে কিতাবের বাংলা ভাষায় লেখা নাম পড়লেন এবং আমাদের সহযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অনেক কিছুই পড়ে ফেললেন। আমি পঁচিশ কপির একটি বান্ডিল হযরতের হাতে দিয়ে বললাম, হযরত! এ সকল কপি আপনার জন্য আনা হয়েছে, আপনি যাকে ইচ্ছা হাদিয়া হিসেবে দিতে পারেন। হযরত বললেন, এখনতো অনেক লোক, সবাইকেতো দেয়াও যাবে না। আবার কাউকে দিলে আর অন্যদেরকে না দিলে বিনা কারণে কতিপয় ব্যক্তিকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। কিতাবের বান্ডিলটি আমি হযরতের রুমে পৌঁছে দিলাম।

হযরত এদিন ইশার নামায ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরায় আদায় করে সেখানের মাহ্ফিলে বয়ান করলেন। বয়ানের মধ্যে কিতাব প্রকাশে হযরত যে খুশী হয়েছেন তা প্রকাশ পেলো, হযরত বয়ানের প্রায় পুরোটা জুড়েই উলামায়ে কেরামের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন, মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দ্বীনী কিতাব-পত্র রচনা ও

অনুবাদের গুরুত্বের কথা আলোচনা করলেন। শেষে বাংলাভাষার অতীতের বন্ধ্যত্ব দূর হয়ে বর্তমানে যে, দ্বীনী কিতাব-পত্র অত্যন্ত উন্নত ও আকর্ষণীয় আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বয়ানের শেষে হোটেলে ফিরে খানা খেয়ে ঘুমানোর পূর্বে হোটেলে অবস্থানরত সবাইকে হযরত নিজ দস্তখত সম্বলিত 'ইসলাহী মাজালিস-এর একটি করে কপি হাদিয়া দেন।

পরদিন সকালে ফজর নামাযের পরই আজীমপুর কবরস্থানে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের সাবেক খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক ছাহেব রহ.-এর কবর যিয়ারতের জন্য গমন করেন। এদিনই ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা সংলগ্ন ময়দানে উলামায়ে কেরামের এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দান করেন। এ বয়ানে হযরত উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পরদিন দুপুর বারটার ফ্লাইটে হযরতের সাথে আমরা সিলেট পৌঁছি। হযরতের সিলেট সফর উপলক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম হতে অনেক শাগরিদ ও ভক্ত সিলেট পৌঁছেন। বরাবরের মতো এবারও হযরতের মেহমানদারীর সৌভাগ্য সিলেটের দ্বীন ও উলামাভক্ত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুহিউস সুন্নাহ চৌধুরী রহ.-এর পরিবার লাভ করেন। বাদ মাগরিব দরগা মসজিদে উলামা ও তালাবাদের উদ্দেশ্যে হযরত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাখেন। এ বয়ানেও উলামায়ে কেরামের জন্য মাতৃভাষা চর্চার অপরিহার্যতার কথা বলেন। পরদিন সকাল ১১টায় হযরত হাদীসের দরস দান করেন। বাদ মাগরিব জনাব সুন্নাত চৌধুরী ছাহেবের বাসায় আগত মেহমান বিশেষত মহিলাদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন। ইশা নামাযান্তে হযরতকে নিয়ে আমরা রাত নটার ফ্লাইটে ঢাকা রওয়ানা হই। এ রাতেই ৩টায় হযরতের পাকিস্তানের ফ্লাইট বিধায় হোটেলে পৌঁছেই সফরের তৈরী আরম্ভ করেন। হযরত আমাকে পূর্বেই বলেছিলেন, বাংলায় অনূদিত হযরতের কিতাবসমূহের একটি করে কপি দিয়ে দিতে। অনূদিত সব কিতাব যোগাড় করার পর দেখা গেলো বিশাল এক কার্টুন হয়েছে। উপস্থিত সকল ছাত্র ও ভক্তদের নিকট হতে হযরত বিদায় নিয়ে রাত প্রায় দেড়টায় এয়ার পোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। দুইটায় আমরা সবাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, অশ্রু সজল চোখে হযরতকে বিদায় দিলাম। বিদায়ের পূর্বে হযরত বললেন, এখন থেকে প্রতি বছরই বাংলাদেশে আসার নিয়ত করেছি। এ কথা শুনে আমাদের ব্যথিত হৃদয় কিছুটা হলেও শান্তনা লাভ করলো।

এই কয়েক দিনের প্রায় সার্বক্ষণিক সাহচর্যে আমি গভীরভাবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করেছি তা হলো, হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম যা বলেন, যা লেখেন তার প্রায় সবটুকুর উপরই নিজে একশতভাগ আমল করেন। তাঁর উচ্চারণ ও আচরণ, তার ভেতর ও বাহিরের মাঝে আমি কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনি। তাঁকে আমার মনে হয়েছে বিনয় ও নম্রতা, ইখলাস ও নিষ্ঠা, ইলম ও আমলের এক জীবন্ত প্রতীক। আর এ জন্যই তাঁর বয়ানসমূহ ও রচনাবলী মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, আমলে অগ্রসর করে।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থ 'ইসলাহী মাজালিস' যেহেতু হযরতের মুখ নিঃসৃত আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনমূলক বয়ান সংকলন এ জন্য আমরা আশা করতে পারি এ কিতাবের পাঠক মাত্রেরই হৃদয় জগতে পরিবর্তন আনার জন্য এটি ইনশাআল্লাহ কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

এ কিতাবের ৩য় খণ্ড অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়ার সম্মানিত মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ। আলহামদু লিল্লাহ! পাঠক এ অনুবাদে ভিন্ন ধরনের স্বাদ অনুভব করবেন।

চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন, মাকতাবাতুল আশরাফের অধিকাংশ গ্রন্থের অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ছাহেব। মূলানুগ অনুবাদে যার জুড়ি নেই। আল্লাহপাক উভয়ের মেহনতকে কবুল করুন। এছাড়া অন্যান্য যারা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন বিশেষত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর তা পাঠ করে যে সকল মুরুব্বী, শুভানুধ্যায়ী ও পাঠক সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও দু'আ করেছেন আমি তাদের সকলের নিকট চীর কৃতজ্ঞ। আল্লাহপাক সবাইকে উত্তম বদলা দিন।

কিতাবটিকে আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি বা অসংগতি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তিতে শুধরে নিবো এবং তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।

আল্লাহপাক কিতাবটিকে আমাদের সকলের জন্য আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনের উসীলা বানান। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫

তারিখ ঃ ১৫ রবিউস সানী ১৪৩০ হিজরী
১২ এপ্রিল, ২০০৯ ঈসায়ী

সংক্ষিপ্ত সূচী

তৃতীয় খণ্ড

সংক্ষিপ্ত সূচী

চতুর্থ খণ্ড

৩য় খন্ডের সংক্ষিপ্ত সূচি

৪র্থ খন্ডের সংক্ষিপ্ত সূচি

সূচীপত্র
তৃতীয় খণ্ড

বিষয় | পৃষ্ঠা

তেত্রিশতম মজলিস
যিকিরের গুরুত্ব

চৌত্রিশতম মজলিস
যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি

পঁয়ত্রিশতম মজলিস
নামাযের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা

ছত্রিশতম মজলিস
নিয়মিতভাবে আমল-অযীফা আদায় করা

সাতত্রিশতম মজলিস
অযীফা ছুটে গেলে আক্ষেপ ও অনুতাপ করা

আটত্রিশতম মজলিস
যিকিরের কতিপয় আদব

উনচল্লিশতম মজলিস

সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করা ও তা অর্জনের উপায়

চল্লিশতম মজলিস

আল্লাহকে পাওয়ার পথ দুর্বলদের জন্যেও রয়েছে

একচল্লিশতম মজলিস

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সংক্ষিপ্ত পথ

বিয়াল্লিশতম মজলিস
ইস্তিগফার ও অন্যান্য অযীফা আদায় করা

তেতাল্লিশতম মজলিস

আমল ও অযীফার উদ্দেশ্য 'দাসত্ব'

চুয়াল্লিশতম মজলিস

যিকিরে মন না বসার কারণসমূহ

পঁয়তাল্লিশতম মজলিস

মনের চাহিদার পরিবর্তে হুকুম মানার নাম দ্বীন

ছেচল্লিশতম মজলিস

দরস ও তাদরীসের সঙ্গে আমলের ইসলাহ্

সাতচল্লিশতম মজলিস

সুস্থতার জন্য দু'আ করা সুন্নাত

আটচল্লিশতম মজলিস

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি আল্লাহর কাছে চাইবে

সূচিপত্র ❖ চতুর্থ খণ্ড

উনপঞ্চাশতম মজলিস

অনাহূত ভাবনা ও তার প্রতিকার

পঞ্চাশতম মজলিস
চিন্তা আসা ও চিন্তা করা

একান্নতম মজলিস
উজব ও তার চিকিৎসা

বায়ান্নতম মজলিস
ক্রোধ ও তার চিকিৎসা

তেপ্পান্নতম মজলিস

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করো না

চুয়ান্নতম মজলিস
ক্রোধ দমনের পদ্ধতি

পঞ্চান্নতম মজলিস
হাসাদ ও তার চিকিৎসা (১)

ছাপ্পান্নতম মজলিস
হাসাদ ও তার চিকিৎসা (২)

সাতান্নতম মজলিস
বিদ্বেষ ও তার চিকিৎসা

আটান্নতম মজলিস

হুব্বে দুনিয়া (দুনিয়ার ভালোবাসা) ও তার চিকিৎসা

উনষাটতম মজলিস

গাফলত (আল্লাহ-বিস্মৃতি) ও তার চিকিৎসা

ষাটতম মজলিস

দুনিয়া মন্দ নয়, দুনিয়ার মুহাব্বত মন্দ

একষট্টিতম মজলিস

দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতিকার

প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে আল্লাহর হেকমত রয়েছে

বাষট্টিতম মজলিস

দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতিকার

দুনিয়া অন্বেষণকারী শান্তিতে থাকে না

তেষট্টিতম মজলিস

দুনিয়াকে অগ্রগণ্য মনে করা নিষিদ্ধ

চৌষট্টিতম মজলিস

পদের লোভ ও তার চিকিৎসা

পদের লোভের হাকীকত

পয়ষট্টিতম মজলিস

কোন ধরনের 'জাহ' ক্ষতিকর

ইসলাহী মাজালিস
তৃতীয় খণ্ড

তেত্রিশতম মজলিস

যিকিরের গুরুত্ব

যিকিরের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

'আনফাসে ঈসা' পাঠের আমল

প্রতি বছর পবিত্র রমযান মাসে যোহর নামাযের পর হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর (মালফুযাতের) কিতাব 'আনফাসে ঈসা' থেকে মালফুযাত শুনানোর আমল চলে আসছে। কিন্তু এ বছর আমি সফরে থাকার কারণে এ ধারাবাহিকতা এখনো শুরু করা যায়নি। আর অল্প ক'দিন মাত্র বাকি আছে, তাই ভাবলাম যে, এই কিতাবের কোন একটি অংশকে সামনে নিয়ে তার উপর কিছু আলোচনা করি। আমি চিন্তা করলাম যে, এখন পবিত্র রমযানের শেষ দশক চলছে, এই দশক পুরা রমযানের সারনির্যাস, আল্লাহ তাআলা এই দশকে রহমতের সব দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সব দিক থেকে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীস শরীফে এই দশককে عِتْقٌ مِنَ النِّيْرَانِ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এই দশকে বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ছাড়পত্র দিয়ে থাকেন।

রমযানের শেষ দশকে রাসূল (সা.)-এর অবস্থা

হাদীস শরীফে এসেছে যে, যখন পবিত্র রমযানের শেষ দশক আরম্ভ হতো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই হতো যে–

شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَاَحْيَا لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ

এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তিনি তাঁর লুঙ্গি বেধে নিতেন, কিন্তু এর দ্বারা একটি বাগধারার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হল কোন কাজের জন্য কোমর কষে বাঁধা। অর্থাৎ, তিনি কোমরকে কষে বাঁধতেন এবং ইবাদতের মধ্যে অধিকতর পরিশ্রম ও কষ্ট-সাধনার জন্য প্রস্তুত হতেন এবং রাতকে জীবিত রাখতেন অর্থাৎ,

রাতের বেলা জাগতেন এবং আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতের মধ্যে রাত কাটাতেন এবং নিজের পরিবারের লোকদেরকেও ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন।

অন্য দিনে তাহাজ্জুদের সময়ের অবস্থা

অন্যান্য দিনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম এই ছিল যে, রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগতেন, তখন পরিবারের লোকদের যেন ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে খুব গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতেন। হাদীস শরীফে সে অবস্থা এই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে–

قَامَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا

'যখন তিনি বিছানা থেকে উঠতেন তখন খুব আস্তে উঠতেন, যেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘুম ভেঙ্গে না যায় এবং যখন দরজা খুলতেন তখন খুব আস্তে খুলতেন যাতে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। নিজের পরিবারের লোকদের ঘুমের ব্যাপারে তিনি এত সজাগ ছিলেন। কিন্তু যখন পবিত্র রমাযানের শেষ দশক আরম্ভ হত, তখন তিনি পরিবারের লোকদেরকে গুরুত্বের সাথে জাগিয়ে দিতেন। এটি ইবাদতের সময়, এ সময় আল্লাহর ইবাদত কর। কতক বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, وَكَثَّرَ صَلٰوتَهٗ অর্থাৎ, এই দিনগুলোতে তিনি অধিকহারে নামায পড়তেন। ইবাদতের এই গুরুত্ব শুধু বেজোড় রাতেই নয় বরং পুরো শেষ দশকের সকল রাতে এই গুরুত্ব দিতেন।

শেষ দশক কিভাবে অতিবাহিত করবেন

যাইহোক! এই শেষ দশক আল্লাহর যিকিরে অতিবাহিত করার জন্যই। নামাযও যিকিরের একটি শাখা। অন্যান্য ইবাদতও যিকিরের শাখা। উদ্দেশ্য হল– পবিত্র রমযানের এই শেষ দশক আল্লাহ্ তাআলার স্মরণে অতিবাহিত করতে হবে। মনের যিকির এবং মুখের যিকিরে এ সময় কাটাতে হবে। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) বলতেন যে, শেষ দশকের এই রাতগুলোকে সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা- বিবৃতি এবং অনুষ্ঠান ও প্রোগ্রামে ব্যয় করা অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়। এই রাতগুলো সভা-সমিতি ও বক্তৃতার জন্য নয়; বরং এগুলো শুধুই আমলের রাত। মানুষ নির্জনে একাকী বসে, নিজের প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করবে, শুধু সে থাকবে আর তার আল্লাহ থাকবে, তৃতীয় আর কেউ থাকবে না। এভাবে এই দশক অতিবাহিত কর। যিকিরে কাটাও। মুখে যিকির থাকবে, অন্তরে যিকির থাকবে। চলাফেরা,

উঠা-বসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করবে। বাজারে, অফিসে, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকলে তখনো মুখে এবং অন্তরে আল্লাহর যিকির থাকবে। অবস্থা এই হবে যে–

دل بیار دست بکار

অর্থাৎ, হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে আর মন আল্লাহর দিকে ধাবিত থাকবে।

ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কথা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে ঈমানদারগণ! অধিক হারে আল্লাহর যিকির কর।' (সূরা আহযাব: ৪১)

কতক ছাত্র মনে করে যে, যিকির করা আল্লাহর ওলীদের কাজ। মৌলভী এবং আলেমদের যিকির করে কি হবে? উলামায়ে কেরামের কাজ তো তাঁরা ওয়াজ করবে, তাবলীগ করবে, পাঠদান করবে, সবক পড়াবে, মুতালাআ করবে, তাকরার করবে ইত্যাদি।

যিকির করে মৌলভীদের কি কাজ হবে? যিকির করা তো আল্লাহর ওলীদের কাজ। এজন্য যখন খানকায় যাবো, তখন সেখানে যিকির করব। আরে ভাই! আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করলাম এখানেতো সমস্ত ঈমানদারদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। এবার আপনারা বলুন যে, আলেমগণ ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত কি না? يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর ব্যাপক অর্থের মধ্যে সবাই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে এরূপ মনে করা যে, আমরা তো তালিবে ইলম, আমরা তো কিতাব পড়ব, মুতালাআ করব, তাকরার করব, কিন্তু যিকির করব না। মনে রাখবেন, এটি মারাত্মক বিপদজনক কথা।

যিকিরের মধ্যে আধিক্য কাম্য

তাছাড়া এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন যে, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর যিকির অধিক হারে কর। যার অর্থ এই যে, একবার দু'বার যিকির করা যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহর নাম আওড়াতে থাক। উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে সব সময় তোমার মুখে যেন যিকির চালু থাকে। এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে কোন মানুষের মর্যাদা শ্রেষ্ঠ হবে? উত্তরে তিনি বললেন–

اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتُ

অর্থাৎ, যে সমস্ত নারী-পুরুষ অধিকহারে আল্লাহর যিকির করে। (তিরমিযী)

মনোযোগ ছাড়া আল্লাহর যিকির করা

কতক মানুষের অন্তরে এই প্রশ্ন জাগে যে, এটা কেমনতর যিকির যে, মন-মগজ অন্য দিকে ব্যস্ত আর মুখে যিকির করছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা-এর তাসবীহ পড়ছে অথচ মনোযোগ অন্য দিকে, চিন্তা অন্য দিকে, মন অন্য দিকে, মস্তিষ্ক অন্য দিকে, এমন যিকির দ্বারা কী লাভ? মনে রাখবেন, এটি শয়তানের ধোঁকা। শুধু জিহ্বার যদি আল্লাহর যিকিরের তাওফীক লাভ হয়। মন-মস্তিষ্ক অন্য দিকে ব্যস্ত থাকলেও তা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। এটিও বড় দৌলত। এটি কি কম যে, দেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ হলেওতো তাঁর স্মরণে মগ্ন রয়েছে।

মুখে যিকির আর মনে অন্য চিন্তা

এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে এই কবিতাটি প্রসিদ্ধ আছে-

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ, 'মুখে যিকির চলছে আর মনের মধ্যে গরু-গাধার চিন্তা। এমন তাসবীহ'র কি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আছে?'

জনৈক কবি এই কবিতা বলেছে, কিন্তু হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন যে, যে ব্যক্তি এই কবিতা বলেছে, সে প্রকৃত অবস্থা জানে না। প্রকৃত অবস্থাতো এই যে,

بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر

ایں چنیں تسبیح ہم دارد اثر

অর্থাৎ, 'মুখে যদি তাসবীহ জারি থাকে এবং অন্তরে গরু-গাধার চিন্তা আসে আল্লাহর মেহেরবানীতে এমন তাসবীহও প্রভাব সৃষ্টি করে।'

মুখের যিকির এই প্রভাবের প্রথম সিঁড়ি। মুখ যদি আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত না হয় তাহলে কখনই অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা আবাদ হবে না। যে ব্যক্তি এই প্রথম সিঁড়ি অতিক্রম করবে না, তার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ কি করে প্রতিষ্ঠিত হবে? এজন্য মুখে যিকির করা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম ধাপ।

মুখের যিকির যদি না থাকে তাহলে যেন সিঁড়ির প্রথম ধাপই নাই। এজন্যই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, মনোযোগ ছাড়া শুধু মুখে যিকির করার কি ফায়দা? বরং মন বসুক বা না বসুক মুখে যিকির করতে থাক, মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হোক বা না হোক তুমি যিকির চালিয়ে যাও। তোমার কাজ হল– আল্লাহর নাম জপতে থাকা। ধীরে ধীরে আল্লাহ তাআলা মনের একাগ্রতাও সৃষ্টি করে দিবেন। মনে কর, যদি সারা জীবনেও মনের একাগ্রতা সৃষ্টি না হয় তবুও মুখের যিকির ফায়দাহীন নয়।

আল্লাহর যিকির একটি শক্তি

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, 'আল্লাহর যিকির হল একটি এনার্জি এবং শক্তি। এজন্যই সকালে উঠার পর নাস্তা করার পূর্বে এই এনার্জি ও শক্তি সঞ্চার করে নাও। কারণ, আল্লাহর যিকির অন্তরে শক্তি সঞ্চার করে। সংকল্পে শক্তি যোগান দেয়। সাহসে শক্তি প্রদান করে। এর ফলে মানুষের মধ্যে শয়তান ও নফসের সঙ্গে মোকাবেলা করার সাহস সৃষ্টি হয়। এজন্য নফস ও শয়তানকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে যিকিরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। যিকির করণেওয়ালা ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হয় না। এই মৌখিক যিকির করার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করার যোগ্যতা পয়দা হয়।

আল্লাহর যিকির গোনাহ থেকে বাধা দিল

যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে গোনাহের অবস্থা সৃষ্টি হল এবং গোনাহের সমস্ত উপকরণ একত্রিত হল– তখন যিকির গোনাহ থেকে বাধা দিল। কারণ, যখন যুলায়খা বলল, আমার কাছে আস, তখন তিনি উত্তরে বললেন– আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এ সময় আল্লাহর আশ্রয়ের অনুভূতি এই শক্তি যোগান দেয়। এমন মনোহরী পরিবেশে, যেখানে মানুষের পদস্খলনের ৯৯% সম্ভাবনা ছিল, সেখানে এই আল্লাহর যিকির তাঁকে গোনাহ থেকে বাধা দেয়।

যিকির শিরায় শিরায় বিস্তার লাভ করেছিল

এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন–

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ

মুফাসসিরগণ এই বাক্যের দু'টি তাফসীর করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমার প্রভু' দ্বারা আযীযে মিসর উদ্দেশ্য। যুলায়খা যার বিবি ছিল। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, 'আমার প্রভু' দ্বারা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য। তিনি এই বাক্যে

এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদিও তুমি সব দরজা বন্ধ করেছ এবং দরজাগুলোতে তালা লাগিয়ে দিয়েছ, তুমি মনে করেছ যে, এর ফলে কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু আমার একজন প্রভু রয়েছেন, যিনি আমাকে এ অবস্থাতেও দেখছেন। যিনি আমাকে উত্তম ঠিকানা দিয়েছেন। 'তিনি আমার প্রভু' –এ চিন্তা যিকিরের বরকতেই এসেছে। সেই যিকির– যা তাঁর শিরায় শিরায় বিস্তার লাভ করেছিল। আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ তাঁর মন-মগজে গেঁথে গিয়েছিল। এর ফলে তিনি গোনাহ্ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। যাই হোক, এই যিকির একটি শক্তি এবং এনার্জি, সকাল বেলায় কর্মজীবনে প্রবেশ করার পূর্বে যা অর্জন করা উচিত।

মাসনূন যিকিরের জন্য শায়খের অনুমতির প্রয়োজন নেই

সাধারণ নিয়ম তো এই যে, যখন কোন মানুষ কোন শায়খের কাছে যায়, তখন শায়খ তাকে কিছু যিকির এবং তাসবীহ্ বলে দেন যে, সকাল বেলা এই তাসবীহ্ এবং সন্ধ্যা বেলা এই তাসবীহ্ পাঠ করবে। কিন্তু কিছু তাসবীহ্ এমন আছে যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। ঐ সকল তাসবীহ্ পড়ার জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। যেমন প্রতিদিন একশ' বার سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

একশ' বার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

একশ' বার ইস্তিগফার এবং একশ' বার দরূদ শরীফ। এই চারটি তাসবীহ্ প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন আদায় করতে পারে। বিধায় যাদের আমলের মধ্যে এই তাসবীহ্সমূহ অন্তর্ভুক্ত নেই, তারা এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন।

যাইহোক! এই 'আনফাসে ঈসা' কিতাবে হযরত থানবী (রহ.) যিকির সম্পর্কিত কিছু মালফূয উল্লেখ করেছেন। এজন্য মনে হল, এই রমযানে যিকির সম্পর্কিত মালফূয পড়ে তার কিছু ব্যাখ্যা পেশ করি।

যিকিরের কষ্ট স্বতন্ত্র উপকারী

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)-এর নিকট পত্রযোগে তার অবস্থা লিখে জানালো যে, 'যিকির করতে গেলে মনের উপর বিরাট বোঝা অনুভূত হয়। যখন যিকির করতে বসি মন ঘাবড়ে যায়।'

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) লিখেন যে–

> **'বোঝা' একটি কষ্ট, কষ্ট করতে মন না চাইলে বুঝে নাও যে, খোদ কষ্টটাও উপকারের দিক থেকে মন লাগার চেয়ে কম**

উপকারী নয়। যেভাবে হোক, যতদূর সম্ভব যিকির পুরা করবে। ধীরে ধীরে সব কষ্টই সহজ হয়ে যাবে।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৩)

যখন মানুষ যিকির করতে আরম্ভ করে, তখন প্রথম পর্যায়ে তার মন খুব পেরেশান হয়। যিকির করতে কষ্ট মনে হয়। যিকির করতে মন ঘাবড়ে যায়। কতক মানুষের অবস্থা এই হয় যে, যখন যিকির করতে বসে, তখন মন ঘাবড়ে যায়, মন বসে না, একাগ্রতা আসে না, তখন তারা সাহস হারা হয়ে যায় এবং যিকির করা ছেড়ে দেয়। এমন লোক বঞ্চিত হয়ে যায়।

জোরপূর্বক যিকিরে লেগে থাক

যিকিরের নিয়ম এই যে, যখন যিকির করতে বসবে, তখন মন লাগুক, বা না লাগুক, মন চাক, বা না-চাক, মন ঘাবড়ে যাক, বা ভীত হোক, তারপরও যিকিরে লেগে থাকবে। মনকে বলবে যে, তুমি ঘাবড়াও আর পেরেশান হও, আমাকে তো এ কাজ করতেই হবে। আমাদের শায়খ হযরত আরেফী (রহ.) বলতেন যে, নিজের মনকে বলে দাও যে–

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

অর্থ, 'সমস্ত কামনা ধূলিস্মাৎ হোক, সমস্ত আক্ষেপ নস্যাৎ হোক, এখন তো এই অন্তরকে তোমার যোগ্য বানাতেই হবে।'

একবার মনকে এ কথা বলে দাও যে, তুমি এর থেকে পালাচ্ছ এবং ঘাবড়াচ্ছ। আমি তার কোন পরোয়া করব না। আমি তো এ-কাজ করেই যাব। কেউ এ সংকল্প করলে, তারপর ইনশাআল্লাহ কয়েক দিনের মধ্যে এই ভীতি ও পেরেশানী খতম হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এই ভয়ে পলায়ন করে এবং যিকির করা ছেড়ে দেয়, তখন পুনরায় যিকিরের দিকে ফিরে আসা মুশকিল হয়ে যায়।

মন ঘাবড়ানোর কোন ঔষধ নেই

লোকে জিজ্ঞাসা করে যে, হযরত এর কোন চিকিৎসা বলে দিন, যেন যিকির করতে মন ঘাবড়ে না যায় এবং যিকিরের মধ্যে মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। মনে রাখবেন, এর কোন চিকিৎসা নেই। এমন কোন বড়ি, পাইডার বা সিরাপ নেই যে, তা খেলে যিকিরের প্রতি মন বসবে। এর চিকিৎসা এটাই যে, মন বসুক বা না বসুক নিজের ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে যিকিরে লেগে থাকতে হবে। লক্ষ্য করুন–

এই মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) যিকিরে মন না লাগার বিষয়ে এবং যিকির বোঝা মনে হওয়ার ব্যাপারে কি উত্তর দিয়েছেন।

এই কষ্ট ও বোঝা ফায়দাহীন নয়

তিনি বলেন যে, এ বোঝাটি একটি কষ্ট। অর্থাৎ, যিকির করতে মনের মাঝে যে বোঝা অনুভূত হয়, তা একটি কষ্ট। আর কষ্টের কাজে যদি মন না বসে তাহলে বুঝে নাও যে, এই কষ্টও উপকারের দিক থেকে মন বসার চেয়ে কম উপকারী নয়। অর্থাৎ, যিকির করতে যদি কষ্ট হয় এবং তাতে মন না বসে তাহলে এমতাবস্থায় একথা চিন্তা করবে যে, যিকির করতে যে কষ্ট হচ্ছে এ কষ্টও ফায়দা দেয়ার ক্ষেত্রে মন লাগার চেয়ে কম লাভজনক নয়। যিকিরের মধ্যে যদি মন বসত এবং খুব বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে মন লাগিয়ে যিকির করত তাতে যে ফায়দা হত এই কষ্টের ফায়দাও তার চেয়ে কম নয়।

এমন যিকিরে নূর অধিক থাকে

বরং কোন কোন জায়গায় হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন যে, এই কষ্টপূর্ণ যিকিরের ফায়দা মন লাগিয়ে যিকির করার ফায়দার চেয়েও অধিক হয়ে থাকে। কারণ, যিকিরের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাদ এবং মজা পায় এবং যার মন বসে তার যিকিরের মধ্যে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে উপভোগের জন্য যিকির করছে। স্বাদ ও মজার জন্য যিকির করছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির যিকির করতে কষ্ট হচ্ছে, তার যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এজন্য কষ্টের সাথে যিকিরকারী উপকার ও সওয়াবের দিক থেকে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে। এজন্য কখনই এরূপ চিন্তা করো না যে, কষ্টের সাথে যিকির করায় লাভ কি? আরে এর মধ্যেও অনেক বড় লাভ রয়েছে। তোমার মনে একদিকে চিন্তা– যিকিরের মধ্যে মন বসছে না, এমতাবস্থায়ও তুমি যে যিকির করছ, এরপরও যে তুমি মনকে জোর করে লাগিয়ে রেখেছো, এই যিকির আল্লাহ তাআলার খুব পসন্দনীয়। কতক সময় এরূপ যিকিরের মধ্যে 'নূরানিয়াত' ও 'রূহানিয়াত' স্বাদ ও উপভোগযুক্ত যিকিরের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াতে'র হাকীকত

একবার হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) এই 'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াত' সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কোন ভাল স্বপ্ন দেখা গেলে, কাশফ হলে, ইবাদত করতে মজা লাগলে মানুষ এটাকে 'রূহানিয়াত' ও 'নূরানিয়াতে'র দলীল মনে করে। অথচ এসব জিনিসের 'রূহানিয়াত' এবং 'নূরানিয়াতে'র সাথে কোন সম্পর্ক নেই। 'নূরানিয়াত' তো

রয়েছে আল্লাহর হুকুম মানার মধ্যে। যেদিন আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিলে সেদিন 'নূরানিয়াত' হাসিল হল। সারা জীবনেও যদি নামাযের মধ্যে মজা না লাগে তারপরও ঐ ব্যক্তি নামায আদায় করে তাহলে তার জন্য পরিপূর্ণ 'নূরানিয়াত' লাভ হয়েছে।

এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই

আমাদের এখানে এক ব্যক্তি আছে, যাকে 'শায়খে তরিকত' বলা হয়, যার মুরীদের সংখ্যাও অসংখ্য বলা হয়। তিনি লিখেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের মুরীদকে মসজিদুল হারামের মধ্যে নামায পড়াতে পারে না, সে শায়খ হওয়ার যোগ্য নয়।' অর্থাৎ, ঐ শায়খ মুরীদের সামনে মসজিদুল হারামকে প্রকাশিত করবে এবং মুরীদকে তাতে নামায পড়াবে। যে পীর এমন করতে পারবে না, সে পীর হওয়ার যোগ্য নয়। এসব কথার কারণে মানুষের মনে এ বিষয়টি বসে গেছে যে, এ সমস্ত কাশফ ও মুরাকাবার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। মনে রাখবেন, এ সমস্ত জিনিসের কোন বাস্তবভিত্তিক গুরুত্ব নেই। কেউ যদি এগুলো লাভ করে তবে তা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। কিন্তু এটি বড় নাজুক নিয়ামত। অনেক সময় এটি একটি পরীক্ষাও হয়ে থাকে। এটি লাভ হওয়ার পর বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। অনেক মানুষকে শয়তান এসব জিনিস দ্বারাই পথভ্রষ্ট করেছে। এজন্য কখনই এগুলো অর্জন করার পিছনে পড়বে না। এগুলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বেশির চেয়ে বেশি এগুলো প্রশংসিত এবং মনের পসন্দনীয় অবস্থা।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সঠিক কর

আসল জিনিস হল– আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সঠিক করা। আল্লাহ তাআলা কি হারাম শরীফে বসে আছেন, না কি বায়তুল্লাহ শরীফে বসে আছেন। আল্লাহ তাআলা যেভাবে হারাম শরীফে বিদ্যমান আছেন একইভাবে এখানেও বিদ্যমান আছেন। যে দিন তুমি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সঠিক করলে সে দিনই তোমার হারাম শরীফ হাসিল হল।

শেখ সাদী (রহ.) বলেন–

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

তুমি শবে কদর তালাশ করছ। সব রাত-ই শবে কদর তুমি যদি তার কদর করতে পারো। যে রাতে তুমি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক সঠিক করে নিলে সে রাতই তোমার জন্য শবে কদর।

এখানেই তোমার হারাম শরীফ লাভ হবে

এজন্য এরূপ মনে করা যে, আমি যদি হারাম শরীফ না গেলাম এবং হারামের মধ্যে নামায না পড়লাম তাহলে আমার কিছু লাভ হলো না, একথা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা যদি হারাম শরীফে নিয়ে যান তাহলে এটা তাঁর দয়া-অনুগ্রহ। আর যদি তুমি সেখানে যেতে না পারো। কারণ, আইনি জটিলতা আছে বা টাকা-পয়সার ব্যবস্থা নেই বা সফর করার মত দেহে শক্তি নেই, তাহলে কি এ কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বঞ্চিত করে দিবেন। আরে! যে আবেগ তোমাকে হারাম শরীফে নিয়ে যাচ্ছে, সে আবেগকে যদি ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে বসে এখানে ব্যবহার কর, তাহলে এখানেই তোমার হারাম শরীফ হাসিল হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা কোন ঈমানদারকে মাহরূম করবেন না।

সর্বাবস্থায় যিকিরে রত থাক

খুব ভাল করে বুঝে নিন, এ সমস্ত কাশফ-কারামতের দ্বীনদারীর সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এর সাথে সম্পর্কিত নয়। আসল দ্বীনদারী হল- আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলা। এই হুকুম মানার জন্যই তাঁর যিকির করতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক জুড়তে হবে। সেই সম্পর্ক সঠিক করতে হবে। যিকির করতে কষ্ট লাগুক, বোঝা মনে হোক, মন না বসুক তারপরও বসে যাও এবং আল্লাহর যিকিরে রত হও। এই আনুগত্যের পরিণতিতে দেখবে আল্লাহ তাআলা কেমন নূর এবং বরকত দান করেন। ধীরে ধীরে এ সমস্ত যিকিরও সহজে পুরা হতে থাকবে এবং যিকিরের আসল ফায়দা অর্থাৎ, আল্লাহমুখী হওয়া এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকেও এই তাওফীক দান করুন এবং আপনাদেরকেও দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চৌত্রিশতম মজলিস

যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি

যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

কষ্ট হলেও নিয়মিত যিকির করতে থাকবে

গতকাল আমি নিবেদন করেছিলাম যে, মানুষ যখন প্রথম প্রথম যিকির করতে আরম্ভ করে, তখন মনের মধ্যে কষ্ট হয় এবং বোঝা অনুভূত হয়। এ অবস্থা শুধু যিকিরের ক্ষেত্রে নয় বরং যে কোন নতুন কাজ শুরু করলে প্রথম প্রথম তা করতে কষ্ট অনুভূত হয়। একইভাবে যিকিরের সূচনাতেও যখন একজন মানুষ নিজেকে নিজে আল্লাহর যিকিরে অভ্যস্ত করতে চায়, তখন অনেক সময় যিকির করতে মন পেরেশান হয় এবং বোঝা অনুভূত হয়।

কিন্তু এর চিকিৎসা এই যে, এই কষ্টকে সহ্য করতে হবে। এই বোঝাকে বহন করতে হবে। ঘাবড়ে গিয়ে যিকির বন্ধ করা যাবে না। মন লাগুক বা না-লাগুক, মন শান্ত থাক বা অশান্ত থাক, সর্বাবস্থায় যিকিরে রত থাকতে হবে। এর ফলে ধীরে ধীরে মন বসতে আরম্ভ করবে।

নামায পড়তে প্রথম প্রথম কষ্ট হয়

লক্ষ্য করুন, শিশুকালে যখন মা-বাপ নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তাদের কথায় নামায আরম্ভ করেছিলেন, ঐ সময় কি নামাযের মধ্যে আপনাদের মন বসত, না ঐ সময় মন বসত না। বরং মন ভেগে যেত। নামায পড়তে মন চাইতো না। মা-বাপ যখন নামায পড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন, তখন মনে হতো যে এরা আমার উপর জুলুম করছে। যাইহোক! সে সময় নামায পড়তে কষ্ট মনে হত, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই কষ্ট জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। এখন তো এ অবস্থা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন নামাযী মানুষকে বলে যে, তুমি এক লাখ টাকা নাও আর এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দাও, তাহলে ঐ নামাযী ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাযও ছাড়তে তৈরি হবে না। এখন নামায পড়া ছাড়া সে শান্তি পায় না।

যিকির জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়

যিকিরের অবস্থাও একই রকম। প্রথম প্রথম যিকির করতে কষ্ট অনুভব হয়। বোঝা মনে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন যিকির নিয়মিত আমলে পরিণত হয় এবং তার অভ্যাস গড়ে উঠে, তখন এই যিকির জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা এই যিকিরকে জীবনের এমন অংশ বানিয়ে দেন যে, তাছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না।

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) এবং আল্লাহর যিকির

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) এক মহান মুহাদ্দিস এবং আলেম ছিলেন। জ্ঞান-গরীমায় অনেক উচ্চাসনের লোক ছিলেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী'র লেখক ছিলেন। তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, 'ফাতহুল বারী' লেখার সময় যখন কলমের মুখ ঠিক করার প্রয়োজন পড়ত– সেই যুগে কলম হত কাঠের। লিখতে লিখতে যখন তার মাথা নষ্ট হয়ে যেত, তখন চাকু দ্বারা তা ঠিক করতে হত। যখন হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)-এর কিতাব লেখার সময় কলম ঠিক করার প্রয়োজন পড়ত, তখন কলম ঠিক করতে যেটুকু সময় ব্যয় হত, ঐ সময়টুকুও যিকিরশূন্য কাটানো তিনি বরদাশত করতেন না। ঐ সময়টুকুও তিনি আল্লাহর যিকিরে অতিবাহিত করতেন। এজন্য যখন যিকির মানুষের জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়, তখন যিকির ছাড়া মানুষ শান্তি পায় না।

যিকিরের একটি পদ্ধতি হল জোরে যিকির করা

কতক আল্লাহর ওলী প্রথম পর্যায়ের এমন মুরীদ, যার মন আল্লাহর যিকির করতে কষ্ট অনুভব করে, তার জন্য যিকিরের বিশেষ কিছু পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, এই পদ্ধতিতে যিকির করবে, তাহলে যিকিরের মধ্যে মন বসবে এবং ঘাবড়াবে না। অন্যথায় আশঙ্কা রয়েছে যে, ঘাবড়ে গিয়ে যিকির করা ছেড়ে দিবে। ঐ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতি হল জোরে যিকির করা। কারণ, সে যদি একা একা চুপে চুপে যিকির করে, তাহলে তার মন পেরেশান হবে এবং ঘাবড়ে যাবে। এজন্য তাকে বলেছেন যে, তুমি একটু উঁচুস্বরে যিকির করবে এবং সামান্য সুর মিলিয়ে যিকির করবে। এর ফলে যিকিরের মধ্যে তোমার মন বসবে। যেমন নিম্ন স্বরে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র যিকির করলে তার মন বসে না, কিন্তু সুর মিলিয়ে এবং উঁচু আওয়াজে যখন যিকির করবে তখন তার মন বসবে। মোটকথা, মন বসানোর জন্য আল্লাহওয়ালাগণ এই পদ্ধতি সাব্যস্ত করেছেন যে, উঁচু আওয়াজে এবং সূর মিলিয়ে যিকির করবে।

যিকিরের একটি পদ্ধতি 'যরব' লাগানো

কাউকে 'যরব'-এর পদ্ধতি শিখিয়েছেন যে, যিকিরের সময় 'যরব' লাগাবে। 'যরব' লাগানোর অর্থ– মারা, আঘাত করা। অর্থাৎ, যিকির করার সময় কোন একটি জায়গায় (অঙ্গে) চাপ সৃষ্টি করবে এবং আঘাত করবে। কার্যত: অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকারী মনে করে পীর সাহেবগণ এর অনেকগুলো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলোর মধ্যে একটি পদ্ধতি এই যে, যখন তুমি 'লা-ইলাহা' বলবে তখন ঘাড় এবং চেহারাকে দিলের কাছে নিয়ে যাবে, এরপর ঘাড়কে ডান দিকে নিয়ে পিছন দিক ফিরাবে এবং সে সময় একথা কল্পনা করবে যে, অন্তরের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া যত জিনিসের মহব্বত রয়েছে সেগুলোর মহব্বতকে মন থেকে বের করে পশ্চাতে নিক্ষেপ করছি। তারপর 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় ঘাড় এবং চেহারাকে পুনরায় দিলের কাছে এনে ধাক্কা মারবে এবং সে সময় একথা কল্পনা করবে যে, আমি আল্লাহ্র মহব্বতকে অন্তরে প্রবেশ করাচ্ছি। এ পদ্ধতি আল্লাহ্ওয়ালাগণ এজন্য সাব্যস্ত করেছেন যে, যিকিরকারী ব্যক্তি যখন এই 'যরব' এর মধ্যে মগ্ন হবে, তখন তার মন যিকিরের মধ্যে বসে যাবে। প্রতিদিন এবং বারবার যখন একথা কল্পনা করে যিকির করবে এবং এই নিয়মে 'যরব' লাগাবে তখন ইনশাআল্লাহ্ এমন এক সময় আসবে যে, অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ্র মহব্বত বের হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র মহব্বত অন্তরে প্রবেশ করবে।

'যোগাসনে' বসে যিকির করা

মোটকথা! আল্লাহ্ওয়ালা পীর-মাশায়েখগণ যিকির করার যে সমস্ত পদ্ধতি নির্ধারণ, করেছেন, সেগুলো চিকিৎসা হিসাবে নির্ধারণ, করেছেন। এ সমস্ত পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় এবং প্রমাণিত করার প্রয়োজনও নেই। অন্য কতিপয় বুযুর্গ অন্যান্য পদ্ধতিও নির্ধারণ, করেছেন। যেমন, কতক শায়খ বলেছেন যে, যখন যিকির করতে বসবে, তখন আসন দিয়ে বসবে। তারপর ডান পায়ের বুড়া আঙ্গুলী এবং তৎসংলগ্ন আঙ্গুল দ্বারা বাম দিকের হাটুর ভিতরের রগকে চেপে ধরবে। ঐ রগকে চেপে ধরায় মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। ফলে মনে অন্যান্য চিন্তা ও সংশয় সৃষ্টি হবে না। এ বিষয়টি অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গেছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা এ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

যিকিরের একটি পদ্ধতি 'পাসে আনফাস'

এমনিভাবে যিকিরের বিশেষ একটি পদ্ধতিকে 'পাসে আনফাস' বলা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্বাসের উঠানামার সময় আল্লাহ্র যিকিরকে এমনভাবে আকর্ষণ করা হয় যে, প্রত্যেক শ্বাসের সাথে আল্লাহ্র যিকির যবানে জারী হয়ে যায়। শ্বাস নেওয়ার সময়ও আল্লাহ্র যিকির হয়, শ্বাস ছাড়ার সময়ও আল্লাহ্র

যিকির হয়। প্রত্যেক শ্বাসের গতির সঙ্গে আল্লাহর নাম বের হতে থাকে। পীর-মাশায়েখগণ এ পদ্ধতির অনুশীলন করান। যার ফলে এ যোগ্যতা লাভ হয়।

যিকির করার সময় প্রত্যেক জিনিসের যিকির করার কথা কল্পনা করা

এমনিভাবে 'সুলতানুর আযকার'-এর নাম আপনারা হয়ত: শুনেছেন। এটিও যিকিরের বিশেষ একটি পদ্ধতি। যার মধ্যে সমস্ত 'লতিফা'র সঙ্গে যিকিরের আওয়াজ বের হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে আল্লাহর ওলীগণ এই পদ্ধতিটিও বের করেছেন যে, যখন যিকির করতে বসবে, তখন একথা কল্পনা করবে যে, এই দেওয়ালও আমার সঙ্গে যিকির করছে, এই ছাদও যিকির করছে, এই দরজাও যিকির করছে, এই পাখাও যিকির করছে, এই জমিনও যিকির করছে, এই আসমানও যিকির করছে। সমগ্র বিশ্বজগত যিকির করছে। এই কল্পনার দ্বারা যিকিরের মধ্যে বিশেষ এক ভাব ও আবেগের সৃষ্টি হয়।

হযরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে পাহাড় ও পাখির যিকির

কুরআনে কারীমে হযরত দাউদ (আ.)-এর যিকিরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি যিকির করতেন, তখন পাহাড় এবং পাখিও তাঁর সঙ্গে যিকির করত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

অর্থাৎ, 'আমি হযরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে পাহাড় ও সকল পাখিকে নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম। এগুলো তাঁর সঙ্গে যিকির করত।' (সূরা আম্বিয়া: ৭৯)

হযরত দাউদ (আ.) যখন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, তাসবীহ পাঠ করতেন, তখন পাহাড় এবং পাখিও সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলত।

পাহাড় ও পাখির যিকির দ্বারা হযরত দাউদ (আ.)-এর উপকার

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) 'মাসায়িলুস সুলূক' কিতাবে লিখেছেন যে, পাহাড় ও পাখির যিকির করাকে আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে গণ্য করেছেন, যে সকল নেয়ামত তিনি দাউদ (আ.)কে দান করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, পাহাড় এবং পাখি যিকির করে থাকলে তার দ্বারা হযরত দাউদ (আ.)-এর কি লাভ হত? যার ফলে এসব জিনিসকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

তারপরে তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়ে বলেন যে, এমনিতেই যিকির একটি বড় নেয়ামত। তা যে অবস্থায়ই করা হোক না কেন? এমনকি একাকী করা হলেও। তবে যিকিরকারী ব্যক্তির সঙ্গে যদি একটি দলও যিকিরে রত হয়, তখন তাঁর যিকিরের মধ্যে ভাব ও আবেগ সৃষ্টি হয়। যার ফলে যিকিরের মধ্যে খুব মন বসে। এ কারণে পাহাড় ও পাখিকে যে, নিয়োজিত করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরাও হযরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে যিকির কর। এতে হযরত দাউদ (আ.)কে এই নেয়ামত দেয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা তাঁর যিকিরের মধ্যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে আল্লাহর ওলীগণ হযরত দাউদ (আ.)-এর এই ঘটনা থেকে যিকিরের একটি পদ্ধতি এই বের করেছেন যে, যখন তোমরা যিকির করবে তখন এ কথা কল্পনা করবে যে, এই দরজা ও দেওয়াল, এই পাহাড়, এই পাখি এবং এই গাছও আমার সঙ্গে যিকির করছে। এই কল্পনার অনুশীলন কর এবং অধিক অনুশীলনের পর এরূপ অনুভূত হতে থাকবে যে, বাস্তবিকই এসব জিনিস আমার সঙ্গে যিকির করছে। এর ফলে নিজের মন যিকিরের দিকে ধাবিত হবে।

যিকিরের এসব পন্থা চিকিৎসা স্বরূপ

যাইহোক! আল্লাহর ওলীগণ যিকিরের যে সমস্ত পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, এগুলো দ্বারা তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যিকিরের মধ্যে যেন মানুষের মন বসে। তাঁরা এ সমস্ত পদ্ধতি চিকিৎসা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ কারণে মনে রাখতে হবে যে, এই বিশেষ পদ্ধতিসমূহ উদ্দেশ্যও নয় এবং সুন্নাতও নয় এবং এ সমস্ত পদ্ধতিকে সুন্নাত মনে করা জায়েযও নয়। যেমন, আমাদের সমস্ত মাশায়েখের নিকট 'বারো তাসবীহ' খুব প্রসিদ্ধ। এই বারো তাসবীহ 'যরব'-এর সাথে আদায় করা হয়, কিন্তু এই বিশেষ পদ্ধতি উদ্দেশ্যও নয় এবং সুন্নাতও নয়। কোন ব্যক্তি যদি এটাকে সুন্নাত মনে করে, তাহলে এ পদ্ধতি বিদআত হয়ে যাবে। বরং এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত এটা যে, এর সম্পর্কে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই পদ্ধতি প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদদেরকে চিকিৎসা হিসাবে দেয়া হয়, যেন তার মন যিকিরের মধ্যে বসে এবং একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

'যরব' লাগিয়ে যিকির করার উপর আপত্তি

বর্তমান যুগে মানুষ অতিরঞ্জন ও অতি শিথিলতায় লিপ্ত। ফলে কতক মানুষ 'যরব' লাগিয়ে যিকির করাকে বিদআত বলে। তারা বলে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একথা কোথায়ও প্রমাণিত নেই যে, তিনি কখনও এরূপ যিকির করেছেন এবং কোন সাহাবী থেকেও 'যরব' লাগিয়ে যিকির করা

প্রমাণিত নয়। এভাবে যিকির করা যেহেতু প্রমাণিত নয়, অথচ তোমরা এরূপভাবে যিকির করছ, বিধায় এটা বিদআত।

তাহলে 'জোশান্দাহ' পান করাও বিদআত

এক ব্যক্তি আমাকে বলে যে, আপনাদের সমস্ত শায়খ বিদআতী (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, এঁরা 'যরব' লাগিয়ে যিকির করা শিক্ষা দেন। অথচ এভাবে যিকির করা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সর্দি-কাশি হলে তুমি জোশান্দাহ[১] পান কর কি? সে বলল! হ্যাঁ পান করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জোশান্দাহ পান করা প্রমাণিত আছে কি? তিনি কি কখনো জোশান্দাহ পান করেছেন বা কোন সাহাবী থেকে জোশান্দাহ পান করা প্রমাণিত আছে? সে বলল– জোশান্দাহ পান করাতো প্রমাণিত নেই। আমি বললাম, যখন প্রমাণিত নেই, তখন আপনার জোশান্দাহ পান করা বিদআত। কারণ, আপনার দাবি প্রমাণিত করার জন্য বলতে হবে যে, যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় তা বিদআত। আর যেহেতু জোশান্দাহ পান করা প্রমাণিত নয় বিধায় এটাও বিদআত।

আসলে সঠিক কথা এই যে, যিকির করার এ সমস্ত পদ্ধতি চিকিৎসা স্বরূপ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তির যিকিরের মধ্যে মন বসে না এবং যিকিরের দিকে মন ধাবিত হয় না, তাকে চিকিৎসা স্বরূপ এ পদ্ধতি বলা হয়েছে যে, তুমি এই পদ্ধতিতে যিকির করবে, যেন যিকিরের মধ্যে তোমার মন বসে। এ যেন জোশান্দাহ পান করানো হচ্ছে।

এ সমস্ত পদ্ধতি বিদআত হয়ে যাবে

হ্যাঁ! কোন ব্যক্তি যদি যিকিরের বিশেষ কোন পদ্ধতিকে বলে যে, এটি সুন্নাত বা এটি মুস্তাহাব বা এ পদ্ধতিটি অধিক উত্তম। কারণ, উত্তম হওয়া, মুস্তাহাব হওয়া এবং সুন্নাত হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় তা সুন্নাত হতে পারে না, তা উত্তম হতে পারে না, তবে উপকারী হতে পারে।

---

১. জোশান্দাহ : ইউনানী হাকীমের তৈরী এক ধরনের সিরাপ, যা সর্দি-কাশি নিবারণের জন্য দেওয়া হয়।

উত্তম পদ্ধতি কেবলমাত্র সুন্নাত পদ্ধতি

অর্থাৎ, যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় তাও উপকারী হতে পারে এবং অধিকতর উপকারী হতে পারে, কিন্তু যে জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় তা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। আমাদের মুরুব্বীগণ অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্য থেকে সব সময় দূরে থেকেছেন। এ কারণে যিকিরের এ সমস্ত বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা একথা বলেননি যে, এগুলো বিদআত, এগুলো তোমরা গ্রহণ করো না এবং একথাও বলেননি যে, এগুলো উত্তম পদ্ধতি।

আস্তে যিকির করা উত্তম

মনে রাখবেন, সব সময়, সর্বাবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত যিকিরের উত্তম তরীকা হল আস্তে (নিম্নস্বরে) যিকির করা। এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। যিকির যত আস্তে আওয়াজে হবে ততই উত্তম। কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ, 'তোমাদের রবকে বিনয়ের সাথে এবং আস্তে আস্তে ডাক।' (সূরা আরাফ: ৫৫)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

অর্থাৎ, 'তোমার রবকে মনে মনে ডাক, বিনয়ের সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উঁচু আওয়াজের তুলনায় নিচু আওয়াজে।' (সূরা আ'রাফ : ২০৫)

এর দ্বারা জানা গেল যে, অধিক জোরে যিকির করা পসন্দনীয় নয়, পসন্দনীয় যিকির সেটা, যা আস্তে আওয়াজে হবে।

সশব্দে যিকির করা জায়েয, তবে উত্তম নয়

এ মূলনীতি সব সময়ের, চীরদিনের এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে যে, আস্তে যিকির করাই উত্তম। যিকির যত আস্তে করা হবে অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে উঁচু স্বরে যিকির করা জায়েয, নাজায়েয নয়। বিধায় সশব্দের যিকির করা আস্তে যিকিরের চেয়ে উত্তম হতে পারে না। তবে চিকিৎসা হিসাবে জোরে যিকির করায় দোষ নেই। তবে কোন ব্যক্তি যদি জোরে যিকির করাকে উত্তম মনে করে বা জোরে যিকির করাকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় বা জোরে যিকির করাকে সুন্নাত মনে করে বা জোরে যিকির না করলে আপত্তি করে;

তখন এটাই বিদআত হয়ে যায়। এরই নাম বিদআত। এ পথে অতিরঞ্জন ও শৈথিল্য থেকে বেঁচে পথ চলতে হবে। এজন্য আমাদের এই শেষ যুগের বুযুর্গগণ জোরে যিকির করার প্রতি বেশি উদ্বুদ্ধ করেন না। বরং আস্তে যিকির করারই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এটি ধর্মের মধ্যে নতুন সংযোজন এবং বিদআত

আসল কথা হল, কাজ যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন তা সীমার মধ্যে থাকে না। যিকিরের উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ আল্লাহওয়ালাগণ চিকিৎসা হিসাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিগুলোই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। এখন প্রত্যেক সিলসিলার লোকেরা নিজেদের জন্য একটি পদ্ধতিকে নির্ধারণ করে নিয়েছে। অমুক সিলসিলায় 'পাসে আনফাস' তরীকায় যিকির হয়। অমুক সিলসিলায় 'সুলতানুল আযকার' হয়। অমুক সিলসিলায় অমুক পদ্ধতিতে যিকির হয়। এগুলো ঐ সিলসিলাসমূহের বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। এখন এই সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা বাইরের লোকদেরকে একথা বিশ্বাস করাতে চায় যে, আপনি যে পদ্ধতিতে যিকির করেন, ঐ পদ্ধতিটি সঠিক নয় বা উত্তম নয়। সঠিক বা উত্তম পথ ঐটি, যা আমাদের পীর শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে যে জিনিস উদ্দেশ্য ছিল না, তা উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। এরই নাম ধর্মের মধ্যে নতুন সংযোজন। এরই নাম বিদআত। এর শিকড় কাটতে হবে।

যিকিরের মধ্যে 'যরব' লাগানো উদ্দেশ্য নয়

সুতরাং হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) ইরশাদ করেন যে,

> 'বিশেষ পদ্ধতিতে যরব লাগানো উদ্দেশ্য নয় এবং উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া তার উপর নির্ভরশীলও নয়। অকৃত্রিমভাবে যতটুকু হয়, যথেষ্ট।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৩)

অর্থাৎ, 'যরব' লাগিয়ে যিকির করার যে পদ্ধতি রয়েছে, এটি মূল লক্ষ্য নয় এবং যিকিরের যে মূল লক্ষ্য তা অর্জন হওয়া এই 'যরব'-এর উপর নির্ভরশীলও নয়, যে 'যরব' ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। বরং 'যরব' ছাড়াও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে। আসল উদ্দেশ্য হল তাঁর যিকির করা, তাঁর নাম নেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন? 'যরব' সহ হোক, চাই 'যরব' ছাড়া হোক। এজন্যই এ সমস্ত শর্তের পিছনে পড়ার অধিক প্রয়োজন নেই।

আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নাম নেয়া

এক ব্যক্তি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর নিকট এসে বলে যে, হযরত তাসবীহ তো পড়ি, কিন্তু বারো তাসবীহ হয়ে উঠে না। সে

ব্যক্তি ঐ বিশেষ পদ্ধতিতে পড়ার সময় পেত না। হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'পদ্ধতি উদ্দেশ্য, নাকি যিকির উদ্দেশ্য'। সে উত্তর দিল যে, 'হযরত আসল উদ্দেশ্য তো হল যিকির, পদ্ধতি উদ্দেশ্য নয়।' হযরত বললেন, 'তুমি বিশেষ পদ্ধতি ছাড়াই বারো তাসবীহ পড়।' তারপর বললেন যে, 'কতক সময় আমি বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া বারো তাসবীহ পড়ে থাকি। যা ধীর-স্থিরভাবে পনের মিনিটে আদায় হয়ে যায়। কারণ, বিশেষ পদ্ধতিতে 'যরব' লাগিয়ে পড়তে গেলে চল্লিশ মিনিটের প্রয়োজন পড়ে। যাই হোক, 'যরব' লাগিয়ে যিকির করা উদ্দেশ্যও নয়, সুন্নাতও নয়। সময়-সুযোগ হলে সেভাবে পড়। তা না হলে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে, যেভাবে সম্ভব যিকির কর। আল্লাহর নাম নাও। আসল উদ্দেশ্য তো হল আল্লাহর নাম নেয়া।

একদল লোক এসব পদ্ধতিকে বিদআত বলে

এ বিষয়টি এজন্য বিস্তারিত আলোচনা করলাম যে, আমাদের যুগে এ ব্যাপারে অতিরঞ্জন চলছে। একদল লোকতো এ সমস্ত পদ্ধতিকে সরাসরি বিদআত বলে। তারা বলে যে, এই তাসাওউফও বিদআত। এ সমস্ত খানকাহও বিদআত। চিল্লা লাগানোও বিদআত এবং যিকির করার এই বিশেষ পদ্ধতিসমূহও বিদআত।

আরেকটি প্রান্তিকতা

অপর দিকে একদল লোক এরূপ তৈরি হয়েছে যে, তারা যিকিরের এই বিশেষ পদ্ধতিসমূহকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। এ সমস্ত জাহেল পীরেরা নিজেদের খানকাহও খুলে বসেছে। তারা বলে, যে ব্যক্তি 'পাসে আনফাস' তরীকায় যিকির করেনি, সে তাসাওউফের অক্ষর জ্ঞানও অর্জন করেনি। যেন 'পাসে আনফাস'ই মূল লক্ষ্য। এটি আরেকটি প্রান্তিকতা।

আমাদের মুরুব্বী বুযুর্গগণতো আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমাদেরকে মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন এবং সে পথে পরিচালিত করেছেন। এই মধ্যপন্থায় না অতিরঞ্জন আছে, না অতি শৈথিল্য আছে। তারা বলেছেন যে, এ পদ্ধতি জায়েয কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়। এর উপর আমল কর।

ফিকিরের সাথে প্রীতি লাভ হওয়া যিকিরেরই বরকত

এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে নিজের অবস্থা লিখেন যে,

'মন চায় যিকির ছেড়ে দিই এবং বসে চিন্তা করতে থাকি। যিকিরের মধ্যে মন কম বসে।'

হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে লিখেন-

তুমি যে লিখেছ, যিকির ছেড়ে দিয়ে বসে চিন্তা করতে মন চায়। এটা যিকিরেরই বরকত যে, ফিকিরের প্রীতি সৃষ্টি হয়েছে। যিকিরকে কখনই ছাড়বে না। অন্যথায় ভিত্তি না থাকার ফলে ভিত্তির উপর গড়ে উঠা জিনিসও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। মন লাগুক বা না-লাগুক আমলের উপর অবিচল থাকবে। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৩)

ফিকির যিকিরের ফল

যিকিরেরই একটি ফল ফিকির। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ, 'ঐ সমস্ত লোক, যারা দাড়ানো, বসা ও পার্শ্বের উপর শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির বিষয়ে ফিকির করে।'

(সূরা আলে-ইমরান : ১৯১)

এ আয়াতের মধ্যে নেক লোকদের একটি গুণ যিকির এবং আরেকটি গুণ ফিকির বর্ণনা করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিকিরের সাথে সাথে ফিকিরও থাকা চাই। যিকিরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ফিকির হওয়া চাই। অর্থাৎ, অধিক যিকিরের ফলে মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, মহত্ব এবং তাঁর ভালবাসার চিন্তায় হারিয়ে যায়। এরই নাম ফিকির। এই ফিকির, যিকিরের ফল ও পরিণতি।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, তোমার যে এই চিন্তা জাগছে, যিকির ছেড়ে দিয়ে বসে বসে চিন্তা করি, এটাও মূলত: যিকিরেরই বরকত। এই যিকিরের ফলে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব, বড়ত্ব ও তাঁর ভালোবাসার যে চিন্তা অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে, তা যিকিরেরই ফল। যেহেতু এটা যিকিরের বরকতে হয়েছে, তাই যিকিরকে কখনই ছাড়বে না। অন্যথায় ভিত্তি অস্তিত্বহীন হওয়ার ফলে তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভবনও বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে।

অর্থাৎ, অন্তরে যে চিন্তা আসছে যে, দিন-রাত বসে বসে আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং তাঁর মহত্ব ও মুহাব্বতের কথা চিন্তা করতে থাকি এবং আমার অবস্থা এই হোক যে-

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے

অর্থঃ মন অবসরের রাত-দিন তালাশ করছে, যখন সব সময় প্রিয়জনের কল্পনায় আত্মহারা হয়ে বসে থাকবো।

এ অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু এ অবস্থা যিকিরের বরকতেই লাভ হয়েছে। তাই এখন যদি তুমি যিকির ছেড়ে দাও, তাহলে ফিকিরের এই অবস্থাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্য এরূপ চিন্তা করবে না যে, আমি যেহেতু ফিকিরের অবস্থানে পৌঁছে গেছি, তাই এখন আর যিকিরের প্রয়োজন নেই।

অন্তরের যিকির সত্ত্বেও মুখের যিকির ছাড়বে না

বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায় যে, যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য মুখের যিকির এবং ফিকির দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তরের যিকির। মানুষ যখন আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের চিন্তায় আত্মহারা হয়ে যায়, তারই নাম হয় অন্তরের যিকির। যেন সে অন্তর দ্বারা আল্লাহ তাআলার যিকির করছে। কতক লোক এই ধোঁকায় পড়ে যে, মুখের যিকির করতে করতে যখন অন্তরে আল্লাহর চিন্তা বসে গেছে, আল্লাহ তাআলার কুদরত, আজমত ও মহব্বতের চিন্তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। উদ্দেশ্য হাসিল করার মাধ্যম ও উপকরণ অর্থাৎ, মুখের যিকিরের আর প্রয়োজন নেই। তাই তারা মুখের যিকির ছেড়ে দিয়েছে। মনে রাখবেন, এটা শয়তানের ধোঁকা। কারণ, যখন মুখের যিকির ছেড়ে দিয়েছে, তখন ধীরে ধীরে অন্তরের যিকিরও হাতছাড়া হয়ে যাবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন যে, ভিত্তি ভেঙ্গে পড়লে তার উপর গড়ে ওঠা জিনিসও ভেঙ্গে পড়বে।

জাহেল পীরদের এই চিন্তা গোমরাহী

সুতরাং জাহেল পীরদের একটি দল বলে যে, আমরা তো এখন দরবেশ ও ফকীর হয়ে গেছি। এখন তো আমরা সব সময় আল্লাহর স্মরণে আত্মহারা হয়ে থাকি। তাই এখন আমাদের না নামাযের জরুরত রয়েছে, না রোযার জরুরত রয়েছে, না কুরআন পাকের জরুরত রয়েছে, না যিকিরের জরুরত রয়েছে। কারণ, নামাযের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছা। এখন যখন আমাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার যিকির এবং তাঁর চিন্তা বসে গেছে। তাই এখন আর আমাদের নামাযের প্রয়োজন নেই। এখন আমরা মসজিদে যাই, বা

না-যাই, নামায পড়ি, বা না-পড়ি, তাতে কোন অসুবিধা নাই। মনে রাখবেন এটা গোমরাহী। গোমরাহী এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা অন্তরের যিকিরকে এই পর্যায়ের লক্ষ্য বানিয়েছে যে, তারা বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগীকে বেকার মনে করতে আরম্ভ করেছে। এটাই মূল গোমরাহী।

শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর ঘটনা

আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) থেকে হযরত শায়খ আবদুল কাদের (রহ.)-এর এ ঘটনা অনেকবার শুনেছি। তিনি হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর কাছে এ ঘটনা শুনেছেন। ঘটনাটি এই যে– একবার শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় কক্ষের মধ্যে এক বিশাল নূর চমকে উঠল। সেই নূর হযরতকে, তাঁর আশেপাশের সমস্ত জিনিসকে এবং পুরা কামরাকে বেষ্টন করে ফেলল। ঐ নূরের মধ্যে থেকে আওয়াজ এল যে, হে আবদুল কাদের! তুমি আমার সঙ্গে এমন উঁচু স্তরের সম্পর্ক গড়েছো যে, এখন তোমার দায়িত্বে নামাযও ফরয নেই এবং রোযাও ফরয নেই। এখন তুমি যা ইচ্ছা কর। তুমি আমার নৈকট্য লাভ করেছ। উত্তরে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, মরদূদ দূর হ! হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈকট্যের সর্বোচ্চ পর্যায় পৌছা সত্ত্বেও তাঁর নামায মাফ হয়নি, আমার নামায কি করে মাফ হতে পারে। তাই আমি বুঝতে পেরেছি, তুই শয়তান। আমাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছিস। একথা বলতেই সে নূর অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর আরেকটি নূর আত্মপ্রকাশ করল। তার মধ্য থেকে আওয়াজ এল। হে আবদুল কাদের! আজ তোমাকে তোমার ইলম রক্ষা করেছে। অন্যথায় এটি এমন একটি ফাঁদ, যার মাধ্যমে আমি বড় বড় দরবেশকে পরাজিত করেছি এবং তাদেরকে গোমরাহ করেছি। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, মরদূদ দূর হ! আমাকে আমার ইলম রক্ষা করেনি। বরং আমাকে আমার আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আমাকে আবার ধোঁকা দিচ্ছিস। এই দ্বিতীয় ফাঁদটি ছিল প্রথম ফাঁদের তুলনায় অধিক বিপজ্জনক ও সূক্ষ্ম। কারণ, এর মাধ্যমে তাঁকে ইলমের অহংকারে লিপ্ত করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি এ ফাঁদ থেকে বেঁচে যান। তিনি বলেন যে, আল্লাহর দয়া আমাকে রক্ষা করেছে।

মুখের যিকিরকে অব্যাহত রাখতে হবে

মোটকথা! এ ধরনের কথা বলা যে, অন্তরের যিকির আমাদের মন-মগজে গেঁথে গিয়েছে বিধায়, এখন আর মুখের যিকিরের প্রয়োজন নেই। এখন আর

আমার নামাযের প্রয়োজন নেই, এসব গোমরাহী। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন যে, ‘এটা তো খুব ভাল কথা যে, সব সময় আল্লাহর ফিকির অন্তরে থাকছে, আল্লাহর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকছে, যাকে আল্লাহর ওলীগণ ‘তায়াল্লুক মাআল্লাহ’, ‘নিছবাত’ এবং ‘মালাকায়ে ইয়াদ দাশত’ বলে থাকেন। কিন্তু এসব জিনিস মৌখিক যিকিরের মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে। এজন্য এখন মৌখিক যিকির ছেড়ে দিবে না। বরং মৌখিক যিকির কখনই ছাড়বে না। অন্যথায় ভিত্তি ভেঙ্গে পড়লে তার উপর প্রতিষ্ঠিত জিনিসও ভেঙ্গে পড়বে। মন বসুক বা না-বসুক, জোর করে বসে আল্লাহর যিকির করতে থাকবে। নিয়মিত আমল করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পঁয়ত্রিশতম মজলিস

নামাযের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা

নামাযের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে,

> 'প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যক্তির চোখ খুলে নামায পড়ারও অনুমতি রয়েছে এবং চোখ বন্ধ করে নামায পড়ারও অনুমতি রয়েছে। যাদের দৈহিক উপাদানে পিত্ত বা অম্ল বেশি, তাদের বেশির ভাগ লোক এ সমস্ত শর্তের ফলে ঘাবড়ে যায়। বিশেষ করে তার সঙ্গে দৈহিক দুর্বলতা থাকলে, অধিক ঘাবড়ে যায়। দুর্বলতা অধিক শর্তের দাবি করে না, বরং শর্তের স্বল্পতা দাবি করে। শর্তের মাধ্যমে যে প্রভাব অর্জন করা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য দুর্বলতার মাধ্যমেই লাভ হয়।
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৩)

চোখ খোলা অবস্থায় নামায পড়া সুন্নাত

নামাযের বিষয়ে আসল মাসআলা হল– চোখ খোলা রেখে নামায পড়তে হবে। নামায পড়ার সুন্নাত তরীকাও এটি যে, যখন মানুষ নামায পড়বে তখন চোখ বন্ধ করবে না, বরং খোলা রাখবে। যদিও ফকীহগণ একথা বলেছেন যে, চোখ বন্ধ করা ছাড়া কারো যদি নামাযের একাগ্রতা লাভ না হয়, এমতাবস্থায় চোখ বন্ধ করাও জায়েয আছে। তবে সর্বাবস্থায় চোখ খোলা রাখাই উত্তম। এ কারণেই কতক বুযুর্গ বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু নামাযের মধ্যে চোখ বন্ধ করতেন না, বরং চোখ খোলা রেখে নামায পড়তেন, এজন্য ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বরকত চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার মধ্যে রয়েছে। নামাযে মন বসুক বা না-বসুক, ঐ পর্যায়ের একাগ্রতা হোক বা না-হোক, অন্যান্য চিন্তা আসুক বা না-আসুক ইত্তিবায়ে সুন্নাতের সওয়াব চোখ খোলা অবস্থায় নামায পড়ার মধ্যেই রয়েছে। যদিও চোখ বন্ধ অবস্থায় নামায পড়া জায়েয কিন্তু তা উত্তম নয়।

আল্লাহওয়ালাগণ বলেছেন যে, আসল জিনিস তো ইত্তিবায়ে সুন্নাত। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মধ্যে যে নূর রয়েছে, তা অন্য কিছুর মধ্যে নেই। এজন্য নামাযে মন বসুক বা না-বসুক, একাগ্রতা সৃষ্টি হোক বা না-হোক চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার মধ্যেই যেহেতু ইত্তিবায়ে সুন্নাত, তাই আমরা চোখ খোলা রেখে নামায পড়ব।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ইত্তিবায়ে সুন্নাত

এমনকি শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.) বিতরের পর দু' রাকাআত নামায বসে পড়তেন। দাঁড়িয়ে পড়তেন না। অথচ ফকীহগণ পরিষ্কার লিখেছেন যে, নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়লে পুরা সওয়াব এবং বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব হয়। বিতরের পরে দু' রাকাআত সম্পর্কেও ফকীহগণ একথাই লিখেছেন যে, বসে পড়লে অর্ধেক সওয়াব হবে। কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বসে পড়তেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত! এই দুই রাকাআত নামায আপনি বসে পড়েন কেন? দাঁড়িয়ে পড়েন না কেন? উত্তরে হযরত বললেন, বহু রেওয়ায়েতে একথা এসেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের পর দু' রাকাআত নামায বসে পড়তেন। এজন্য আমিও বসে পড়ি। আরেকজন জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত! সওয়াবের ব্যাপারে বিধান কী? কারণ, ফকীহগণ লিখেছেন যে, বসে নামায পড়লে অর্ধেক সওয়াব লাভ হয়, আর দাঁড়িয়ে নামায পড়লে পুরা সওয়াব লাভ হয়। হযরত বললেন যে, সওয়াব তো অর্ধেকই লাভ হয়। এটাই নিয়ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিয়মই বয়ান করেছেন এবং ফকীহগণও এই নিয়মই বয়ান করেছেন। তারপর লোকটি জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত বসে নামায পড়লে যেহেতু অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলে পুরা সওয়াব পাওয়ার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন–

'ভাই! আসল কথা এই যে, ইত্তিবায়ে সুন্নাতের কাজে মন বেশি বসে, যদিও সওয়াব কম হোক না কেন।'

অর্থাৎ, যদি সওয়াব কম পাওয়া যায় তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ যেভাবে করেছেন, তা ঐভাবে করতে মন বেশি বসে। বিতর নামাযের পর নফলসমূহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বসে পড়া প্রমাণিত রয়েছে। এজন্য বসে পড়তে ভাল লাগে। তাতে সওয়াব কম হয়, হোক।

মোটকথা, আমাদের বুযুর্গদের রুচি-প্রকৃতি এই যে, যেভাবে কাজ করার মধ্যে ইত্তিবায়ে সুন্নাত রয়েছে তাকে আকড়ে ধর। চোখ খোলা রেখে নামায পড়া

সুন্নাত। তাতে যদি ঐ পর্যায়ের একাগ্রতা লাভ নাও হয় তারপরও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের যে নূর তাতে রয়েছে, তা চোখ বন্ধ করে নামায পড়ার মধ্যে নেই। এটা হল সাধারণ নিয়ম।

প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যক্তির জন্য চোখ বন্ধ করে নামাযের অনুমতি রয়েছে

কিন্তু হযরত থানবী (রহ.) এই মালফুযে বলেন যে, এক ব্যক্তি নতুন নতুন দ্বীনদারীর দিকে এসেছে। সে নামায পড়তে আরম্ভ করেছে, এখন যদি তুমি তার উপর অনেক বেশি নিয়ম-কানুন আর শর্ত লাগিয়ে দাও, আর তাকে বল যে, দেখ ভাই! চোখ বন্ধ করে নামায পড়বে না, চোখ খোলা রেখে নামায পড়বে। যেহেতু সে ব্যক্তি নতুন নামায পড়ছে। এজন্য তুমি যদি তার উপর বেশি শর্ত চাপিয়ে দাও তাহলে সে পালিয়ে যাবে। তার মনের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে ভয় জন্মাবে। তাই প্রথম পর্যায়ের লোকের উপর বেশি শর্ত চাপানো উচিত নয়। তার উপরে এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা উচিত নয় যে, তাকে চোখ খোলা অবস্থায়ই নামায পড়তে হবে। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের জন্য চোখ খোলা অবস্থায় নামায পড়ারও অনুমতি রয়েছে এবং বন্ধ করে পড়ারও অনুমতি রয়েছে।

অধিক শর্ত ভীতির কারণ হয়

এরপর তিনি এর কারণ বর্ণনা করেন যে, পিত্ত ও অম্লপ্রধান লোকেরা অধিক শর্তের কারণে ঘাবড়িয়ে যায়।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির স্বভাব অম্ল বা পিত্তপ্রধান তার উপর যদি অধিক শর্ত আরোপ করা হয়, আর বলা হয় যে, এ কাজ এভাবে কর, এভাবে করো না; আর এ কাজ এভাবে করো না, এভাবে কর, তাহলে এই বাধ্যবাধকতার ফলে তার মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে যে কাজ সে পূর্বে যথেষ্ট পরিমাণ করছিল, তাও ছেড়ে দেয়। এ কারণে প্রথম পর্যায়ের লোকের উপর বেশি শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। বিশেষ করে তার মনের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে। যেমন বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে শতকরা একশ' ভাগ দুর্বলতা রয়েছে। এমতাবস্থায় অধিক শর্ত মানুষের পেরেশানীর কারণ হয়। এর ফলে মনের একাগ্রতা থাকে না। এ কারণে যে মানুষ দুর্বল তার উপর শর্ত কম আরোপ করা উচিত। শর্ত বাড়িয়ে দেয়া উচিত নয়। কারণ, শর্ত লাগানোর দ্বারা তার যে উপকার হতো, যেমন, তার উপর শর্ত লাগানো হল যে, তুমি চোখ খোলা রেখেই নামায পড়বে। তাহলে এমতাবস্থায় চোখ খোলা রেখে নামায পড়ার ফলে

ইত্তিবায়ে সুন্নাতের যে লাভ তার হতো। সেই একই লাভ দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ইবাদত করার ফলে তার অর্জিত হবে। তার দৈহিক দুর্বলতা ক্ষতিপূরণ করে দিবে। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের উপর বেশি শর্ত আরোপ করার চিন্তা করা উচিত নয়। তাকে ধরে রেখে ইবাদতের দিকে নিয়ে আস। যখন ইবাদত করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন শর্ত আরোপ কর। মূলত: প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের ছাড় দেয়া হয়ে থাকে, ঐ আমলের দিকে নিয়ে আসার জন্য। ঐ সমস্ত আদব ও শর্তকে অস্বীকার করা বা সেগুলোর গুরুত্বকে বিলুপ্ত করা উদ্দেশ্য হয় না। তারবিয়তকারীরা তা খুব ভাল বুঝেন।

একজন খান সাহেবকে সুপথে আনার ঘটনা

হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানবী (রহ.)-এর ঘটনা আছে যে, একবার তিনি একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি একটি মসজিদ বিরাণ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মসজিদটি বিরাণ হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এটি আবাদ কর না কেন? লোকেরা বলল যে, এখানে একজন খান সাহেব আছেন, তিনি এই এলাকার সর্দার। তার দ্বীনদারীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। না নামাযের সাথে সম্পর্ক আছে, না রোযার সাথে সম্পর্ক আছে। সব সময় মদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নেশায় বুদ হয়ে পড়ে থাকে। তার কাছে বাজারী নারীদের আনাগোনা রয়েছে। নামাযের প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। তার কারণে পুরা বসতি খারাপ হয়ে গেছে। খান সাহেব নামায পড়তে মসজিদে এলে বসতির সবাই নামায পড়তে আরম্ভ করবে।

মাওলানা রহমতুল্লাহ (রহ.) বললেন, আমাকে তার ঠিকানা বলে দাও এবং তার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। লোকেরা খান সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে দিল। মাওলানা সাহেব দাওয়াত দেওয়ার জন্য তার বাড়ি গেলেন। তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে মাওলানা সাহেব বললেন, 'ভাই খান সাহেব! মাশাআল্লাহ আপনি একজন মুসলমান। আপনাদের মহল্লায় মসজিদটি বিরাণ হয়ে পড়ে আছে। আপনি যদি মসজিদে নামায পড়তে যান, তাহলে আপনাকে দেখে অন্যরা মসজিদে আসবে। ফলে মসজিদ আবাদ হবে। এতে আপনার আমলনামায় অনেক নেকী জমা হবে। মাওলানা এমনভাবে দাওয়াত দিলেন যে, খান সাহেবের উপর তাঁর কথার প্রভাব পড়ল। কিন্তু খান সাহেব বললেন যে, আমি নামায পড়তে তৈরি আছি। তবে আমার দ্বারা অযু করা সম্ভব নয়। অযু করার ক্ষমতা আমার নেই। দ্বিতীয় হল– আমার দ্বারা মদ ছাড়া সম্ভব নয়। তৃতীয়– নারীদের যাতায়াত আমার দ্বারা বন্ধ হবে না। এমতাবস্থায় আমি কী নামায পড়ব। এজন্য আমি নামাযে যাই না। মাওলানা সাহেব তো প্রথমে অস্থির হয়ে পড়লেন যে, একে কি উত্তর দিবেন।

তারপর তিনি বললেন যে, আচ্ছা তুমি নামায পড়তে তৈরি আছো কি না? খান সাহেব বললেন যে, হ্যাঁ আমি নামায পড়তে তৈরি আছি। কিন্তু আমি অযু করতে পারবো না। মাওলানা সাহেব বললেন যে, আচ্ছা অযু ছাড়াই নামায পড়। আর অন্যান্য বিষয়ও চলতে থাকবে। কোন অসুবিধা নেই। খান সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অযু ছাড়া নামায পড়ব! মাওলানা সাহেব বললেন যে, হ্যাঁ অযু ছাড়াই নামায পড়বে। তবে নামাযের জন্য মসজিদে যাবে। খান সাহেব বললেন যে, এত সহজ বিষয় হলে ঠিক আছে যাব। মাওলানা সাহেব বললেন যে, 'ওয়াদা কর নামাযের জন্য তুমি মসজিদে যাবে।' খান সাহেব ওয়াদা করল, 'হ্যাঁ! আমি ওয়াদা করছি। নামায পড়তে আমি মসজিদে যাব।'

মাওলানা সাহেব এখানে তো ওয়াদা নিয়ে নিলেন এবং অযু ছাড়া নামায পড়তে অনুমতিও দিলেন, তবে তার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা ঐ মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দু' রাকাআত নামায পড়লেন। নামাযের পর সিজদায় গিয়ে খুব কাঁদলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলেন যে, 'হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতা এতটুকুই ছিল। সামনের কাজ আপনিই করে দিন।'

নামাযের সময় যখন হল। তখন খান সাহেবের মনে পড়ল যে, আমি ওয়াদা করেছি, তাই নামাযের জন্য আমার মসজিদে যাওয়া উচিত। তাই সে যাওয়ার ইচ্ছা করল। ঘর থেকে যখন বের হতে লাগল, তখন তার মনের মধ্যে এই চিন্তা জাগল যে, আজ তো প্রথমবার নামাযের জন্য যাচ্ছি। যদিও মৌলভী সাহেব বিনা অযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তুমি এতদিন পর প্রথমবার নামায পড়তে যাচ্ছ। কমপক্ষে আজকেতো অযুই করে নাও। শুধু অযু নয়, বরং আজ প্রথম দিন গোসল করে যাও। তারপর চাইলে অযু ছাড়া নামায পড়ো। সুতরাং সে গোসল করল। পাক-পরিষ্কার কাপড় পড়ল। সুগন্ধি লাগাল এবং ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গেল। যখন সে নামায পড়ল, তখন তার মনের অবস্থাই পাল্টে গেল। নামায পড়ে ফিরে আসার পর আল্লাহ তাআলা তার মনের মধ্যে মদ, নারী ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিলেন। তারপর খান সাহেব এমন পাকা নামাযী হলেন যে, অযু সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে আরম্ভ করলেন।

বিনা অযুতে নামায পড়তে অনুমতি দানের উপর আপত্তি

এখন নিরেট দুনিয়াত্যাগী এখানে আপত্তি করবে যে, মাওলানা সাহেব! খান সাহেবকে বিনা অযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। অথচ অনেক সময় বিনা অযুতে নামায পড়া কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু আপত্তিকারীরা এটা দেখল

না যে, মাওলানা সাহেব একদিকে তো খান সাহেবকে বিনা অযুতে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। অপর দিকে তিনি মসজিদে এসে সিজদায় পড়ে কেঁদে কেটে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! এ পর্যন্ত তো আমি নিয়ে এসেছি, বাকিটা আপনার হাতে।

আসল ব্যাপার এই ছিল যে, কোন কোন সময় প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের উপর থেকে শর্ত ও বাধ্যবাধকতা হটিয়ে দিলে তাকে সঠিক পথে আনার জন্য তা উপকারী হয়। তবে এটা সবার কাজ নয় যে, তুমিও বিনা অযুতে নামায পড়ার ফতোয়া দিয়ে দিবে। বরং যেসব বান্দার কথা ও কাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা প্রভাব দান করেন, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে অন্তর্জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং বেদনা ও জ্বালা দান করেন, তাদের জন্যই এমন কথা মুখ দিয়ে বলার হক রয়েছে। হাফেয শিরাযী (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ কবিতা রয়েছে যে–

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید
کہ سالک بے خبر نبود زراہ ورسم منزلہا

অর্থাৎ, 'খাঁটি পীর বললে মদ দ্বারা জায়নামাযকে রঞ্জিত কর। কারণ অনভিজ্ঞ পথিক গন্তব্যের পথ ও পন্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে না।'

মানুষ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, 'জায়নামাযকে মদ দ্বারা রঞ্জিত কর'। এটা কিভাবে সম্ভব! কিন্তু এই কবিতা মূলত: এ ধরনের ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মোটকথা, প্রাথমিক পর্যায়ের লোক, যে মাত্র এ পথে এসেছে, তার উপর অধিক বাধ্যবাধকতা ও শর্ত লাগানোর জরুরত নেই। একইভাবে কোন ব্যক্তি সবেমাত্র একাগ্রতা সৃষ্টির দিকে মনোযোগী হয়েছে, মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য কোন সময় চোখ বন্ধ করে নামায পড়তে চায়, তাহলে সে চোখ বন্ধ করেই নামায পড়তে থাকুক। এর অনুমতি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ, এমন ব্যক্তি যখন একাগ্রতার সাথে নামায পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন চোখ খোলা রেখেও সে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করতে থাকবে। তবে সর্বাবস্থায় সেটাকেই সুন্নাত এবং উত্তম মনে করবে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করুন এবং সুন্নাতের উপর আমলের তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ছত্রিশতম মজলিস

নিয়মিতভাবে আমল-অযীফা আদায় করা

নিয়মিতভাবে আমল-অযীফা আদায় করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

নিয়মিত অযীফার চেয়েও অধিক যিকির করার হুকুম

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'নিয়মিত অযীফার চেয়ে অধিক যিকির যদি করতে মন চায়, তাহলে করবে। তবে ঐ অতিরিক্ত যিকিরকে আবশ্যকীয় মনে করবে না এবং কিছুদিন পর যদি নিয়মিত করতে পারবে বলে আশা জাগে, তাহলে আবশ্যকীয় করে নিবে।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৩)

উত্তম আমল

এটা সে কথাই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন। এর ভিত্তিতেই সমস্ত নেককার লোকের নিয়ম এই ছিল যে, মানুষ সর্বনিম্ন পরিমাণ আমল নির্ধারণ করে নিবে। যা সে নিয়মিত আমল করতে পারবে। চাই তা এক তাসবীহ হোক, কিন্তু নিয়মিতভাবে করবে। এরূপ করবে না যে, একদিন তো পঞ্চাশ তাসবীহ পড়ল, আর দ্বিতীয় দিন বাদ। অল্প করবে কিন্তু নিয়মিত করবে। এতে অধিক সওয়াব রয়েছে। এটা অধিক উত্তম পন্থা এবং অধিক উপকারীও বটে। হাদীস শরীফে আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাযি.) এবং হযরত উম্মে সালামা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করল যে, কোন আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক পসন্দনীয় ছিল। তাঁরা (রাযি.) দু'জন উত্তরে বললেন–

مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পসন্দনীয় আমল এটা যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হোক না কেন। কারণ, এর দ্বারা ফায়দা বেশি হয়।

(তিরমিযী)

নিয়মিত আমল উপকারী হওয়ার দৃষ্টান্ত

মনে করুন, একটি নল দিয়ে এক ফোঁটা করে পানি পড়ছে, তবে নিয়মিত পড়ছে। তার নিচে যত শক্ত পাথরই থাক, ঐ ফোঁটা ফোঁটা পানি একদিন না একদিন ঐ পাথরের মধ্যে ছিদ্র করে দিবে। যদি তা নিয়মিত পড়তে থাকে। অপর দিকে যদি আপনি পুরা চাপ দিয়ে কল খুলে দেন এবং পূর্ণ শক্তি সহকারে পানি প্রবাহিত হতে থাকে, অল্পক্ষণ পর আপনি ঐ কল বন্ধ করে দিলেন। তাহলে ঐ পানি দ্রুত প্রবাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু তা পাথরের মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না। অথচ এক ফোঁটা পানি পাথরকে ছিদ্র করে দিল। কারণ, ঐ এক ফোঁটা পানি যদিও পরিমাণের দিক থেকে কম, কিন্তু তা নিয়মিত পড়েছে। ফলে তা প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ঠিক একইভাবে একদিন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে খুব ইবাদত করল এবং খুব যিকির করল, কিন্তু পরের দিন খবর নেই– এর দ্বারা বিশেষ কোন ফায়দা হয় না। যাইহোক! যেই নফল আমল নিয়মিত করা যায়, তা অধিক কার্যকর, অধিক উপকারী এবং অধিক উত্তম। যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

আমল অল্প নির্ধারণ কর কিন্তু নিয়মিত কর

এ কারণেই আল্লাহওয়ালাগণ বলেন যে, কোন মানুষ যখন নিজের জন্য যিকির ও তাসবীহের অযীফা নির্ধারণ করবে, তখন অল্প পরিমাণ নির্ধারণ করবে। যাতে তা নিয়মিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি প্রতিদিন এক তাসবীহ নিয়মিত করতে পারে, তাহলে এক তাসবীহই নির্ধারণ করবে। এমনিভাবে যদি প্রতিদিন এক পারা তেলাওয়াত করতে পারে, তাহলে এক পারা নির্ধারণ করবে। যদি এক পারা পড়তে না পারে তাহলে আধা পারা নির্ধারণ করবে। যদি আধা পারা পড়তে না পারে, তাহলে পোয়া পারা নির্ধারণ করবে। যদি পোয়া পারা পড়তে না পারে, তাহলে প্রতিদিন এক রুকু নির্ধারণ করবে। কিন্তু যেটা নির্ধারণ করবে, তা নিয়মিতভাবে পুরা করবে। আজ আমল করল কাল ছেড়ে দিল, পরশু আমল করল তারপর আবার ছেড়ে দিল। এর দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোন ফায়দা হাসিল হয় না। হযরত আলী (রাযি.) বলেন–

قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ

অর্থাৎ, অল্প আমল যদি তা নিয়মিত কর, আল্লাহর কাছে তার আশা বেশি আশা করতে পার ঐ আমলের তুলনায়, যা অনিয়মিত হয়, যদিও তা পরিমাণে বেশি হোক না কেন। যেমন আজ করলে কাল ছেড়ে দিলে, পরশু করলে আবার পর দিন ছেড়ে দিলে।

অতিরিক্ত যিকিরকে অযীফার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর না

তবে কতক সময় এমন হয় যে, প্রথম প্রথম যখন কেউ যিকির আরম্ভ করে, তখন যিকিরের মধ্যে মন বসে মনে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। তখন অধিক যিকির করতে মন চায়। এ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক যিকির করতে মন চাইলে ভাল কথা, তখন অধিক যিকির করবে। কিন্তু ঐ অতিরিক্ত যিকিরকে নিজের অযীফার অন্তর্ভুক্ত করবে না। অযীফা ঐ পরিমাণই রাখবে, যা তুমি নিয়মিত করতে পারবে। যেমন, আজকে অধিক যিকির করতে মন চাচ্ছে তাহলে আজকে অধিক যিকির কর। কিন্তু অযীফা ঐ পরিমাণকেই রাখ, যা সব সময় করে আসছ। তবে ঐ অতিরিক্ত যিকির যদি নিয়মিত হতে থাকে, তাহলে পরবর্তীতে তাকেও অযীফার অন্তর্ভুক্ত করে নিবে।

ঐ যিকিরই পুনরায় আদায় কর

বুযুর্গদের নিয়ম এই যে, যখন কোন মানুষ কোন বুযুর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর তিনি তাকে কোন যিকির বলে দেন এবং বলেন যে, এই যিকিরটি প্রতিদিন করবে। যখন সে এভাবে যিকির করে আর যিকিরের মধ্যে প্রফুল্লতা অনুভব হয়, তখন সে শায়খকে বলে যে, আমাকে আরো যিকির দিন, আরো যিকির করতে মন চাচ্ছে। এমন সময় আমাদের বুযুর্গগণ তাকে নতুন যিকির না দিয়ে বলেন যে, ঐ যিকিরই আবার করবে। যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশ' বার পড়তে এখন তা দু'শত বার পড়। যাতে এমন না হয় যে, জোশে এসে যিকিরের পরিমাণ বাড়াল কিন্তু কিছুদিন পর অলসতায় ধরল আর সে তা ছেড়ে দিল।

কতক লোক এমন আছে, যারা চায় যে, সবকিছু এক রাতেই করে ফেলবে। পবিত্র রমযান মাসের রাতগুলোতে তো বিশেষভাবে এই জোশ সৃষ্টি হয়। মনে হয় যে, সব ইবাদত আজ রাতেই করে ফেলি। সুতরাং সব জোশ ঐ এক রাতেই ঠাণ্ডা করে ফেলে, আর পরের দিন ঘুমিয়ে থাকে। তারপর ফরয নামাযেরও আর গুরুত্ব থাকে না। তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল নামায তো দূরের কথা।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর একটি মালফূয

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর একটি বাণী আমি আমার আব্বার কাছে শুনেছি। তিনি বলতেন যে, যখন তুমি কোন ইবাদত করবে তা নামায হোক, যিকির হোক, তেলাওয়াত হোক, ঐ ইবাদত মন ভরে যাওয়ার একটু পূর্বে ছেড়ে দিবে। ইবাদতে আগ্রহ একেবারে শেষ করবে না। বরং ইবাদতের আগ্রহ অন্তরে থাকা অবস্থায় তা বন্ধ করে দিবে। যেমন খানার

ব্যাপারেও বুযুর্গগণ বলেন যে, খাওয়ার কিছু চাহিদা বিদ্যমান থাকতেই খাওয়া বন্ধ করে দিবে। এ পরিমাণ পেট ভরে খেয়ো না যে, শ্বাস নেয়ার অবস্থাও থাকে না। এমনিভাবে নফল ইবাদতের কিছু আগ্রহ বাকি থাকতেই তা ছেড়ে দাও। আগ্রহ একেবারে শেষ করে ফেলো না।

'ইয়ো ইয়ো'র দৃষ্টান্ত

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) 'ইয়ো ইয়ো' দিয়ে এর দৃষ্টান্ত দিতেন। 'ইয়ো ইয়ো' দিয়ে বাচ্চারা খেলা করে। বর্তমানে এটার প্রচলন নেই। আমাদের দেওবন্দে এটাকে 'চকডোর' বলত। এখানে সম্ভবত: এটাকে 'চাক্কী' বলা হয়। এটা গোল একটা চাকার মত জিনিস। এর সাথে সুতা জড়ানো থাকে। এটা দূরে নিক্ষেপ করে আবার টেনে আনা হয়। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন যে, 'ইয়ো ইয়ো'র নিয়ম হল, তার সাথে সুতা জড়ানো থাকে। যখন তা নিক্ষেপ করা হয়, তখন সুতা খুলে যায়। ওটা নিক্ষেপ করার সময় যদি সুতা পুরোটা খুলে যায়, তাহলে ঐ চাকা আর সূতো জড়ানো অবস্থায় ফেরত আসবে না। ঐ সুতা নিজে নিজে পুনরায় জড়াবে না। যদি সুতা অল্প কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে টান দিলে ঐ চাকাও ফিরে আসে এবং সুতাও পুনরায় জড়িয়ে যায়।

আগ্রহ থাকতে ইবাদত বন্ধ কর

এই দৃষ্টান্ত দিয়ে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন যে, এমনিভাবে ইবাদত করার সময় যদি পুরা সুতা তুমি খুলে দাও এবং এত অধিক পরিমাণ ইবাদত কর যে, জোশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ইবাদত করার আর আগ্রহ না থাকে, তাহলে তুমি পুনরায় আর ইবাদতের দিকে ফিরে আসবে না। আর যদি অল্প আগ্রহ অবশিষ্ট থাকতে ইবাদত বন্ধ করে দাও, তাহলে তুমি পুনরায় ইবাদতের দিকে ফিরে আসবে।

মন ইবাদতের মধ্যে আটকে থাকা ভাল

আমার আব্বা হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার পর বলতেন যে, কোন মানুষ দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থেকে যদি তার মন ইবাদতের কাজে আটকা থাকে এবং সে চিন্তা করে যে, কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে গিয়ে ইবাদত করব– তাহলে তা এর চেয়ে উত্তম যে, তুমি ইবাদত করছ, কিন্তু তোমার মন দুনিয়ার সাথে আটকে আছে। তুমি চিন্তা করছ যে, জলদি ইবাদত শেষ করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

কিছু আক্ষেপ রেখে দাও

হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) নিম্নের কবিতাটি খুব বেশি পাঠ করতেন। আমার যখনই মক্কা-মদীনা যাওয়ার সুযোগ হয় এবং শেষবারের মত দু'আ থেকে অবসর হয়ে যখন সেখান থেকে ফিরে আসি, তখন এই কবিতাটি খুব মনে পড়ে–

کہ چکا جی بھر کے جو کچھ ان سے کہنا تھا مجھے
پھر بھی اب تک حسرت شرح تمنا دل میں ہے

অর্থ, 'তাঁর সাথে যা বলার ছিল, তাতো বলেছিই, কিন্তু আরো বলার আক্ষেপ অন্তরে রয়ে গেছে।'

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এটাই বলতেন যে, কিছু আক্ষেপ অন্তরে রেখে দাও। একবারেই সব আবেগ শেষ করে দিও না। যাতে এই আক্ষেপ পুনরায় তোমাকে ইবাদতের দিকে টেনে নিয়ে আসে।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু এ উদ্দেশ্যের জন্যে শায়খের প্রয়োজন পড়ে। তার জন্য কোনটা উপকারী, সে ফায়সালা শায়খ দিয়ে থাকেন। তার জন্য কোন সময় ইবাদত বন্ধ করা উচিত এবং কোন সময় ইবাদতের অনুমতি দেয়া উচিত তা শায়খ ফায়সালা করেন। কোন মানুষ যদি নিজের মর্জি মত তা করতে থাকে, তাহলে অনেক সময় সে পথ হারিয়ে ফেলে। অনেক মানুষকে আমি দেখেছি যে, তারা হঠাৎ ইবাদতের জোশের মধ্যে এসে যায়। সারা রাত দাঁড়িয়ে নফল পড়তে থাকে। এক দিনে পুরা কুরআন খতম করে। আরো অনেক তাসবীহও পাঠ করে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই জোশ টিকে থাকে। এমনকি মানুষ তাকে দেখিয়ে বলতে আরম্ভ করে যে, অমুক তো এখন নামাযী, ইবাদতগুজার ও তাহাজ্জুদগুজার হয়ে গেছে। কিন্তু এক সপ্তাহ পর আর তাকে মসজিদে দেখা যায় না। জামাতেও হাযির হয় না। এবার সব জোশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এজন্য শায়খের প্রয়োজন পড়ে। শায়খ তাকে ভারসাম্যের মধ্যে রাখে।

নীরবে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনো

এজন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এক অপূর্ব কথা বলেছেন যে, 'নিজের মধ্যে এভাবে পরিবর্তন আন, যেন মানুষ তোমার দিকে আঙ্গুল তুলে না দেখায়।' নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনার ফলে মানুষ যদি আঙ্গুল তুলে দেখায়

তাহলে এতে ফিতনা সৃষ্টি হবে। তখন তার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এভাবে পরিবর্তন আনো, যেমন ধীরে ধীরে শিশু বালেগ হয়। শিশুকে যদি প্রতিদিন ফিতা দিয়ে মাপ যে, আজ কতটুকু বড় হল, কাল কতটুকু বড় হল, কতটুকু তারতম্য সৃষ্টি হল, তাহলে ফিতা দ্বারা এর তারতম্য বুঝা যাবে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে ঠিকই যুবক হয়ে যাবে। কোন দিন কতটুকু বড় হল তা জানা নেই। কিন্তু প্রতিদিন সে বড় হচ্ছে। অবশেষে সে যুবক হবে। সে জন্য এমনভাবে পরিবর্তন আন, যেন মানুষ আঙ্গুল তুলে না দেখায়। কারণ, যখন আঙ্গুল তুলে দেখাবে, তখনই ঐ ব্যক্তির অহংকার ও আত্মশ্লাঘায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এতটুকু অযীফা নির্ধারণ কর যা নিয়মিত পালন করতে পারবে

মোটকথা, যখন অযীফা নির্ধারণ করবে, তখন এতটুকু পরিমাণ নির্ধারণ করবে, যতটুকু তুমি নিয়মিত পুরা করতে পারবে। জোশে এসে বেশি অযীফা নির্ধারণ করবে না। এজন্য একজন রাহবার, একজন পথপ্রদর্শক ও মুর্শিদের প্রয়োজন হয়। তিনি বলে দেন যে, এই পরিমাণ অযীফা নির্ধারণ কর। এর চেয়ে বেশি কর না। তিনি জানেন যে, তোমার জন্য কতটুকু উপকারী এবং কতটুকু ক্ষতিকর। এজন্যই বলা হয় যে, কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া, কোন আল্লাহওয়ালার কাছে যাওয়া ছাড়া এবং তার থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা ছাড়া সাধারণত: সংশোধন হয় না। এজন্য বার বার তাগিদ করা হয় যে, কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ুন এবং তার নির্দেশনায় পথ চলুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাতত্রিশতম মজলিস

অযীফা ছুটে গেলে আক্ষেপ ও অনুতাপ করা

অযীফা ছুটে গেলে আক্ষেপ ও অনুতাপ করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

এক ব্যক্তি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে লিখে যে,

'আমার সবচেয়ে বড় যে রোগ তা হল সাহসহীনতা। আমার দ্বারা কোন কাজ হয় না।'

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) লিখেন–

'যতটুকুই হয়, তা যেটুকু হয় না তার অনুতাপের সাথে মিলে বঞ্চিত হতে দিবে না।' (আনফাসে ঈসা, ৬৩ পৃষ্ঠা)

ফরয আমলে অলসতার চিকিৎসা

এ ব্যক্তি নিজের যে রোগের কথা লিখেছে তা বাস্তবে আমাদের প্রায় সকলের মধ্যেই রয়েছে– তাহলো কাজ করার সাহস হয় না। সাহসহীনতার অভিযোগ সব সময় থাকে। হযরত থানবী (রহ.)-এর উত্তর বুঝার পূর্বে এ কথাটি বুঝে নিন যে, কাজ করার সাহস না হওয়া দু' প্রকারের। এক হলো– ঐ ব্যক্তি যার ফরয ও ওয়াজিব আদায় করারই সাহস হয় না! যেমন, নামায ফরয, কিন্তু এই ফরয আদায়ের সাহস পাচ্ছে না, বা রোযা ফরয, কিন্তু রোযা রাখার সাহস হচ্ছে না। এর একমাত্র চিকিৎসা হল– নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই ফরয সম্পাদন করবে। যদিও এই কাজ করতে মন চাচ্ছে না, তারপরও জোর করে নিজেকে ঐ কাজে নিয়ে যাবে।

গোনাহ থেকে বাঁচার চিকিৎসা

একই অবস্থা গোনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রেও। যে সমস্ত গোনাহ স্পষ্ট, কিন্তু সেগুলো থেকে বাঁচার হিম্মত হচ্ছে না। এর একমাত্র চিকিৎসা হল– আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করবে, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করবে, জোর করে নিজেকে ঐ গোনাহ থেকে বাঁচাবে এবং দূরে রাখবে। তাই ফরয ও ওয়াজিব আদায় করার ক্ষেত্রে এবং গোনাহ থেকে বাঁচার হিম্মত না হলে তার চিকিৎসা এটাই যে, নিজের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। জান যায় যাক, যা কিছু

হওয়ার হোক, আমি তো এ ফরয আদায় করবই এবং এই গোনাহ থেকে বাঁচবোই। এছাড়া এর এমন কোন ঔষধ নেই, যা গুলিয়ে মানুষকে পান করালে ফরয, ওয়াজিব আপনা-আপনি আদায় হতে থাকবে। এক্ষেত্রে সাহসকে প্রয়োগ করতেই হবে। এটি হল প্রথম প্রকার।

অযীফা আদায়ের ক্ষেত্রে সাহসহীনতা

দ্বিতীয় প্রকার হল, একজন মানুষ তার নিজস্ব সামর্থ্য অনুপাতে ফরয, ওয়াজিব আদায় করছে, যথাসময়ে নামায পড়ছে, রোযা রাখছে। যথাসম্ভব গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে, তবে নফল ও যিকির করার সাহস হচ্ছে না, নির্ধারিত অযীফা পালন করার সাহস করছে না। একদিন অযীফা পালন করলে আরেক দিন ছুটে যায়, বা মন চায় অধিক যিকির ও নফল পড়তে, কিন্তু সাহস হয় না বা শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে মন চায়, কিন্তু ঘুম ভাঙ্গে না, উঠতে পারে না। এজন্য ইশা এবং বিতর নামাযের মাঝখানে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকাত নামায পড়ে নেয়। উপরোক্ত প্রশ্ন এমন ব্যক্তিই করেছে যে, আমার সাহস কম। আমার দ্বারা কোন কাজ হয় না। এর উদ্দেশ্য হল, নফল নামায ও অধিক যিকির-আযকার করার হিম্মত হয় না।

'অনুতাপ' বঞ্চিত হতে দিবে না

এ ব্যক্তির উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে−

> 'যতটুকু হয়, তা যেটুকু হয় না তার অনুতাপের সাথে মিলে বঞ্চিত হতে দিবে না।' (আনফাসে ঈসা, ৬৩ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ, যতটুকু নফল আমল সম্ভব হচ্ছে বা করছে, যেমন এক হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়তে পারছে না, তাই একশ' বার পড়ছে বা যে সমস্ত তাসবীহ অযীফা ছিল তা পড়তে পারছে না। শুধু নামাযের পর তাসবীহে ফাতেমী পড়ছে বা রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য উঠতে পারছে না, এজন্য ইশার নামাযের পর তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকাত পড়ছে। এ ব্যক্তি যতটুকু সম্ভব আমল করছে, সাথে সাথে এর জন্য তার আক্ষেপও হচ্ছে, আফসোস করছে যে, আমার দ্বারা কিছু হচ্ছে না, আমি তো কিছু করতে পারছি না। তাহলে ঐ ব্যক্তির এই অল্প আমল না করতে পারা আমলের আক্ষেপের সাথে মিলে ইনশাআল্লাহ মাহরূম থাকতে দিবে না।

এই আক্ষেপ অনেক বড় নিয়ামত

কারণ এই অনুতাপ, এই অনুশোচনা এবং এই আক্ষেপ যে, আমি বেশি আমল করতে পারছি না, এটাও বড় জিনিস। কারণ, আল্লাহ তাআলা এই অনুতাপ ও

আক্ষেপের কারণেও দান করে থাকেন। আমার আব্বাজান (রহ.) বলতেন যে, না পাওয়ার এই আক্ষেপও বিরাট দৌলত। অর্থাৎ, এ বিষয়ে আক্ষেপ যে, আমার দ্বারা এ-কাজ হল না, এটি বড় দৌলত। এসব কথা হল নফলের বিষয়ে। ফরযের ব্যাপারে শুধু আক্ষেপ দ্বারা কাজ হবে না। ঐ ফরযও আদায় করতে হবে। তবে নফলের বিষয়ে একথা ঠিক যে, যদি নফল কাজ না হওয়ার কারণে আক্ষেপ হয় যে, আল্লাহর কত নেক বান্দা রাতে উঠে, আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়, তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে, কুরআন তেলাওয়াত করে, কিন্তু আমার দ্বারা এসব আমল হয় না– এই আক্ষেপও বড় দৌলত, বড় নিয়ামত।

কঠিন ওজরের সঙ্গে আক্ষেপ সওয়াবের কারণ

কঠিন ওজরের সঙ্গে যদি এই আক্ষেপ হয়, তাহলে এই আক্ষেপ নিশ্চিতরূপে আসল আমলের সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যেমন কেউ আফসোস করছে যে, অসুস্থতার কারণে বিছানায় পড়ে আছি। উঠতে পারছি না। যদি অসুস্থ না হতাম এবং সুস্থ থাকতাম, তাহলে খুব নফল নামায পড়তাম, খুব যিকির-আযকার করতাম। হায় আফসোস! আমার দ্বারা নফল আদায় হচ্ছে না। যেহেতু এই আক্ষেপ ওজরের কারণে, তাই নিশ্চিতভাবে এই ওজর আমল পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। সে ঐ পরিমাণ সওয়াবই পাবে, সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়লে যে পরিমাণ পেত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) এবং কর্মকারের ঘটনা

আরেক অবস্থা এই যে, নফল পড়তে কোন ওজর নেই, তবে সাহসহীনতা রয়েছে। সাহস না থাকার কারণে, আক্ষেপ হচ্ছে যে, যদি সাহস থাকত, তাহলে এই আমল করতাম। এই আক্ষেপকারীও ইনশাআল্লাহ মাহরূম হবে না। আমার আব্বাজান (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ঘটনা শুনাতেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) অনেক উঁচু স্তরের আল্লাহর অলী ছিলেন, অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং ফকীহ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখল। স্বপ্নের মধ্যে সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন।

তিনি উত্তরে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা অনেক দয়ার আচরণ করেছেন। অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। তবে আমি ঐ মর্যাদা পাইনি, যা আল্লাহ তাআলা ঐ কর্মকারকে দান করেছেন, যে আমার বাড়ির সামনে থাকত। সেই কর্মকার আমার উপরে উঠে গেছে।

স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি যখন জাগ্রত হল, তখন সে খুঁজতে লাগল ঐ কর্মকার কে? এবং সে কি আমল করত, যার ফলে সে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর

চেয়ে উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছে? তখন সে ঐ মহল্লায় গেল এবং তথ্য তালাশ করল। তখন জানতে পারল যে, বাস্তবিকই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর বাড়ীর সামনে একজন কর্মকার থাকত এবং সে লোকটি মারা গেছে। তখন সে ঐ কর্মকারের বাড়ি গেল এবং তাঁর স্ত্রীকে পুরা স্বপ্ন বলল। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার স্বামী এমন কি নেক আমল করতেন? যার ফলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থেকে উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলেন।

আযানের আওয়াজ হলে কাজ বন্ধ করে দিতেন

তাঁর বিবি জবাব দিল যে, সে সারা দিন হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটাতো। বিশেষ কোন নেক আমল করত না, তবে তাঁর মধ্যে দু'টি গুণ ছিল। একটি এই যে, যখন তিনি লোহা পিটাতেন, এমন সময় যদি তাঁর কানে আযানের আওয়াজ আসত, তাহলে সাথে সাথে কাজ বন্ধ করে মসজিদে যেতেন। এমনকি লোহায় আঘাত করার জন্য হাতুড়ি মাথার উপরে উঠিয়েছেন, এমতাবস্থায় যদি আযানের আওয়াজ কানে আসত, তখন ঐ হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করাও সহ্য করতেন না। বরং হাতুড়ি পিছন দিকে ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য চলে যেতেন। এটি একটি গুণ ছিল।

আক্ষেপ তাকে এগিয়ে দিল

দ্বিতীয় গুণ এই যে, আমাদের বাড়ির সামনে বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থাকতেন। তিনি সারা রাত ঘরের ছাদের উপর আল্লাহ তাআলার ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁকে দেখে মনে হত একটি কাঠ দাঁড়িয়ে আছে। আমার স্বামী তাঁকে সারা রাত ইবাদত করতে দেখে আক্ষেপ করে বলতেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এত বড় মুহাদ্দিস, এত বড় বুযুর্গ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবসর দান করেছেন। যে কারণে তিনি সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করেন। আমিও যদি অবসর পেতাম, তাহলে আমিও তাঁর মত রাতের বেলা ইবাদত করতাম।

আমার আব্বা বলতেন যে, আল্লাহ তাআলা ঐ কর্মকারকে তার আক্ষেপের কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থেকে উঁচু মর্যাদা দান করেন। এ কারণে এই আক্ষেপও বড় দৌলত। মোটকথা, নফল ইবাদত ও যিকির-আযকার অধিক করতে না পারলে, আর সেজন্য অন্তরে যদি আক্ষেপ জন্মায়, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে না। এ কারণে হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে লিখেছেন যে, 'যতটুকুই হয়, তা যেটুকু হয়নি, তার আক্ষেপের সঙ্গে মিলে বঞ্চিত থাকতে দিবে না' ইনশাআল্লাহ।

এই উত্তর দ্বারা এদিকে ইশারা হয়ে গেছে যে, যতটুকু হয় ততটুকুই করবে। পুরা না হলে অর্ধেকই করবে। সম্পূর্ণটা করার চিন্তায়, অসম্পূর্ণটা বাদ দিবে না। তাহলে সম্পূর্ণ না হওয়ার আক্ষেপের কারণে, সম্পূর্ণ আমলেরই সওয়াব পাওয়ার আশা রয়েছে।

যিকিরের মাধ্যমে প্রফুল্লতা অর্জন না হওয়ার অভিযোগ

অপর এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে লিখেছেন যে–

> 'কিছু যিকির ও তেলাওয়াততো আরম্ভ করেছি। ইশার পর তাহাজ্জুদও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এখনও অন্তরে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়নি।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৪)

অনেক লোকেরই এ অভিযোগ থাকে যে, আমরা যিকিরও করি, তেলাওয়াতও করি, কিন্তু কোন প্রফুল্লতা, আনন্দ ও উৎফুল্লভাব অনুভূত হয় না। এর ফলে মানুষ মনে করে যে, আমার এই আমল বৃথা বা আমার অন্তর পাষাণ। যার কারণে প্রফুল্লতা সৃষ্টি হচ্ছে না বা আল্লাহই জানেন কি সমস্যা রয়েছে। এর ফলে সে পেরেশান হয়। অনেক সময় নিরাশ হয়ে যায়।

এই তাওফীকও নিয়ামত

উত্তরে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে,

> ''রহমত' তো লাভ হয়েছে এবং সে রহমত পথনির্দেশ করছে। প্রফুল্লতা এ রহমতের দাসী। যথাসময়ে সেও এসে হাজির হবে।' (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, আসল জিনিস তো আল্লাহ তাআলার রহমত। তথা আমলের তাওফীক লাভ হওয়া। এই যে, আমলের তাওফীক হচ্ছে, এটা অনেক বড় নিয়ামত। এর মূল্যায়ন কর, এর জন্য শোকর আদায় কর। এই রহমত তোমাকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছে। বাকি রইল প্রফুল্লতা। তা তো এই রহমতেরই দাসী। তার পালা যখন আসবে, সে তখন নিজেই এসে উপস্থিত হবে। আর তার আসতে হবে, এমন কোন জরুরীও নয়। সারা জীবনেও যদি প্রফুল্লতা লাভ না হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

স্বাদ ও ভাব উদ্দেশ্য নয়

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এবং হযরত হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর সিলসিলায় এ বিষয়টি দুধ আর পানির মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এতে কোন প্রকার সন্দেহ বাকী নেই। তাহলো আমল নিজেই উদ্দেশ্য। এই আমলের মাধ্যমে ভাব ও স্বাদ অর্জন হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, আমল করার

ফলে স্বাদ উপভোগ হচ্ছে, মজা পাওয়া যাচ্ছে, মন নরম হচ্ছে, কান্না আসছে এ জিনিসগুলো স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য নয়। এগুলো লাভ হলেতো আল্লাহর নিয়ামত। আর লাভ না হলে কোন ক্ষতি নেই। আসল উদ্দেশ্য হল আমল। কুরআন তেলাওয়াত হোক, নামায হোক, যিকির হোক বা অন্য কোন আমল হোক। তা লাভ হলেই হলো।

আমল শুদ্ধ করার চিন্তা করুন

অনেক লোক এ ব্যাপারে খুব অস্থির হয় যে, এত দিন ধরে যিকির করছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনো কান্না আসল না, কখনো মন নরম হল না। আমি তো বড় পোড়া কপাল। আমি তো বিতাড়িত। মনে রাখবেন, কান্না আসা না-আসা আপনার ক্ষমতাভুক্ত নয়। এর উপর নাজাতের ভিত্তি নয়। আসল জিনিস এটা দেখতে হবে যে, যে পথে তুমি চলছ, সেটা সঠিক কিনা। যে আমল তুমি করছ, তা ঠিক হচ্ছে কিনা।

বায়তুল্লাহর উপর প্রথম দৃষ্টি পড়তে কান্না না-আসা

অনেক মানুষের কাছে শুনেছি যে, যখন বায়তুল্লাহর উপর প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তখন মানুষ হাসে বা কাঁদে। মানুষের মধ্যে এ কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন কোন ব্যক্তি সেখানে গেল এবং বায়তুল্লাহর উপর চোখ পড়ল কিন্তু তার হাসিও এলো না, কান্নাও এলো না। এখন সে খুব অস্থির হচ্ছে, আমি তো শয়তান হয়ে গেছি, আমি তো বিতাড়িত হয়ে গেছি। কারণ, না আমার হাসি এলো, না কান্না এলো। মনে রাখবেন, সেখানে হাসি বা কান্না আসল জিনিস নয়। যখন সেখানে পৌছতে পারলেন, বায়তুল্লাহ শরীফের উপর চোখ পড়ল এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে তাওয়াফ করার তাওফীক লাভ হল, তখন এটাও আল্লাহ তাআলার বিরাট দয়া। কান্না আসুক বা না-আসুক। কান্না আসলেতো নিয়ামত, না আসলেও চিন্তার কিছু নেই। এর কারণে বঞ্চিত হবেন না। কারণ, এ সমস্ত ভাব এবং আবেগ উদ্দেশ্য নয়। এগুলোর দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার দরকার-ই নেই। আসল জিনিস এটা দেখা যে, যেই আমলের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা আদায় হচ্ছে কিনা।

ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকাও একটি বাধা

হাদীস শরীফে এসেছে যে–

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

অর্থ, 'তোমার নেক আমল যদি তোমাকে আনন্দ দেয় এবং তোমার গুনাহ যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে, তাহলে তুমি মুমিন।' (মুসনাদে আহমাদ)

এ হাদীস শুনে কিছু মানুষের এই চিন্তা হয় যে, ইবাদত করার পর এ ধরনের কিছু আলামত চোখে পড়া দরকার। প্রফুল্লতা লাভ হওয়া উচিত। আনন্দ লাভ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের তো ইবাদত করার পর এ ধরনের কোন আলামত চোখে পড়ে না।

প্রথমত মনে রাখবেন, এ ধরনের ফলাফল প্রতীক্ষা করার দ্বারা লাভ হয় না। বরং হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, 'ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকাই একটা বাধা এবং পর্দা। এ প্রতীক্ষা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এই ফল লাভ হবে না। এ প্রতীক্ষার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন বলা হয় যে–

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ

'একবার এক জোলা দু রাকাত নামায পড়ে অপেক্ষায় বসে আছে যে, আমার উপর কখন ওহী নাযিল হয়।'

এজন্য এসব ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকা উচিত নয়। কারণ, এ সমস্ত আমলই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য। যখন আপনি নামায পড়লেন, তখন আমল হয়ে গেল। আর এটাই উদ্দেশ্য এবং এটাই ফল। নামায আদায় হয়ে যাওয়ার পর আর কোন জিনিসের প্রতীক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত: এই হাদীস শরীফে যেই ভাল লাগা ও খারাপ লাগার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক ভাল লাগা এবং খারাপ লাগা উদ্দেশ্য। এর স্বভাবগত প্রভাব সৃষ্টি হলেতো খুব ভাল। আর যদি স্বভাবগত প্রভাব সৃষ্টি না হয়, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই।

নামায নিজেই উদ্দেশ্য

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থ 'যখন তুমি অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হও, তখন ক্লান্ত হও।'

(সূরা ইনশিরাহ : ৮)

অর্থাৎ, নিজেকে ইবাদতের মধ্যে ক্লান্ত কর। লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাক, লম্বা সময় রুকু কর, লম্বা সময় সিজদা কর। এ আয়াতে নামাযের মধ্যে ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়াকে উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটাই আমল। এটাই লক্ষ্য। এটাই উদ্দেশ্য। এতে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। হযরত থানবী (রহ.)-এর শিক্ষার মধ্যে এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন মানুষের মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি না হয়। যখন আমলের তাওফীক হল, তখন এই তাওফীক

হওয়াটাই আল্লাহ তাআলার একটি নিয়ামত। এখন আর অন্য কিছু তালাশ করার প্রয়োজন নেই।

ক্লান্ত, শ্রান্ত হওয়াই এ পথের গন্তব্য

এক সময় একটি কবিতার মাধ্যমে এ বিষয়টি আমি উপস্থাপন করেছিলাম। হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) কবিতাটি খুব পসন্দ করেছিলেন। কবিতাটি এই–

قدم ہیں راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی
یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সঠিক পথে এগিয়ে চলছি, সীরাতে মুস্তাকীমে অবিচল রয়েছি, তখন এ সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যে, আমার কাশফ হতে হবে, এলহাম হতে হবে, নূর চোখে পড়তে হবে, ভাব ও আবেগ সৃষ্টি হতে হবে– এসব কথা বেকার। এ পথে তো আমল করা এবং আমলের মধ্যে নিজেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করাই উদ্দেশ্য। এজন্য প্রফুল্লতা লাভ হওয়ার বেশি ফিকির করা উচিত নয়। কারণ, অনেক সময় এই প্রফুল্লতা, এই উৎফুল্ল ভাব এবং এই মধুরতা উল্টা ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। যেমন নামাযের মধ্যে খুব ভাব ও আবেগ লাভ হচ্ছে, আনন্দ লাভ হচ্ছে, মজা পাওয়া যাচ্ছে, প্রফুল্লতা অর্জন হচ্ছে। এর ফলে মাথায় অহংকার সৃষ্টি হয় যে, আমিও কিছু একটা হয়ে গেছি। আমিও এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এই অহমিকা সৃষ্টি হতেই ঐ আমল ব্যর্থ হয়ে যায়। এজন্য কতক সময় এই আনন্দ ও আবেগ সৃষ্টি হওয়ায় ক্ষতি হয়ে থাকে।

ঐ ব্যক্তি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কষ্ট করে আমল করছে। এজন্য ক্লান্ত হচ্ছে কিন্তু আমলের মধ্যে কোন স্বাদ এবং আনন্দ পাচ্ছে না। তাহলে ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি অহংকার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকে বেঁচে যাবে। এ কারণে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন যে–

> 'যে ব্যক্তির সারা জীবনেও কখনো নামাযের মধ্যে স্বাদ লাভ হল না, কিন্তু অব্যাহতভাবে সে নামায পড়ে গেল, আমি তাকে মুবারকবাদ দেই। কারণ, স্বাদ না পাওয়া সত্ত্বেও নামায পড়তে থাকা এটা তার ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের দলীল। এর মধ্যে কোন কামনা-বাসনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।'

এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলছেন যে, আনন্দ লাভ হওয়ার চিন্তায় বেশি পড় না। যে কাজ করছ তাতে লেগে থাক। আনন্দতো আমলের দাসী। তার আসার সময় হলে, সে নিজেই এসে উপস্থিত হবে। প্রতীক্ষা করা ছাড়াই চলে আসবে। আর যদি না আসে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ, উদ্দেশ্য হল আমল। তা লাভ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আটত্রিশতম মজলিস

যিকিরের কতিপয় আদব

যিকিরের কতিপয় আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

অযু সহকারে যিকির করা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে,

'অযু সহ যিকির করায় অবশ্যই বেশি বরকত হয়ে থাকে। তবে অযু রাখা জরুরী নয়। কারণ, কারো যদি অযু না থাকে এবং বারবার অযু করায় কষ্ট হয়, তাহলে তায়াম্মুম করবে। তবে এই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া ও কুরআন মজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৪)

এ মালফূযে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন। প্রথম কথা এই যে, মাসআলা হল বিনা অযুতে যিকির করা জায়েয। আল্লাহ তাআলা যিকিরের জন্য কোন শর্ত আরোপ করেননি। তিনি যিকিরকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, মানুষ যখন যে অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নাম নিতে চায়, তাঁর নাম নেয়ার অনুমতি রয়েছে। অন্যথায় বাস্তবতা তো এই যে, মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার নাম নেয়ারই অনুমতি হতো না। অযু করা আর কি? নিজের মুখকে মেশক-আম্বর দ্বারা ধুলেও অনুমতি হতো না।

ہزار بار بشویم دہنم بمشک وگلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست

'আমি যদি হাজার বারও আমার মুখকে মেশক ও গোলাপ দ্বারা ধৌত করি, তারপরও আপনার নাম নেয়া বেয়াদবী।'

আসল কথা তো এটাই, কিন্তু তাঁর দয়া যে, নাম নেয়ার শুধু অনুমতিই তিনি দেননি বরং এর জন্য কোন শর্তও লাগাননি। না মসজিদে আসা শর্ত, না জায়নামাযে বসা শর্ত, না অযু করা জরুরী, না গোসল করা জরুরী। এমনকি মানুষ যদি নাপাক অবস্থায়ও থাকে বা কোন মহিলা যদি হায়েয বা নেফাস

অবস্থায় থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় যদিও নামায পড়ার ও কুরআন তেলাওয়াত করার অনুমতি নেই, কিন্তু যিকির করার অনুমতি এ অবস্থায়ও রয়েছে। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ, 'যারা দাড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং বিছানায় শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে।' (সূরা আলে-ইমরান : ১৯১)

তোমরা দাড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আমাকে ডাক। এত সহজ করে দিয়েছেন। এজন্য যিকির করার জন্য অযু করা কোন শর্ত নয়। তবে মহব্বতের দাবি তো হলো, মানুষ যখন সেই মহান সত্তার যিকির করবে, তখন অযু সহকারে করবে। কারণ, অযু সহ যিকির করলে বরকত বেশি হবে। এতে নূর বেশি হবে। এর ফায়দা বেশি হবে। এজন্য যথাসম্ভব অযু করে যিকির করবে।

যিকিরের জন্য তায়াম্মুমও করতে পারবে

তবে যদি কোন উযর থাকে, যার কারণে অযু থাকছে না। এমন ব্যক্তির জন্য হযরত থানভী (রহ.) বলছেন যে, অযু থাকে না বিধায় যিকির ছেড়ে দিবে না, বরং যিকির করতে থাকবে। তবে যেহেতু অযু সহকারে যিকির করায় নূর ও বরকত বেশি, এজন্য অযু ভেঙ্গে গেলে আবার অযু করবে। আবার ভাঙ্গলে আবারো অযু করবে। আর যদি বার বার অযু করায় কষ্ট হয়, তাহলে যিকির করার জন্য তায়াম্মুম করবে। তবে এমন তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া এবং কুরআন শরীফ ছোঁয়া জায়েয নেই।

কোন কোন আমলে তায়াম্মুম করা জায়েয

এখানে এ বিষয়টি ভাল করে বুঝে নিবে যে, যে সমস্ত আমল অযু ছাড়া করা জায়েয আছে, তবে আদবের প্রতি খেয়াল করে অযুসহ করা হয়, ঐ সমস্ত আমলের মধ্যে কোন কারণবশত: যদি অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ অযুর স্থলে তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে। যেমন, আপনি পাঠ্যবই পড়েন, তখন কুরআন শরীফ ছাড়া অন্যান্য কিতাব মৌলিকভাবে বিনা অযুতে পড়া জায়েয আছে এবং সেগুলো স্পর্শ করাও জায়েয আছে, তবে আদবের দাবি এই যে, সমস্ত পাঠ্য কিতাবও অযুসহ পড়বে। আর যদি কোন সময় অযুর সুযোগ না থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে নিবে। তাহলে এই তায়াম্মুমও ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। তবে কেউ যদি এই তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়তে চায়, তাহলে মনে রাখবেন– এই তায়াম্মুম দ্বারা নামায হবে না। একই অবস্থা যিকিরের ক্ষেত্রেও।

যদি বার বার অযু ভেঙ্গে যায় এবং অযু করতে কষ্ট হয়– তাহলে যিকির করার জন্য তায়াম্মুম করবে। কারণ, বারবার তায়াম্মুম করায় কোন কষ্ট নেই। তবে ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয হবে না।

নামায থেকে পালানোর চিকিৎসা

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)কে লিখে যে–

> 'নামায পড়া থেকে মন খুব পালিয়ে থাকে।' অর্থাৎ, মন মানে না এবং মন নামায পড়তে চায় না।

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) লিখেন যে,

> 'এতে কোন ক্ষতি নেই, তবে মন পালানোর উপর আমল করবে না। মনের বিরোধিতা করে গুরুত্ব সহকারে নামায পড়বে। কিছু নফল পড়ারও নিয়ম বানিয়ে নিবে। যতটুকু পড়লে কোন জরুরী কাজের ক্ষতি হবে না।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৪)

অর্থাৎ, মন পালাক তাতে কোন ক্ষতি নেই। মনের কাজই তো হল সব ভাল কাজ থেকে পালানো এবং খারাপ কাজের দিকে মানুষকে ধাবিত করা। এজন্য এতে কোন ক্ষতি নেই, তবে তার পালানোর উপর কাজ করবে না। বরং নফসের বিরোধিতা করে, গুরুত্ব সহকারে নামায পড়বে। মন বসার ব্যাপারে খুব বেশি চিন্তা করবে না।

যিকির করার সময় আল্লাহ তাআলার কথা কল্পনা করবে

এক মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'তাসবীহ পাঠের সময় উত্তম হল, আল্লাহ তাআলার কথা কল্পনা করা। তবে যদি এই কল্পনা না বসে, তাহলে যিকিরের কথা কল্পনা করবে যে, তা অন্তর থেকে বের হয়ে আসছে।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৪)

এই মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) যিকিরের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ যখন যিকির করবে, তখন আসল নিয়ম হল, সেই মহান সত্তার কথা কল্পনা করবে, যার নাম যিকির করছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কথা। যেমন হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

অর্থাৎ, 'এমনভাবে যিকির করবে, যেন সে আল্লাহ তাআলাকে দেখছে। আর যদি এই কল্পনা না আসে, তাহলে কমপক্ষে একথা চিন্তা করবে যে, যে মহান সত্তার যিকির আমি করছি তিনি আমাকে দেখছেন।' (বুখারী শরীফ)

আসল কথা হল, যার যিকির করা হচ্ছে– অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর কথা কল্পনা করবে। যখন 'আল্লাহ', 'আল্লাহ' করছ, তখন মন আল্লাহর দিকে থাকবে। যখন 'সুবহানাল্লাহ' বলছ, তখন আল্লাহর দিকে মনোযোগ থাকবে। যখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলছ তখন আল্লাহর নিয়ামতের কথা কল্পনা করবে।

প্রথম পর্যায়ে যিকিরের শব্দের কল্পনাও করতে পারে

কিন্তু আমাদের মত প্রথম পর্যায়ের লোকের জন্য এভাবে আল্লাহ তাআলার কথা কল্পনা করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার কল্পনা কি করে বসবে, কারণ সেই সত্তা তো অসীম ও অকল্পনীয়। তিনি তো কল্পনার মধ্যেই আসতে পারেন না। এজন্য প্রথম প্রথম যিকির করার সময় আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের, তাঁর কুদরতের এবং তাঁর আজমতের কল্পনাও জমে না। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের যিকিরের কল্পনাই করা উচিত। অর্থাৎ, যেসব শব্দ মুখ দ্বারা উচ্চারণ করছে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। উদাহরণ স্বরূপ যখন সে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' মুখ দ্বারা বের করছে, তখন যেন তার জানা থাকে যে, আমি এসব শব্দ মুখ দ্বারা উচ্চারণ করছি। প্রথম দিকে যখন সে যিকিরের শব্দসমূহের কথা চিন্তা করবে, তখন ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যায়ে ধীরে ধীরে, আল্লাহ তাআলার কল্পনাও বসে যাবে।

যিকিরের সময় অন্যান্য কল্পনা

কতিপয় আল্লাহর ওলী, কতক যিকিরের সাথে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করতেন। যেমন, বারো তাসবীহ-এর বিষয়ে বুযুর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইল্লাল্লাহ এর বারো তাসবীহ এমনভাবে পড়বে যে, প্রথম তাসবীহতে لَا مَعْبُودَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) একথা কল্পনা করবে এবং দ্বিতীয় তাসবীহে لَا مَحْبُوبَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন প্রিয়জন নেই) একথা কল্পনা করবে। তৃতীয় তাসবীহে لَا مَقْصُودَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোন উদ্দেশ্য নেই) এবং চতুর্থ তাসবীহে لَا مَوْجُودَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া কিছু বিদ্যমান নেই– একথা কল্পনা করবে। তবে এগুলোর ব্যাপারে আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, এগুলো কেউ করলে করুক, তবে এসব কল্পনার প্রতি অধিক যত্ন নেয়ার দরকার নেই। এসব কল্পনা ছাড়া তাসবীহ পাঠ করলেও যথেষ্ট হবে। আসল উদ্দেশ্য হল, যিকির করার সময় একটু মনোযোগসহ যিকির করবে। এতে ধীরে ধীরে লক্ষ্য অর্জন হবে, ইনশাআল্লাহ।

যিকিরের মধ্যে স্বাদ না লাগা অধিক উপকারী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'যিকিরের মধ্যে স্বাদ ও ভাব লাভ হওয়া একটি নিয়ামত, আর লাভ না হওয়া আরেকটি নিয়ামত। এই নিয়ামতের নাম মুজাহাদা। এই দ্বিতীয় নিয়ামতটি অধিক উপকারী। যদিও অধিক সুস্বাদু নয়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৫)

অর্থাৎ, যিকিরের মধ্যে যদি কারো স্বাদ উপভোগ হয়, তাহলে এটা নিয়ামত। যদিও এটা লক্ষ্য নয়। আর যদি স্বাদ উপভোগ না হয় তাহলে এটা আরেকটি নিয়ামত। এর নাম মুজাহাদা। এটিও একটি নিয়ামত। বরং এই নিয়ামত অধিক উপকারী। কারণ, যখন স্বাদ উপভোগ হচ্ছে না, আর তা সত্ত্বেও সে যিকির করছে, তাহলে এই যিকিরের ফলে সে কষ্ট করছে। এজন্য সে যিকিরের সওয়াব পৃথকভাবে পাবে এবং মুজাহাদার লাভ আলাদা হবে। কারণ, নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা মুজাহাদা। নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে কাজ করার অভ্যাস করার ফলে নফস মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তাই স্বাদ ছাড়া যিকির করার মধ্যে যেহেতু এই তিনটি ফায়দা রয়েছে, তাই এই যিকির অধিক উপকারী। বিধায় এমন যিকিরকে বেকার মনে করা উচিত নয়। যিকিরের মধ্যে যদি স্বাদ আসে, তাহলেও নিয়ামত, আর যদি না আসে তাহলেও নিয়ামত।

যিকিরের ফায়দা দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'যিকিরের প্রতিক্রিয়া কথা কম বলা, মানুষের সাথে মেলামেশা কম করা এবং সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কম দেয়ার উপর নির্ভরশীল। এই জিনিসগুলো অর্জনের জন্য মাওয়ায়েয অধ্যয়ন করা এবং মছনবী অধ্যয়ন করা উচিত (যদিও বুঝে না আসুক)।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৫)

হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, যিকিরের যে সমস্ত ফায়দা এবং ফলের কথা বুযুর্গগণ বলেন, তা ঐ সময় অর্জন হয়, যখন মানুষ যিকিরের সাথে সাথে আরো দু'টি কাজ করে। এক. কথা কম বলা এবং অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা। প্রয়োজন পরিমাণ বলবে, অধিক বলবে না। কতক সময় এরই মাধ্যমে স্বাধীনচেতা নফসের চিকিৎসা হয়ে থাকে।

কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এক ব্যক্তির চিকিৎসা

আমার স্মরণ আছে যে, আমার আব্বা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসা-যাওয়া করত। সে খুব বেশি কথা বলত। কথা বলতে আরম্ভ করলে আর থামার নাম নেই। এক প্রশ্নের পর আরেক প্রশ্ন করল, তারপর তৃতীয় প্রশ্ন করল। অবিরাম কথা বলতেই থাকত। হযরত ওয়ালিদ সাহেব

যেহেতু অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র মানুষ ছিলেন, এজন্য খুব বেশি ধর-পাকড় করতেন না। তিনি তার কথা সহ্য করে যেতেন। একবার ঐ ব্যক্তি হযরত ওয়ালিদ সাহেবের নিকট বায়আত এবং ইসলাহী তাআল্লুক করার আবেদন করে বলল, "হযরত আমার মন চায় যে, আপনার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করি। আপনার কাছে বায়আত হই। আপনি আমাকে কিছু যিকির ও নফল নামায বলে দিন। হযরত ওয়ালিদ সাহেব তাকে বললেন যে, 'তুমি আমার সঙ্গে ইসলাহী তাআল্লুক করতে চাইলে ঠিক আছে, তবে তোমার জন্য নফল ও যিকির ইত্যাদি নেই।' সে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমি কি করব?' হযরত ওয়ালিদ সাহেব বললেন, 'তোমার কাজ এই যে, তুমি তোমার জিহ্বায় তালা লাগাবে। তোমার জিহ্বা যে সব সময় কাঁচির মত চলতেই থাকে, তা বন্ধ করবে। প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবে। প্রয়োজনের অধিক একটি কথাও মুখ দিয়ে বের করবে না। এটাই তোমার চিকিৎসা। এটাই তোমার অযীফা এবং এটাই তোমার তাসবীহ। ঐ ব্যক্তির উপর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতেই তার উপর যেন কিয়ামত ভেঙ্গে পড়ল। কারণ, যে ব্যক্তি সারা জীবন অধিক কথা বলতে অভ্যস্ত, তার উপর এক মুহূর্তে ব্রেক লাগিয়ে দিলে তা হবে তার জন্য কঠোর মুজাহাদা। সুতরাং ঐ ব্যক্তির জন্য শুধুমাত্র কথা কম বলার মুজাহাদাই সফলতা বয়ে আনে। বিধায় এ পথে কথা কম বলার তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। হাদীস শরীফের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْأِ تَرْكَهُ مَالَا يَعْنِيهِ

অর্থ, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্য থেকে একটি হল তার অনর্থক ও অসার কথা থেকে বাঁচা। (তিরমিযী শরীফ)

শুধু প্রয়োজনের সময় কথা বলবে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত যিকির করার সঙ্গে সঙ্গে কথা কম বলার গুণ অর্জন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে যিকিরের ফায়দাসমূহ পুরোপুরি লাভ হবে না। তবে আখেরাতের সওয়াব ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবে।

মানুষের সাথে সম্পর্ক কমাও

দ্বিতীয় জিনিস হল, মানুষের সাথে সম্পর্ক কম করবে। মানুষের সাথে খুব বেশি সম্পর্ক বাড়ানো, মানুষের সাথে বৈঠক বসানো, সব সময় তাদের সাথে উঠাবসা করা, যা বর্তমান যুগে একটি স্বতন্ত্র শিল্পে পরিণত হয়েছে। যাকে PUBLIC RELATION বলা হয়। এ শিল্পে এই শিক্ষা দেয়া হয় যে, মানুষের সাথে কিভাবে অধিক থেকে অধিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। কিন্তু আমল ও

আখলাকের ইসলাহের এই পথে, মানুষের সাথে সম্পর্ক বাড়ানো ক্ষতিকর। বিশেষত: আত্মনিয়ন্ত্রণের ও অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে। হ্যাঁ, কারো সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে, তা হবে শুধু আল্লাহর জন্য। পরিবারের লোকদের সাথে সম্পর্ক থাকলে তা থাকবে আল্লাহর জন্য। বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক থাকলে তা আল্লাহর জন্য থাকবে। সাধারণ মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক থাকলে– তা আল্লাহর জন্য থাকবে। তবে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মানুষের সাথে অধিক সম্পর্ক বাড়ানোর কারণে এবং তাদের সাথে মেলামেশা রাখার কারণে যিকিরের যথাযথ ফায়দা লাভ হয় না।

চোখ, কান, জিহ্বা বন্ধ কর

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

چشم بند و گوش بند و لب ببند
گر نہ بینی نور حق بر من بخند

'তিনটি কাজ কর। এক নম্বর চোখ বন্ধ কর। কিসের থেকে বন্ধ করবে? নাজায়েয জায়গায় দৃষ্টি দেয়া থেকে বন্ধ করবে। দ্বিতীয় হল, কান বন্ধ কর। কিসের থেকে বন্ধ করবে? নাজায়েয, হারাম ও অনর্থক কথা শোনা থেকে বিরত থাকবে। তৃতীয় হল ঠোট– অর্থাৎ, মুখ বন্ধ কর। কিসের থেকে বন্ধ করবে? অনর্থক ও নাজায়েয কথা বলা থেকে বন্ধ কর। এরপরও যদি আল্লাহর নূর নজরে না আসে, তাহলে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি কর। অর্থাৎ, এই তিন জিনিস বন্ধ করার পর অবশ্যই আল্লাহর নূর নজরে পড়বে।

মোটকথা, যিকিরের যেসব ফায়দা আছে, যেমন আল্লাহর নূর দেখতে পাওয়া, তা এজন্য অর্জিত হয়নি যে, যিকিরের সাথে সাথে কথা কম বলা এবং মানুষের সাথে কম মেলামেশা করার যে কাজ ছিল তা করা হয়নি। যার ফলে যিকিরের উপকারিতাও লাভ হয়নি। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলছেন যে, যিকিরের লাভ যদি অর্জন করতে চাও, তাহলে যিকিরের সাথে সাথে এসব জিনিসের উপরও আমল করতে হবে।

বিভিন্ন সম্পর্কের দিকে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা যাবে না

তৃতীয় জিনিস হল– বিভিন্ন জিনিসের সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কম নিবদ্ধ করা। অর্থাৎ, প্রথমত: মানুষের সাথে সম্পর্কই কম রাখবে। আর যদি কারো সাথে সম্পর্ক থাকেও তাহলে ঐ সম্পর্কের দিকে বেশি মনোযোগ দিবে না। যেমন, একথা চিন্তা করবে না যে, এ কাজ করলে অমুক অসন্তুষ্ট হবে বা অমুক সন্তুষ্ট হবে। এ চিন্তায় পড়ো না। মাখলুক সন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়ার চিন্তায় পড় না। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চিন্তায় পড়। এই তিন জিনিস অর্জিত হলে ইনশাআল্লাহ যিকিরের লাভ এবং যিকিরের ফায়দা পাওয়া যাবে।

এই তিন জিনিস অর্জনের পদ্ধতি

এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই তিন জিনিস অর্থাৎ, কম কথা বলা, মানুষের সাথে কম মেলামেশা করা এবং বিভিন্ন জিনিসের সম্পর্কের দিকে মনোযোগ কম নিবদ্ধ করা। এই জিনিসগুলো কিভাবে লাভ হবে? এগুলো অর্জন করার জন্য মাওয়ায়েয এবং মাওলানা রূমী (রহ.)-এর মসনবী অধ্যয়ন করতে বলেছেন। সাথে একথাও বলেছেন যে, মসনবী যদি বুঝে নাও আসে, তবুও তা অধ্যয়ন কর। কারণ, আল্লাহ তাআলা কতক মানুষের কথার মধ্যে প্রভাব রেখেছেন।

মসনবী খোদা প্রদত্ত কথা

বলা হয় যে, কাব্য চর্চার সঙ্গে মাওলানা রূমী (রহ.)-এর কোন সম্পর্ক ছিল না। মাওলানা রূমী (রহ.)-এর শায়খ খাজা শামসুদ্দিন তিবরিযী (রহ.) একবার আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে যে ইলম দান করেছেন, তা প্রকাশ করার জন্য কোন জিহ্বা দান করুন।' এই দু'আর ফলে মাওলানা রূমী (রহ.) তাঁর কাছে মুরীদ হন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁর মুখে মসনবী চালু করে দেন। অথচ ইতোপূর্বে তিনি কখনো কবিতা রচনা করেননি। কিন্তু শায়খের দু'আর পর তাঁর মুখে এই কবিতা আসতে থাকে। তিনি দফতরের পর দফতর মসনবী লিখেন। যখন আল্লাহ তাআলার মঞ্জুরী বন্ধ হল, তখন কবিতা আসাও বন্ধ হল। এমনকি শেষে তিনি একটি ঘটনা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। সেই ঘটনাও পুরা হয়নি। মাঝপথেই কবিতা আসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি ঐ ঘটনাকে অসম্পূর্ণই রেখে যান। তারপর কয়েক শতাব্দী পর হিন্দুস্তানের ইলাহী বখ্স কান্ধলভীর মুখে আল্লাহ তাআলা এই কবিতা চালু করে দেন। ফলে ঐ জায়গার পর থেকে তিনি কবিতা বলতে আরম্ভ করেন। তিনি এই শেষ দফতর পুরা করেন। এ কারণে তাঁকে খাতেমে মসনবী বলা হয়। এ কারণে যখন আল্লাহ তাআলা এই কালামকে তাঁর মুখে চালু করে দেন তখন চালু হয়ে যায় এবং যখন বন্ধ করে দেন তখন বন্ধ হয়ে যায়। মোটকথা, এই শব্দগুলো আল্লাহ তাআলার দান। এর মধ্যে বিশেষ বরকত ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াও আল্লাহ তাআলাই দান করেন। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, 'মসনবী অধ্যয়ন করবে, বুঝে আসুক বা না আসুক। কারণ, এটা পড়া ফায়দাশূন্য নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উনচল্লিশতম মজলিস

সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ এবং তা অর্জন করার উপায়

সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ এবং তা অর্জন করার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

নামাযের মধ্যে মুখে যিকির করা উচিত নয় এবং অন্তরে যিকির করাও উচিত নয়

এক বাণীতে হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'নামাযের মধ্যে না মুখে যিকির করবে, না অন্তরে। নামাযের দিকে মন নিবদ্ধ রাখাই এখানে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। 'কলব জারী হওয়া' তাসাওউফ শাস্ত্রের কোন পরিভাষা নয়। 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' তথা সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ রাখার যোগ্যতা অর্জন করা যিকিরের উদ্দিষ্ট বস্তু। তার নাম যা-ই হোক না কেন।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৬)

অর্থাৎ, নামাযের মধ্যে যেই যিকির এবং তিলাওয়াত রয়েছে, সেগুলোই নামাযের মধ্যে পাঠ করা উচিত। এছাড়া নামাযের মধ্যে অন্য কোন যিকির করার প্রয়োজনও নেই এবং সুযোগও নেই। নামাযের যে সমস্ত রুকনের মধ্যে মানুষ নিরব থাকে, যেমন, কেউ ইমামের পিছনে যোহর নামায পড়ছে, সে যোহর নামাযের নিয়ত করে ইমামের পিছনে দাঁড়াল। এখন শুধু ইমাম কেরাত পড়বে। মুক্তাদী নীরব থাকবে। এ অবস্থা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, এমন সময় মুখের যিকির বা অন্তরের যিকিরের প্রয়োজন নেই। শুধু নামাযের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে। যেমন ইমামের পিছনে যোহর নামাযের নিয়ত করেছে, এখন তার জন্য কেরাত পড়াতো জায়েয নেই, তবে ঐ সময় মনে মনে সূরার কথা কল্পনা করবে। তবে এ সময় অন্য কোন যিকিরের সামান্য কল্পনা আসলে কোন ক্ষতি নেই। যেমন 'সুবহানাল্লাহ'র কল্পনা এলো বা 'আলহামদুলিল্লাহ'র কল্পনা এলো, তাহলে এতেও কোন ক্ষতি নেই। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ কল্পনার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। ঐ সময় শুধু নামাযের দিকে মন নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, নামাযের মধ্যে নামাযের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখাই কাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই ঐ কাঙ্ক্ষিত বস্তুই অর্জন করা উচিৎ।

'কলব জারী' হওয়া

'কলব জারী' হওয়া তাসাওউফ শাস্ত্রের কোন পরিভাষা নয়। যেমন মানুষ বলে থাকে যে, অমুকের কলব জারী হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, এটি কোন শাস্ত্রীয় পরিভাষা নয়। মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে এই ভাষা বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন 'কলব জারী হওয়া' বলতে তারা কি বুঝে থাকে। আসল কাঙ্ক্ষিত বস্তু হল সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। যিকিরের দ্বারাও এ যোগ্যতা অর্জন করাই উদ্দেশ্য। তার নাম যা-ই দেয়া হোক না কেন।

'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' তথা সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার যোগ্যতার অর্থ

'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত'-এর অর্থ হল সর্বক্ষণ মন আল্লাহ তাআলার দিকে নিবদ্ধ থাকবে। অধিকাংশ সময় মন আল্লাহর যিকির করবে এবং তাঁর দিকে ধাবিত থাকবে। এর ফলে গায়রুল্লাহ থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন থাকবে। একেই 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' বলা হয়। এর পরিণতিতে 'নিসবত মাআল্লাহ' লাভ হয়। যেমন বলা হয় যে, অমুকের 'নিসবত' লাভ হয়েছে। তার অর্থ হল, অধিক যিকির ও সর্বদা আনুগত্যের গুণ লাভ হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি অধিকহারে যিকির করে। বেশির ভাগ সময় আল্লাহ তাআলার প্রতি তার ধ্যান থাকে এবং সর্বদা আনুগত্য করে। ফরয, ওয়াজিব ও ইবাদতের সুন্নাতসমূহ সঠিক নিয়মে আদায় করে। গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে। এগুলো হলো– 'নিসবত মাআল্লাহ' লাভ হওয়ার আলামত।

যাইহোক! যিকিরের আসল উদ্দেশ্য 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' অর্জন করা। মানুষ যে কাজই করুক না কেন, তার মন আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকবে। তার অবস্থা এই হবে যে–

دست بکار دل بیار

'হাত কাজে রত আর অন্তর বন্ধুর স্মরণে মগ্ন।' এ অবস্থা অর্জন হয় না, তা নয়। আল্লাহ যখন দান করেন, তখন তা অর্জন হয়।

খালেক ও মাখলূক উভয়ের সাথে সম্পর্কের উপর বিস্ময়

আমি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) থেকে শুনেছি, তিনি তাঁর শায়খ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর কথা বর্ণনা করতেন যে, একবার হযরত থানবী (রহ.) বলেন, পূর্বে আমার এ বিষয়ে খুব বিস্ময়

জাগত যে, সারওয়ারে দোআলম হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদা-সর্বদা আল্লাহর তাআলার সঙ্গে যেরূপ সরাসরি সম্পর্ক ছিল। ওহী নাযিল হচ্ছে। সর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও কল্পনায় মগ্ন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে কামেলা এবং হিকমতে বালেগার তাজাল্লীসমূহ সর্বদা তাঁর উপর বর্ষিত হচ্ছে। পূর্বে আমার এর উপর বিস্ময় জাগত যে, যাঁর অবস্থা এমন তিনি কিভাবে দুনিয়ার লোকদের সাথে কথা বলেন। তিনি কিভাবে বিবিদের সঙ্গে হাস্যরসের কথা বলেন। তিনি কিভাবে শিশুদের সাথে খেলা করেন। এমন মহান ব্যক্তিত্বের অন্য মাখলূকের প্রতি মনোযোগ থাকার কথা নয়।

তারপর বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমি জানতে পেরেছি যে, এ দু'টি বিষয় একত্র হতে পারে। কারণ, এখন আমার নিজের অবস্থাই এই যে, আলহামদুলিল্লাহ! সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রয়েছে। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার লোকদের সাথেও সম্পর্ক ঠিক আছে। মানুষের সাথে মেলামেশাও চলছে। এখন মানুষ দেখছে যে, এ ব্যক্তি বউ-বাচ্চার সঙ্গে হাসছে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে হাস্যরসের কথা বলছে। কিন্তু বাস্তবে তার মন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জুড়ে আছে। তার এ অবস্থা লাভ হয়েছে যে–

دست بکار دل بیار

'হাত কাজে ব্যস্ত, আর মন বন্ধুর স্মরণে মগ্ন।'

যাইহোক! এরই নাম হল 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত'। মানুষ সব সময় আল্লাহ তাআলার কথা কল্পনা করবে। তাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখবে। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকলেও তা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং গৌণ। সেই সম্পর্কও হবে আল্লাহর কারণেই।

প্রথম পর্যায়ের ও শেষ পর্যায়ের লোকের অবস্থা একরূপ হয়ে থাকে

এক জায়গায় হযরত থানবী (রহ.) বড় চমৎকার কথা বলেছেন যে, 'প্রথম পর্যায় ও শেষ পর্যায়ের লোকের বাহ্যিক অবস্থা এক রকম হয়ে থাকে'। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সবেমাত্র এ পথে পা রেখেছে, তার বাহ্যিক অবস্থা এবং যে ব্যক্তি এ পথ অতিক্রম করে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার বাহ্যিক অবস্থা, দেখতে এক রকম মনে হয়। প্রথম পর্যায়ের লোকও বউ-বাচ্চার সঙ্গে হাস্যরস করে এবং শেষ পর্যায়ের লোকও বউ-বাচ্চার সঙ্গে হাস্যরস করে। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তাঁর স্ত্রীকে এগার বিবির গল্প শুনাচ্ছিলেন যে, এগার জন মহিলা ছিল। তারা পরস্পরের মধ্যে এই অঙ্গিকার করেছিল যে, তারা

প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর কথা খুলে বলবে। কোন কথা গোপন করবে না। আমি আপনিও বউ-বাচ্চাকে গল্প শুনিয়ে থাকি। তাই বাহ্যিকভাবে প্রথম ও শেষ পর্যায়ের লোকের অবস্থা এক রকম হয়ে থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে।

মধ্যম পর্যায়ের লোকের অবস্থা

আর যারা পথের মাঝে থাকে, তাদের অবস্থা এতদুভয়ের থেকে ভিন্ন হয়। তাদের অবস্থা এই হয় যে, সে যদি যিকিরের মধ্যে মগ্ন থাকে, আর তার সন্তান তার সাথে সাক্ষাত করতে যায় এবং সালাম দেয়, তখন বাবা আত্মনিমজ্জিত অবস্থায় বিরাজ করার ফলে নিজ সন্তানকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তোমার নাম কি? সন্তানকেও যেন চিনতে পারছে না। অথচ সে তার সন্তান। কিন্তু তাকে চিনছে না। কারণ, সে আল্লাহ তাআলার কল্পনায় এ পরিমাণ আত্মহারা ও নিমজ্জিত হয়েছে যে, সে তার নিজের সন্তানকেও চিনছে না। বাহ্যত: এ ব্যক্তিকে অনেক উঁচুস্তরের মনে হয়। কারণ, সে আল্লাহ তাআলার ধ্যানে এত বেশি নিমজ্জিত যে, অন্যকে চিনতেও পারছে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুদেরকে আদর করা

অপর দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, একবার তিনি মসজিদে নববীতে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান (রাযি.) মসজিদে চলে আসেন। তখন তিনি মিম্বর থেকে নেমে তাঁকে কোলে তুলে নেন এবং আদর করতে থাকেন।

তোমার অন্তর থেকে দয়া বের করে দেয়া হয়েছে

আকরা বিন হারিস নামে এক বেদুঈন ছিলেন। তিনি যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিশুদেরকে আদর করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমার দশ সন্তান। আমি আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তানকে আদর করিনি। আর আপনি আদর করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, আল্লাহ তাআলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া বের করে দিয়ে থাকেন, যার ফলে তুমি শিশুদেরকে আদর কর না, তবে আমি কি করব? এর অর্থ হল– শিশুদেরকে আদর করা দয়ার দাবি। মোটকথা, প্রথম পর্যায় এবং শেষ পর্যায়ের লোকের অবস্থা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক রকম এবং সাধারণ মনে হয়। আর যে মধ্য পথে থাকে এবং আত্মনিমজ্জিত অবস্থায় বিরাজ করে, তার অবস্থা উঁচু মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এমনটি নয়।

তিন অবস্থার দৃষ্টান্ত

হযরত থানবী (রহ.) এই তিন অবস্থাকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন যে, একটি নদী। এক ব্যক্তি নদীর এপারে নদী পাড়ি দেয়ার ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে আছে। আর আরেক ব্যক্তি নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। আর তৃতীয় এক ব্যক্তি নদীর মাঝখানে তরঙ্গের সাথে লড়ছে, সাতরাচ্ছে এবং হাত-পা মারছে। এখন বাহ্য দৃষ্টিতে এপারে দাঁড়ানো ব্যক্তি, আর ওপারে দাঁড়ানো ব্যক্তিকে এক সমান ও এক রকম দেখা যাবে। কারণ, এও স্থলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেও স্থলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবে উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি নদীর এপারে রয়েছে, সে তো নদীতে এখনো পা-ই রাখেনি। আর যে ব্যক্তি ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো নদীর তরঙ্গ ভেঙ্গে সেগুলোর সাথে লড়ে অপর তীরে পৌঁছে গেছে। তবে সেখানে পৌঁছার পর, তার বাহ্যিক অবস্থা এই ব্যক্তির মত হয়ে গেছে, যে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে সকল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছে।

আর যে ব্যক্তি মাঝখানে রয়েছে, তরঙ্গের সাথে লড়ছে, তাকে উপরোক্ত দুজনের তুলনায় অনেক বড় দেখা যাচ্ছে। এজন্য বলেছেন যে, প্রথম পর্যায় এবং শেষ পর্যায়ের লোকের অবস্থা দেখতে একই রকম মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সেই পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ের লোকও বউ-বাচ্চার সাথে হাসে, কথা বলে এবং শেষ পর্যায়ের লোকও বউ-বাচ্চার সাথে হাসে, কথা বলে। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের লোক মনের উপভোগের জন্য, এ কাজ করে এবং সে এর মাধ্যমে স্বাদ লাভ করে। কারণ, এদের সাথে তার সম্পর্ক থাকে সরাসরি। আর শেষ পর্যায়ের লোক যখন বউ-বাচ্চার সাথে হাসে এবং কথা বলে, সে তা করে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের কারণে। আসল সম্পর্ক হল আল্লাহ তাআলার সঙ্গে। আল্লাহ তাআলা যেহেতু বউ-বাচ্চার হক আদায় করার হুকুম দিয়েছেন, তাই সে তাদের হক আদায় করার জন্য এগুলো করে। কিন্তু বউ-বাচ্চার সঙ্গে আমার আর আপনার সম্পর্ক সরাসরি। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, মহব্বত রয়েছে, তাদেরকে উপভোগ করার প্রবৃত্তি রয়েছে, এ কারণে এসব করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিদের সঙ্গে, শিশুদের সঙ্গে এবং অন্যান্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখছেন, তার সবই আল্লাহ তাআলার জন্য।

এক বুযুর্গের জান্নাত থেকে বিমুখ হওয়ার ঘটনা

এক বুযুর্গের ঘটনা আছে যে, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে, তাঁর সামনে জান্নাত পেশ করা হয়। জান্নাতের বাগান এবং মহলসমূহ দেখানো হয়। তারপর

তাঁকে বলা হয় যে, এটি তোমার জায়গা। মৃত্যুর পর এটি তুমি পাবে। ঐ বুযুর্গ জান্নাত দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি এই কবিতা পাঠ করেন–

اِنْ كَانَ مَنْزِلَتِىْ بِالْحُبِّ عِنْدَكُمْ - مَا قَدْ رَأَيْتُ فَقَدْ ضَيَّعْتُ اَيَّامِىْ

অর্থ, 'আমার ভালবাসার প্রতিদান যদি এ সমস্ত বাগান, মহল, ফল-ফলাদি, গাছ এবং সবুজ ভূমি হয়, যেগুলো আপনি আমাকে দেখাচ্ছেন, তাহলে আমি আমার জীবনটাই নষ্ট করেছি, এসব জিনিসের আমার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমার ভালবাসার উদ্দেশ্য জান্নাত ছিল না। জান্নাতের এসব মহল এবং বাগান ছিল না। আমার ভালবাসার লক্ষ্য ছিলেন আপনি, আপনার দিদার, আপনার সন্তুষ্টি, আপনার মিলন এবং আপনার নৈকট্য। এভাবে তিনি জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এক অবস্থাতো হল এই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাত প্রার্থনা

অপর দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই যে, তিনি দু'আ করার সময় বলছেন যে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

অর্থ, 'হে আল্লাহ আমি আপনার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত চাই।'

এখন ঐ বুযুর্গতো জান্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন এবং বলছেন যে, এই জান্নাত আমার প্রয়োজন নেই। আমি তো আপনার সন্তুষ্টি চাই। অপর দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত প্রার্থনা করছেন।

আমাদের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাত চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য

এটি মূলত: প্রথম পর্যায়ের, শেষ পর্যায়ের এবং মাঝ পর্যায়ের লোকের পার্থক্য। আমরাও আল্লাহ তাআলার নিকট জান্নাত চাই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জান্নাত চাইতেন। কিন্তু যিনি মাঝপথে ছিলেন, তিনি বললেন যে, আমার জান্নাতের প্রয়োজন নেই। তবে আমাদের জান্নাত চাওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান্নাত চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা তো এজন্য জান্নাত চাই যে, সেখানে মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে। সুস্বাদু খাবার থাকবে, ফল থাকবে, বসবাসের মহল থাকবে, বাগান থাকবে। সুন্দর-সুন্দর দৃশ্য থাকবে। এগুলোর কারণে আমরা জান্নাত চাচ্ছি। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের এসব স্বাদের জন্য জান্নাত

চাচ্ছেন না। তিনি তো জান্নাত এজন্য চাচ্ছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির আলামত। তাঁর সন্তুষ্টির চিহ্ন ও প্রকাশস্থল। এজন্য তিনি জান্নাত চাচ্ছেন।

প্রদানকারী হাতের প্রতি দৃষ্টি ছিল

দ্বিতীয় কারণ এই যে, জান্নাত প্রার্থনার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য জান্নাত ছিল না। বরং যে মহান সত্তার পক্ষ থেকে জান্নাত লাভ হচ্ছে, সে মহান সত্তা ছিলেন প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি। দৃষ্টান্তটি এই যে, হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)-এর জীবদ্দশায় যখন ঈদের দিন আসত, তখন আমরা সব ভাই হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)-এর নিকট যেতাম। হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) আমাদের সকলকে ঈদ উপহার দিতেন। আমরা সবাই উপার্জন করি। স্বচ্ছল। এমনকি অন্যদেরকেও আমরা ঈদ-উপহার দিই, কিন্তু ঈদের দিন যখন আমরা ওয়ালিদ সাহেবের নিকট একত্রিত হই, তখন খুব হৈ চৈ করে ঈদ-উপহার চাই। ওয়ালিদ সাহেব বলতেন যে, এবার বিশ টাকা নাও। আমরা বলতাম যে, এখন সব কিছুর দাম বেশি, এবার পঁচিশ টাকা নিব বা ত্রিশ টাকা নিব। তখন পাঁচ, দশ টাকার জন্য ঝগড়া হত। বড় মজা পেতাম। হযরত ওয়ালিদ সাহেব বলতেন যে, সব চোর-ডাকাত একত্র হয়েছে। আমাকে লুট করছে। আমরা বলতাম যে, না আমরা তো পঁচিশ টাকাই নিব।

অথচ ঐ সময় আমাদের কোন ভাই-ই এমন ছিল না যে, মুহূর্তের মধ্যে পঁচিশ টাকা খরচ করতে পারবে না। কেউ চাইতে আসলে দিনের মধ্যে দশবার এ রকম পঁচিশ টাকা বের করে দিতে পারে। কিন্তু ওয়ালিদ সাহেবের নিকট থেকে পঁচিশ টাকা উসূল করার জন্য রীতিমত লড়ছে। না দিলে পীড়াপীড়ি করে আদায় করছে। কেন? এই পঁচিশ টাকা কি উদ্দেশ্য ছিল? এই পঁচিশ টাকা পেলে অনেক মজা হবে। এ টাকা দিয়ে অমুক জিনিস কিনে খাব। এজন্য পঁচিশ টাকা নিচ্ছি? আসল কথা হল ঐ পঁচিশ টাকা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ঐ পঁচিশ টাকা এজন্য আমাদের কাছে প্রিয় ছিল যে, ঐ টাকা প্রদানকারীর হাত আমাদের কাছে প্রিয় ছিল। ঐ হাত দ্বারা আমরা যা পাব, তা হবে আমাদের জন্য বিশাল কিছু। আমাদের দৃষ্টি তো ঐ টাকার উপর ছিল না। আমাদের দৃষ্টি ছিল প্রদানকারী হাতের উপর। এজন্য আমরা লাফিয়ে লাফিয়ে টাকা চাইতাম।

জান্নাত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির একটি আলামত

যাইহোক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলছেন যে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি।'

এই জান্নাত প্রার্থনা– জান্নাতের সুস্বাদু ও উপভোগ্য বস্তুর কারণে ছিল না। এ প্রার্থনা ছিল জান্নাত প্রদানকারী মহান সত্তার কারণে। হে আল্লাহ! এই জান্নাত যেহেতু আপনার সন্তুষ্টির চিহ্ন, আপনার খুশি থাকার আলামত, এই জান্নাতকে আপনি আপনার সন্তুষ্টি প্রকাশের প্রকাশস্থল বানিয়েছেন, এজন্য আমরা ভিখারী হয়ে জান্নাতের প্রার্থনা করছি। আমরা এ ব্যাপারে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করতে পারি না।

লাফিয়ে লাফিয়ে চাও

বন্দেগীর দাবি এটাই যে, যখন বলা হচ্ছে আমার কাছে চাও তখন লাফিয়ে লাফিয়ে চাও। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

چوں طمع خواہد زمن سلطان دین - خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

যখন তিনি বলছেন যে, লোভ কর, লালসা কর, তখনও কি তোমরা অমুখাপেক্ষিতা ও বিমূখতা প্রকাশ করবে? তখন তো অল্পে তুষ্টির পথ অবলম্বন করবে না। বরং তখন মুখাপেক্ষী হয়ে চাইবে।

হযরত আইউব (আ.)-এর স্বর্ণের ফড়িং জমা করা

হযরত আইউব (আ.) একবার গোসল করছিলেন। গোসলের মাঝে আসমান থেকে স্বর্ণের ফড়িং পড়তে আরম্ভ করল। তখন হযরত আইউব (আ.) গোসল বাদ দিয়ে ফড়িং ধরতে আরম্ভ করলেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি স্বর্ণের পিছনে দৌড়াচ্ছ, এখনো কি অন্তরে দুনিয়ার লোভ রয়েছে? সুবহানাল্লাহ! তখন তিনি কি অপূর্ব উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন–

اَللّٰهُمَّ لَاغِنٰى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনি যখন অবতীর্ণ করেছেন, তখন আপনার অবতীর্ণ বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী হতে পারি না। আমি তো আপনার এই বরকতের মুখাপেক্ষী। আপনি যখন এগুলো অবতীর্ণ করছেন, তখন আমিতো মুখাপেক্ষী হয়ে এর পিছনে দৌড়াবো। তাই আল্লাহ তাআলা যখন দিচ্ছেন, তখন দাসত্বের দাবি এই যে, মুখাপেক্ষী হয়ে তা গ্রহণ কর।

প্রতিদিন তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণা হচ্ছে

তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদিন এই ঘোষণা হচ্ছে যে, কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি যাকে ক্ষমা করব? কোন রিযিকপ্রার্থী আছে কি, আমি যাকে রিযিক দিব? কোন বিপদগ্রস্ত আছে কি, আমি যাকে মুক্তি দিব? তাঁর পক্ষ থেকে তো এই

ঘোষণা হচ্ছে। আর আপনি উত্তরে বলছেন যে, আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি অভাব মুক্ত (নাউযুবিল্লাহ)। আরে আপনি কোন মহান সত্তার কাছে অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করছেন? আর বলছেন যে, তিনি নিজে যা দিবেন তাই নিব। নিজের থেকে চাইব না। আরে তিনি যখন বলছেন যে, চাও! তখন তো চাওয়াই দরকার। এটাই দাসত্বের দাবি।

তাঁর রহমতের ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী হয়ো না

এ বিষয়টি মাওলানা রূমী (রহ.) তাঁর এই কবিতায় বলেছেন–

چیزے کہ بے طلب رسد آن دادہ خداست
اوراتو ردمکن کہ فرستادہ خداست

অর্থ, 'যখন আল্লাহ তাআলা কোন জিনিস না চাইতেই দান করেন, তখন ঐ জিনিসকে তুমি ফেরত দিয়ো না। কারণ, ঐ জিনিস আল্লাহর পাঠানো।' কারণ, আল্লাহ তাআলার সত্তার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। এই অমুখাপেক্ষিতা দাসত্বের দাবির পরিপন্থী।

ঐ বুযুর্গ 'মাগলুবুল হাল' ছিলেন

তাই ঐ বুযুর্গ, যিনি জান্নাত দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, তিনি 'মাগলুবুল হাল' বা ভাবোম্মত্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেও বেয়াদবীপূর্ণ কোন কথা বলা উচিত নয়। তিনি ভাবের প্রাবল্যের শিকার হয়ে একথা বলেছেন। অন্যথায় বান্দার কাজ এটা নয়। বান্দার কাজ তো হলো একথা বলা যে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

অর্থ– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত চাই'। এভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত চাবে।

মোটকথা, হযরত থানবী (রহ.) এই মালফূযে বলেন যে, যিকিরের আসল উদ্দেশ্য 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত'। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার যিকির ও ফিকির অন্তরে এমনভাবে গেঁথে যাওয়া এবং বসে যাওয়া যে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণ হয় এবং তাঁর চিন্তা অন্তরে বিদ্যমান থাকে।

চারটি জিনিসের অভ্যাস গড়

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, এই 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' অনেক বড় মুজাহাদা এবং সাধনার পর লাভ হয়ে

থাকে। তবে সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে 'ত্বরিকুল কলনদার' একটি পরিভাষা রয়েছে। এর মাধ্যমে বসে-বসে, নীরবে-নীরবে 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' লাভ হয়। চারটি জিনিসের অভ্যাস গড়াই হল 'ত্বরিকুল কলনদার'।

১. অনুকূল বিষয়ে কৃতজ্ঞতা : মনের অনুকূল যে কোন কাজ হলেই এর জন্য শোকর আদায় কর। যেমন বাতাস প্রবাহিত হল, তোমার ভাল লাগল, তখন বল—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

বাড়িতে প্রবেশ করে স্ত্রী-সন্তানকে সুস্থ ও নিরাপদ পেলে। তখন বল—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

দস্তরখানে বসার পর খানা সামনে এলো। তখন বল—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

বাচ্চাকে খেলতে দেখে ভাল লাগল। তখন বল—

اَلْحَمْدُ اِللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

এভাবে সব-সময় চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এটা জপতে থাক।

২. প্রতিকূল বিষয়ে ধৈর্য : মনের বিরুদ্ধে কোন কাজ ঘটলে ধৈর্য ধারণ করবে। যেমন বিদ্যুৎ চলে গেল, ফলে খারাপ লাগল। তখন বল—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

গরম লাগছে, তখন বল—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

কোন কষ্ট হল, তখন বল—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

পায়ে কাঁটা বিধল। তখন বল—

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

এটাকে অভ্যাসে পরিণত কর।

৩. অতীতের গোনাহের জন্য ইস্তিগফার : অতীতের কৃত গোনাহ বা খারাপ কাজের কথা স্মরণ হলে ইস্তিগফার কর। তখন বল–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

গতকাল আমার দ্বারা গোনাহ হয়েছিল। তখন বল–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

ফযর নামায পড়িনি। তখন বল–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অমুক সময় মিথ্যা বলেছিলাম। তখন বল–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

৪. ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কায় 'ইস্তিয়াযা'-আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : ভবিষ্যতে কোন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে, আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং বল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ

মাল ক্রয় করেছ এখন ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিল। তখন বল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ

কাল কি হবে, পরশু কি হবে, দুশ্চিন্তা হচ্ছে। তখন বল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাক

এই চারটি কাজ করতে থাক– শোকর, সবর, ইস্তিগফার, ইস্তিয়াযা। পঞ্চম কাজ হল দু'আ করতে থাক। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে কিছু না কিছু চাইতে থাক। যেমন, তুমি কারো সাথে দেখা করতে যাচ্ছ তখন বল– হে আল্লাহ! আমি অমুকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। গিয়ে যেন তাকে পাই।

গরম লাগছে। তখন বল– হে আল্লাহ! গরম লাগছে। আপনি গরম দূর করে দিন। হে আল্লাহ! পিপাসা লাগছে, পানি দান করুন। সবকিছু আল্লাহ তাআলার কাছে চাও।

সবক পড়তে যাচ্ছ। তখন বল– হে আল্লাহ! সবককে সহজ করে দিন। সবক যেন আমার বুঝে আসে। উস্তাদ যেন যথাসময়ে আসেন।

সবক পড়াতে যাচ্ছ। তখন বল– হে আল্লাহ! ভালভাবে সবক পড়ানোর তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ! সঠিক কথা অন্তরে ঢেলে দিন, যেন ছাত্রদেরকে ভালভাবে বুঝাতে পারি। যে কাজ করতে যাচ্ছ, যেতে যেতে দু'আ করতে থাক। বেশি বেশি দু'আ কর।

চুপে চুপে দু'আ করি

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন যে, 'যখনই কোন ব্যক্তি এসে বলে, একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করব বা একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে মনে মনে দু'আ করি, হে আল্লাহ! জানি না সে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। সে যে প্রশ্ন করবে, তার সঠিক উত্তর আমার অন্তরে ঢেলে দিন।' হযরত বলেন যে, কখনই এর ব্যতিক্রম হয় না। একেই বলে 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত'। এজন্য ছোট-ছোট কাজে এবং ছোট-ছোট বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ কর।

'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' অর্জন করার সহজ উপায়

এটি হল– 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' অর্জন করার সহজ উপায়। এর উপর নিয়মিত আমল করলে, আল্লাহ তাআলা একে সহজ করে দেন এবং এর ফলে 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' অর্জিত হয়। আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, পূর্বের লোকদের মত রিয়াযত-সাধনা কিভাবে করবে? এই 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশত' অর্জন করার জন্য তারা কত কাঠ-খড় পোড়াতেন। অনেক মাস এবং অনেক বছর খানকায় গিয়ে পড়ে থাকতেন। পীর-মাশায়েখগণ তাদের দ্বারা কঠিন কঠিন কাজ করাতেন। এখন তোমাদের মধ্যে কষ্ট করার শক্তি কোথায়? কোন শায়খ সামান্য কষ্ট চাপালে সাথে সাথে পালাবে। এখন ঐ শক্তি ও সামর্থ্য নেই। তাই কিভাবে ঐ সমস্ত রিয়াযত, সাধনা করবে?

তাই এই সহজ উপায়টির উপর আমল কর। অর্থাৎ, শোকর কর, সবর কর, ইস্তিগফার কর, ইস্তিয়াযা কর এবং বেশি বেশি দু'আ কর। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে অবিরাম দু'আ করতে থাক। এটাকে অভ্যাসে পরিণত কর। এর ফলে 'মালাকায়ে ইয়াদ দাশতে'র উদ্দেশ্য মোটের উপর লাভ হবে। এতে করে বেশির ভাগ সময় আল্লাহ তাআলার স্মরণ অন্তরে থাকতে আরম্ভ করবে। আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চল্লিশতম মজলিস

আল্লাহকে পাওয়ার পথ দুর্বলদের জন্যেও রয়েছে

আল্লাহকে পাওয়ার পথ দুর্বলদের জন্যেও রয়েছে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসের জন্য নিজের অযীফার পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং ভবিষ্যতে তা নিয়মিত করার আশা না থাকে, তাহলে এটা ধারাবাহিক আমলের পরিপন্থী নয়। কারণ, শুরু থেকে ধারাবাহিকতার ইচ্ছা তার নেই। হাদীস শরীফে আছে যে, পবিত্র রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বেড়ে যেত।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৬)

নিয়মিত অযীফা পালন করা জরুরি

সুফিয়ায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষ যেটাকে অযীফা বানাবে, তা নিয়মিত পালন করবে। অল্প আমল নিয়মিত ও অব্যাহতভাবে করা হলে অনিয়মিত অধিক আমল থেকে সওয়াব বেশি হবে। এজন্য আল্লাহর ওলীগণ এই শিক্ষা দেন যে, অযীফা যত কম হবে তত উত্তম। কারণ, তা মানুষ নিয়মিতভাবে সহজে পুরা করতে পারে। তাঁরা আরো বলেন যে, একবারে অনেক বেশি আমল নিজের উপর চাপিও না। অল্প কর, কিন্তু তা নিয়মিত কর। সকল বুযুর্গ এ ব্যাপারে খুব তাগিদ করে থাকেন।

হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ

এ ব্যাপারে তাগিদ করার কারণ এই যে, যখন মানুষ একটি নফল কাজ আরম্ভ করে এবং তারপর তা ছেড়ে দেয়, এটা বে-বরকতীর কারণ হয়ে থাকে এবং এটা নাজায়েয এর কাছাকাছি। এর মূল উৎস একটি হাদীস। যে হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযি.)কে বলেছিলেন–

يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

অর্থাৎ, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতে তাহাজ্জুদ পড়ত। তারপর সে তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

এই হাদীসে নফল কাজ আরম্ভ করে তা ছেড়ে দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

নফল কাজ শুরু করলে তা ওয়াজিব হয়ে যায়

আপনারা ফিকহের কিতাবে পড়েছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব হল কোন নফল ইবাদত যতক্ষণ পর্যন্ত আরম্ভ করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ওয়াজিব হবে না এবং তা বাদ দেয়ায় কোন গোনাহও হবে না। কিন্তু যখন শুরু করে দিল, তখন তা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, আপনি নফল নামায পড়তে যাচ্ছেন, যদি আপনি নফল নামায না পড়েন তাহলে আল্লাহ তাআলার দরবারে পাকড়াও করা হবে না। তবে যদি আপনি 'আল্লাহু আকবার' বলে দু' রাকাত নামায পড়ার নিয়ত করেন, তাহলে ঐ দুই রাকাত পড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। বিনা উযরে যদি তা ছেড়ে দেন তাহলে গোনাহ হবে। তবে যদি কোন উযর বশত: নামায ভেঙ্গে ফেলেন, তাহলে গোনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতেই কাযা করা ওয়াজিব হবে। অথচ তা ছিল নফল ইবাদত।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, যেমন একটি নফল ইবাদত শুরু করার পর তা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তেমনিভাবে একটি অযীফা আরম্ভ করার পর তা নিয়মিত করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ আমলটি ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়।

নিয়মিত অযীফা পালন করা বড় কঠিন

তবে ছেড়ে দেয়ার অর্থ ভালভাবে বুঝতে হবে। এ বিষয়েও অনেক লোকের ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। বাহ্যত মনে হয় যে, এটাতো মারাত্মক দুশ্চিন্তার বিষয় যে, কোন নফল ইবাদত শুরু করলে এবং কোন দিন তা ছুটে গেলে গোনাহ হবে এবং নিয়মতান্ত্রিকতা ছুটে যাবে। এ সমস্যার সমাধানও হযরত থানবী (রহ.) বলে দিয়েছেন। যা অন্য কোথায়ও চোখে পড়েনি।

আমল ছেড়ে দেয়ার সঠিক অর্থ

হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, কোন আমল শুরু করার পর যে তা না ছাড়ার কথা বলা হয়, তার অর্থ এই নয় যে, কোন সময়ই যেন তা বাদ না পড়ে। কারণ, হঠাৎ কোন সময় ছুটে গেলে তা ছেড়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ছেড়ে দেয়ার অর্থ এই যে, আগামীতে সব সময়ের জন্য ঐ আমল না করার ইচ্ছা করা। কারণ, যখন ঐ আমলটিকে অযীফার অন্তর্ভুক্ত করেছিল, তখন সে আগামীতে সব সময় তা করার ইচ্ছা করেছিল। তাই এটা ছেড়ে দেয়ার অর্থ এই হবে যে, আগামীর জন্য এই আমল ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করা যে, এই কাজ আর আগামীতে করব না। তখন এটা ছেড়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এই হাদীসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে–

لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ

অর্থাৎ, 'তুমি অমুকের মত হয়ো না, সে রাতে জেগে ইবাদত করত, এখন তা ছেড়ে দিয়েছে'।

এমন করলে আমল ছেড়ে দেয়ার বিপদ আসবে। তবে কোন ব্যক্তি যদি একটি আমলকে অযীফা বানিয়ে নেয় এবং তারপর কোনদিন দুর্বলতার কারণে, অলসতার কারণে বা গাফলতির কারণে ঐ আমল ছুটে যায়, তাহলে তা ছেড়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইনশাআল্লাহ! তা ছাড়ার বিপদও আসবে না। কারণ, তার ইচ্ছা হল আজ এটা ছুটে গেছে, কাল আবার আদায় করব। তাই এটা অযীফা ছেড়ে দেয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত থানবী (রহ.) একথা বলে, আমাদের মত দুর্বলদের জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমল ছুটে গেলে ভয় হত।

রমযান মাসে অযীফা বাড়ানোর আশঙ্কা

যাইহোক! সুফিয়ায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীন যখন একথা বলেছেন যে, তুমি যে অযীফা নির্ধারণ করেছ, তা নিয়মিতভাবে পালন কর। তখন এই প্রশ্ন জাগে যে, যখন রমযান মাস আসে, তখন বেশি ইবাদত করতে মন চায় এবং তখন সুযোগও থাকে এবং আমল করার তাওফীকও লাভ হয়। কিন্তু কতক সময় এই চিন্তা হয় যে, এই ইবাদত যদি শুধু রমযানের মধ্যেই করি, আর রমযানের পর তা চালু না রাখতে পারি, তাহলে আবার আমল ছেড়ে দেয়ার হাদীসের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই এবং এর কারণে আমল ছেড়ে দেয়ার বে-বরকতী না হয়।

শুধু রমযান মাসে এর উপর আমল করব

হযরত থানবী (রহ.) এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে, যদি রমযান মাসে আমল কিছু বৃদ্ধি করে। যেমন, রমযানে অন্যান্য দিনের তুলনায় নফল নামায বেশি পড়ছে, তেলাওয়াত বেশি করছে বা অন্যান্য দিনের তুলনায় যিকির বেশি করছে, তাসবীহ বেশি পড়ছে, তাহলে অন্য সময় এ আমল ঠিক না রাখলে কোন ক্ষতি নেই। রমযান মাসে এই অযীফার উপর আমল করার সময় মনে মনে একথা চিন্তা কর যে, আমি শুধু রমযান মাসের জন্যই এ আমল করছি। সব সময় করার ইচ্ছা নেই। যখন সব সময় করার ইচ্ছা নেই, তখন তা অযীফার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যখন অযীফার অন্তর্ভুক্ত নয়। তখন যদি আগামীতে ঐ আমল অব্যাহত রাখতে না পার, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমল ছেড়ে দেয়ার বে-বরকতী হবে না। তাই এর জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

হাদীস দ্বারা প্রমাণ

হযরত থানবী (রহ.) যেহেতু সব কথার দলীলও দিয়ে থাকেন। তাই এরও দলীল বয়ান করেছেন যে, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এসেছে যে–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِىْ غَيْرِهٖ

অর্থাৎ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ইবাদতের মধ্যে এমন পরিশ্রম করতেন, যা অন্যান্য দিনে করতেন না। রমযানে সব সময় তাঁর ইবাদত অধিক পরিমাণে হত। আর শেষ দশক সম্পর্কেতো এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেন যে–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِيْزَرَهٗ وَاَحْيٰى لَيْلَهٗ وَاَيْقَظَ اَهْلَهٗ

অর্থাৎ, রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লুঙ্গি (ইবাদতের জন্য) কষে বাঁধতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন।

এর দ্বারা জানা গেল যে, বিশেষভাবে রমযান মাসে কেউ যদি নিজের অযীফায় কিছু বৃদ্ধি করে, যা অন্যান্য দিনের অযীফার অন্তর্ভুক্ত নয়, এতে কোন ক্ষতি নেই। তবে মনের মধ্যে এ কথা রাখবে যে, আমি শুধু রমযান মাসের জন্য এই অযীফা গ্রহণ করছি। সব সময় করা উদ্দেশ্য নয়।

দুর্বলের অল্প আমলও যথেষ্ট

এরপর এক মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে,

> 'শক্তিশালী লোকের অধিক আমলের মধ্যে যে প্রভাব রয়েছে, দুর্বল লোকের অল্প আমলের মধ্যেও সেই প্রভাব রয়েছে। দুর্বল ব্যক্তির ঐ অল্প আমল দ্বারাই ইনশাআল্লাহ উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৬)

একজন মানুষ অনেক শক্তিশালী, সুস্থ, সুঠাম দেহের অধিকারী। সে বেশি আমল করে। অপর এক ব্যক্তি খুব দুর্বল, কাহিল-পাতলা, বেশি আমল তার দ্বারা হয় না। এ কারণে সে অল্প আমল করেই ক্ষ্যান্ত হয়। এর সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, শক্তিশালী মানুষের অনেক আমলের মধ্যে যে প্রভাব রয়েছে, দুর্বল মানুষের অল্প আমলের মধ্যে সেই প্রভাব রয়েছে। দুর্বল ব্যক্তি অল্প আমল

দ্বারা ইনশাআল্লাহ লক্ষ্য অর্জনে কামিয়াব হবে। বান্দা যত আমলই করুক না কেন, আল্লাহর দরবারে তার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলার নিকট অল্প ও বেশির কোন হাকীকত নেই। আসল জিনিস হল– ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই মহান সত্তা, যিনি মৃত্যু ও জীবনকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে ভাল আমল করে।

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 'আহসানু আমালা' বলেছেন, 'আকসারু আমালা' বলেননি। তোমাদের মধ্যে কে বেশি আমল করে, তা বলেননি। বলেছেন– কার আমল ভাল। অর্থাৎ, কার আমলের মধ্যে ইখলাসের পরিমাণ বেশি। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লিল্লাহিয়াতের সাথে, ঈমানের সাথে এবং সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে– তবে দুর্বল হওয়ার কারণে অল্প আমল করে– আল্লাহ তাআলা তার উপরও দয়া করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ঘটনা

আমার আব্বাজান (রহ.) একটি ঘটনা শুনিয়ে বলতেন যে, অনেক সময় দুর্বলের না করার আক্ষেপ আসল আমলের চেয়েও আগে বেড়ে যায়। ঘটনাটি এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য তাঁর ঘরের ছাদে দাঁড়াতেন, তাঁর প্রতিবেশীদের বর্ণনা হল– তাঁকে দেখে এমন মনে হত যেন ছাদের উপর একটি লাকড়ি দাড়িয়ে আছে। লাকড়ি যেমন নড়াচড়া করে না, তাঁর অবস্থাও তেমন হত।

তাঁর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন যে, আল্লাহ তাআলা অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু আমার বাড়ির সামনে যে কর্মকার থাকত, সে যে মর্যাদা পেয়েছে, আমি ঐ মর্যাদা পাইনি। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছিল সে ঘুম থেকে জেগে খুব অবাক হল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) এত বড় মুহাদ্দিস, এত বড় মুফাচ্ছির, ফকীহ এবং বুযুর্গ হয়ে পিছনে থেকে গেলেন। আর ঐ কর্মকার, যে কিনা সাধারণ পর্যায়ের একজন মুসলমান ছিল, সে তাঁর উপরে উঠে গেল। গিয়ে জানতে হবে, ঐ কর্মকার এমন কি আমল করত, যার ফলে সে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থেকে উপরে উঠে যায়? সুতরাং ঐ ব্যক্তি গেল এবং তার বিবির কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার স্বামী বিশেষ কি আমল করত, যার ফলে সে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থেকেও এগিয়ে গেছে? তার বিবি বলল যে, তার বিশেষ কোন আমলের কথা আমার জানা নেই। সে বেশি নফল নামাযও পড়ত না এবং বেশি তাসবীহও পাঠ করত না।

ইবাদতের আক্ষেপ

তবে তাঁর মধ্যে দু'টি বিষয় ছিল। একটি হল, সে মাঝে মাঝে আমাকে বলত যে, আমাদের বাড়ির সামনে এত বড় বুযুর্গ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) থাকেন এবং তিনি সারা রাত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন। জীবিকা উপার্জনের কোন চিন্তা নেই। এজন্য সারা রাত ইবাদত করেন। কত নেককার এবং প্রিয় বান্দা! আল্লাহ তাআলা যদি আমাকেও জীবিকা অর্জনের চিন্তা থেকে মুক্তি দান করতেন, তাহলে আমিও রাতে ইবাদত করতাম। একটি তো হলো– এই আফসোস করতেন।

আযানের সম্মান

দ্বিতীয় এই যে, সে সারাদিন লোহা পিটাতো। কিন্তু লোহা পিটানোর সময় যখন আযানের আওয়াজ কানে পড়ত। তখন যদি সে হাতুড়ি মাথার উপর উঠাত, তখন আযানের আওয়াজ শুনার পর ঐ আঘাতটি করাও তার সহ্য হত না। বরং হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযের প্রস্তুতি আরম্ভ করত। এই দু'টি বিষয়ই ছিল। এছাড়া অন্য কোন বিশেষ আমল ছিল না। ঐ ব্যক্তি বলল যে, এই দুই কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত করেছেন যে, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের পর্যায়ে পৌছার জন্য আফসোস করেছ, ঠিক আছে, আমি তোমাকে তার চেয়েও উপরে তুলে দিলাম। যাইহোক! এ কারণে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, শক্তিশালী লোকের অধিক আমল এবং দুর্বল লোকের অল্প আমল কতক সময় এক সমান হয়ে যায়। আর কতক সময় দুর্বলের অল্প আমল অধিক আমলের চেয়েও আগে বেড়ে যায়।

না পারার আফসোস অনেক বড় দৌলত

এজন্য হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) বলতেন যে, না-পারার এই আক্ষেপও অনেক বড় জিনিস, অনেক বড় দৌলত। মানুষ এই আফসোসই করুক যে, আমি তো তার মত ইবাদত করতে পারি না। আমি কোথায়, আর সে কোথায়? যদি কোন আল্লাহর ওলীকে দেখে মনের মধ্যে এই আফসোসটুকুও জাগে, তাহলে অসম্ভব নয় যে, এই আফসোসের কারণেই আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করবেন। আল্লাহ তাআলা শুধু শক্তিশালীদের জন্য, দুর্বলদের জন্য নন, তা নয়। আল্লাহ তাআলা শুধু সুস্থদের জন্য, অসুস্থদের জন্য নন বা আল্লাহ তাআলা শুধু যুবকদের জন্য, বৃদ্ধদের জন্য নন, তা ঠিক নয়। তিনি আমাদের মত দুর্বলদেরও আল্লাহ, তিনি তো সবারই আল্লাহ। এজন্য যদি কেউ দুর্বল হয়, সে দাসত্বের সাথে ভাঙ্গা মন নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে টুটা-ফাটা এই ইবাদতই পেশ করবে। সে আল্লাহকে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি তো এই তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনিই এর বদলা দান করুন। আল্লাহ তাআলাকে সে বলবে যে–

وَمَا جُهْدُ الْمُقِلِّ اِلَّا الدُّمُوْعُ

অর্থ, রিক্ত লোকের অশ্রুই পুঁজি।

এই পুঁজিই পেশ করবে। অশ্রু ঝরাবে আর বলবে যে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ

হে আল্লাহ! যেটুকু আমল সম্ভব হয়েছে, তা পেশ করছি। বাকি তোমার মহান সত্তা ও তোমার দানের উপর ভরসা।

আরে মানুষ নিজের ত্রুটিপূর্ণ আমল দেখবে, নাকি আল্লাহ তাআলার রহমতের বিশালতা দেখবে।

নিজের মুরাকাবা ছেড়ে দাও

আমাদের শায়খ ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, তোমরা যে, সব সময় নিজের মুরাকাবা কর, আমি এমন, আমি তেমন। আমার আমল এমন। কতদিন পর্যন্ত তোমরা নিজের মুরাকাবা করতে থাকবে। নিজের মুরাকাবা ছেড়ে দাও! তাঁর রহমতের মুরাকাবা কর। তাঁর রহমতের মুরাকাবা কর যে, তাঁর রহমত কতভাবে মানুষকে আচ্ছাদিত করে।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর সুস্পষ্ট ভাষণ

আমার দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসিন সাহেব (রহ.) হযরত থানবী (রহ.)-এর সহপাঠি ছিলেন এবং হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর নিকট বায়আত ছিলেন। তিনি তাঁর বিশেষ মুরীদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আজও আমার কাছে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এবং হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মক্কী (রহ.)-এর ঐ সমস্ত চিঠি সংরক্ষিত আছে, যেগুলো আমার দাদার নামে তাঁরা পাঠিয়েছেন। আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) যখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করলেন, তখন আমার দাদা তাকে বললেন যে, এখন তোমার কোন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক গড়া উচিত। সেমতে আমার দাদা আমার ওয়ালিদ সাহেবকে নিয়ে হযরত থানবী (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হন। সেখানে গিয়ে আমার ওয়ালিদ সাহেব সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, হযরত আমার ইচ্ছাতো ছিল হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর নিকট বায়আত হওয়ার। কিন্তু যেহেতু তিনি সফরে আছেন এবং নেক কাজে বিলম্ব করতে মন চাচ্ছে না, এজন্য আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। হযরত থানবী (রহ.) বললেন, এর মধ্যেতো কোন বিরোধ নেই। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) যখন ফিরে আসবেন, তখন তাঁর কাছে বায়আত হবে। এখন কাম শুরু করে দাও।

আল্লাহর পথ সবল-দুর্বল সবার জন্য রয়েছে

আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) হযরত থানবী সাহেব (রহ.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, হযরত কোন আল্লাহওয়ালার নিকট যেতে, তাঁর কাছে বায়আতের আবেদন করতে এবং ইসলাহী তাআল্লুক কায়েম করতে এজন্য ভয় হয় যে, আমি অনেক দুর্বল। আমার দ্বারা অনেক বেশি মুজাহাদা, সাধনা ও ইবাদত হয়ে উঠে না। হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে বললেন, বাহ! বাহ! আপনি তো অবাক কথা বললেন। আল্লাহ কি শুধু সবলদের জন্য, দুর্বলদের জন্য নন? আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা কি শুধু সবলদের কাজ, দুর্বলদের কাজ নয়? আমি আপনাকে এতটুকু কাজ দিব, যা আপনি আরামে করতে পারবেন। সবাইকে এক ব্যবস্থা দেয়া হয় না। প্রত্যেক রোগীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র হয়ে থাকে। তারপর কিছু অযীফা দিয়ে বললেন যে, এই সামান্য অযীফা পালন করবেন।

দুর্বলও বঞ্চিত হবে না

মোটকথা, দুর্বল ব্যক্তি যেন একথা মনে না করে যে, দুর্বলতার কারণে আমি বঞ্চিত হয়েছি। আরে দুর্বলতার কারণে কেউ বঞ্চিত হয় না। কেউ যদি বঞ্চিত হয়, সে তার বদ-আমলের কারণে বঞ্চিত হয়। নিজের গাফলতের কারণে বঞ্চিত হয়, উদাসীনতার কারণে হয়। এজন্য কেউ যদি দুর্বল হয়ে থাকে, সে অল্প আমল করলেও ইনশাআল্লাহ মনযিলে মকসূদে পৌঁছে যাবে।

দুর্বল সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রশ্ন

কয়েকজন দরিদ্র সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে নিবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সম্পদশালী সাহাবী বন্ধুগণকে দেখি যে, তারা খুব বেশি দান-খয়রাত করে। তাদের বদান্যতার হাত সব সময় মানুষের জন্য প্রসারিত থাকে। তাই তারা তো অনেক উঁচু মর্তবা অর্জন করছে। কারণ, একটি শস্য দান করার সওয়াব সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আমাদের কাছে তো টাকা-পয়সা নেই। আমরা কিভাবে দান করব। ফলে ঐ ধনীরা আমাদের চেয়ে উঁচু মর্তবায় পৌঁছে যাবে। আমরা তাদের সমান হতে পারব না। এখন আমরা কি করব?

তাসবীহে ফাতেমীর ফযীলত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি ব্যবস্থা বলছি। তোমরা তার উপর আমল করলে তাদের চেয়েও আগে চলে যাবে এবং তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

সেই ব্যবস্থা এই যে, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। তাহলে তোমরা তাদের চেয়েও আগে চলে যাবে। এখন লক্ষ্য করুন, এটি ছোট একটি আমল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর মাধ্যমে তোমরা তাদের চেয়েও আগে বেড়ে যাবে। এর কারণ এই যে, তাঁদের অন্তরে এ কারণে আক্ষেপ হচ্ছিল যে, তারা এই নেক আমলটা করছে, আর আমরা করতে পারছি না। সাথে সাথে তাঁদের সামর্থ্যে যেটুকু ছিল, তা করে যাচ্ছে। এ উভয় জিনিস যখন একত্রিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেন।

তুমি নিজের অংশের কাজ কর

এ কারণে দুর্বলদের নিজেদের দুর্বলতার কারণে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং দুর্বলতাকে সামনে রেখে যতটুকু সামর্থ্য আছে, ততটুকু করতে থাকবে। আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতেন, যা সোনার হরফে লিখে রাখার যোগ্য।

'তুমি তোমার নিজের অংশের কাজ কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর অংশের কাজ করবেন।'

হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখুন

দেখুন, হযরত ইউসুফ (আ.)কে গোনাহের দাওয়াত দেয়া হল। তাঁর জানা ছিল সব দরজা বন্ধ এবং সেগুলোতে তালা দেয়া রয়েছে। বাইরে বের হওয়ার কোন পথ নেই, কিন্তু যখন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখলেন, তখন দরজার দিকে দৌড় দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করলেন যে, গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য দরজা পর্যন্ত পালিয়ে আসাই আমার ক্ষমতা ছিল। আমি তা করেছি। এর পরের ক্ষমতা আপনার। তিনি যখন তাঁর নিজের অংশের কাজটুকু করলেন, তখন আল্লাহ তাআলাও তাঁর অংশের কাজ করলেন। তালা ভেঙ্গে গেল এবং দরজা খুলে গেল।

তুমি দৌড়তো দাও

এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

گرچہ رخنہ نیست عالم راپدید - خیرہ یوسف واری باید دوید

অর্থ, যদিও এই জগতে কোন ছিদ্র ও পথ তোমার চোখে পড়ছে না। এই অশ্লীলতার পরিবেশ থেকে, গোনাহ ও নাফরমানীর পরিবেশ থেকে কোথায় পালাবে? কোন ছিদ্র দেখতে পাচ্ছ না। কোন ছিদ্র দেখা যাচ্ছে না। বের হওয়ার

কোন পথ চোখে পড়ছে না, কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মত যতটুকু সম্ভব দৌড় দাও। যখন তুমি দৌড় দিবে, তখন আল্লাহ তাআলা নিজেই রাস্তা তৈরি করে দিবেন। তুমি তোমার অংশের কাজ কর। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর অংশের কাজ করবেন। এ মূলনীতিটি মনের মণিকোঠায় অঙ্কিত করে রাখার যোগ্য।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) একটি ঘটনা শুনাতেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার জিহাদের সময়। ইংরেজদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর চরম জুলুম-অত্যাচার চলছিল। ঐ সময় একজন মুসলমান তার ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তার চতুর্দিকে ইংরেজদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইরে বের হলে মৃত্যু নিশ্চিত। ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। ঘরে আর কেউ ছিল না। ঘরে আটকা থেকে উপবাস আরম্ভ হয়ে গেল। খাওয়ারও কিছু ছিল না, পান করারও কিছু ছিল না। এভাবে কয়েক দিন কেটে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও গলায় গেল না। উপবাসের কারণে এত বেশি দুর্বল হয়ে পড়ল যে, দাঁড়ানোর ক্ষমতাও নেই। অসারভাবে পড়ে আছে। অবশেষে এই চিন্তা করল যে, যথাসম্ভব চেষ্টা করাও তো মানুষের দায়িত্ব। আমি কি করব? পাশেই একটি বাটি পড়েছিল। বাটিটাকে শুয়ে শুয়ে অল্প অল্প ঠেলে ঠেলে আঙ্গিনায় নিয়ে এল। বাটি আঙ্গিনা পর্যন্ত পৌছার পর তিনি দু'আ করতে আরম্ভ করলেন। হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতা এতটুকুই ছিল। আমি বাটিটি আঙ্গিনা পর্যন্ত নিয়ে এসেছি। মেঘ নিয়ে এসে বৃষ্টি বর্ষণ করা আপনার কাজ। তা না হলে, আমি তো পিপাসায় মরে যাব। বলেন যে, যখন সে আঙ্গিনায় বাটি রাখলো এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করল, তখন একটু পরে মেঘ গর্জে উঠল, বিজলী চমকালো, বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং পানি দ্বারা বাটি ভরে গেল। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন।

সারকথা

কথা এটাই যে, যখন মানুষ তার সামর্থ্য অনুপাতে, সর্বোচ্চ কাজ করে এবং আল্লাহ তাআলাকে ডাকে যে, হে আল্লাহ! আমার ক্ষমতা এতটুকুই ছিল। সামনে আপনার ইচ্ছা। তখন আল্লাহ তাআলার দয়া হয়। রহমতের দরজা খুলে যায়। এজন্য দুর্বলদেরও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তারাও নিজেদের সামর্থ্য মোতাবেক নিজের অংশের কাজ করবে এবং আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা রাখবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ অভিষ্ট লক্ষ্য হাসিল হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

একচল্লিশতম মজলিস

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সংক্ষিপ্ত পথ

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সংক্ষিপ্ত পথ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

ঘরের মধ্যে সন্তান-সন্ততির সঙ্গে অবস্থান করে যিকির করা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'যদি সন্তান-সন্ততির সঙ্গে ঘরে অবস্থান করে যিকির করা না যায়, তার সমাধান এই যে, ঘর ছাড়া অন্য জায়গা পাওয়া গেলেও ইচ্ছা করে ঘরের মধ্যেই যিকির করার ইহতিমাম করবে। সহিসদের নিয়ম আছে যে, ঘোড়া যে জিনিস দেখে লাফিয়ে উঠে, তা থেকে ঘোড়াকে তারা দূরে রাখে না। কারণ, এতে বিপদ স্থায়ী হয়। বরং এমন জিনিসের সামনে যাতায়াতে অভ্যস্ত করে নেয়, ফলে আর লাফিয়ে উঠে না।
>
> তবে যে জায়গায় এমন জিনিস প্রতিবন্ধক হয়, যার সঙ্গে মেলামেশার জরুরত হবে না, সেখানে ঐ প্রতিবন্ধক থেকে দূরত্ব অবলম্বন করাই নিরাপদ। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নাও।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৭)

এমন প্রতিবন্ধক দূর করা উচিত

এ মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) বলছেন যে, 'কতক সময় যিকির করতে দু' ধরনের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। এক হয় সাময়িক প্রতিবন্ধক, সেই প্রতিবন্ধক দূর করলে আসল অযীফায় বিশেষ কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। এমতাবস্থায় ঐ প্রতিবন্ধক দূর করাই সমীচিন।

যেমন, এক ব্যক্তি একটি ঘরে থাকে। ঐ ঘরের একটি অংশে হৈ চৈ হয়। শিশুরা খেলাধুলা করে। চিল্লা-চিল্লি করে। এখন ঐ জায়গায় বসে যিকির করতে

গেলে মনের একাগ্রতা ও প্রশান্তি থাকে না। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির উচিত যিকির করার জন্য ঘরের এমন একটি জায়গা নির্বাচন করা, যেখানে হৈ চৈ কম হয়। অন্য জায়গার তুলনায় নীরবতা অধিক। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা উচিত। কারণ, এটা দূর করা সম্ভব।

এমতাবস্থায় ঘরের মধ্যেই যিকির কববে

কিন্তু প্রতিবন্ধক যদি এমন হয়, যে তা থেকে স্বাভাবিক জীবনে মুক্তি লাভ করা কঠিন, যেমন পুরা ঘর হৈ চৈ এর শিকার। সর্বদা বাচ্চারা হৈ চৈ করছে। ঘরও ছোট। নিরাপদ কোন জায়গা নেই। এমতাবস্থায় কি ঐ ব্যক্তি যিকির করার সময় ঘর ছেড়ে মসজিদ বা অন্য কোথাও চলে যাবে? অন্যত্র গিয়ে যিকির করবে, নাকি ঘরের মধ্যে বসেই যিকির করবে?

এমন ব্যক্তির জন্য হযরত থানভী (রহ.) বলছেন যে, সে ঘরে বসেই যিকির করবে। সে ঘর ছেড়ে যাবে না। কারণ, এটি একটি নিয়মিত আমল। ঘর ছেড়ে কয়দিন যাবে। এজন্য ঘরের মধ্যেই যিকির করবে। মনকে এই বিক্ষিপ্ত পরিবেশে যিকির করতে অভ্যস্ত করবে। এই অশান্ত পরিবেশে যিকির করতে অভ্যস্ত করবে। তার জন্য মসজিদে গিয়ে যিকির করার প্রয়োজন নেই।

একটি দৃষ্টান্ত

এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হযরত থানভী (রহ.) এই দিয়েছেন যে, ঘোড়া সংশোধনকারী ও প্রতিপালনকারী যেসব সহিস থাকে তাদের নিয়ম এই যে, ঘোড়া যদি বিশেষ কোন জিনিস দেখে ভয়ে লাফিয়ে উঠে। যেমন ধরুন ঘরের মধ্যে ঘোড়াও আছে, কুকুরও আছে। এখন ঘোড়া কুকুর দেখে ভয়ে লাফিয়ে উঠে। বা বড় পাত্র রাখা আছে, যা দেখে ঘোড়া লাফিয়ে উঠে। তখন সহিসদের নিয়ম হল- যেই পাত্র দেখে ঘোড়া লাফাচ্ছে, ঘোড়াকে অধীন করার জন্য ঐ পাত্র সামনে থেকে সরায় না। কারণ, আজ ঐ পাত্র দেখে লাফাচ্ছে। এজন্য তুমি ঐ পাত্র তার সামনে থেকে সরিয়ে ফেললে, কাল সে আরেক জিনিস দেখে লাফাবে, তখন তাও সরিয়ে ফেলতে হবে। পরশু তোমার শিশুকে দেখে লাফিয়ে উঠবে। তখন কি তোমার শিশুকেও ঘর থেকে বের করে দিবে। তখন তো তা প্রতিদিনের বিপদ হয়ে যাবে। এজন্য এর চিকিৎসা এই যে, ঘোড়াকে ঐ জিনিসের সাথে পরিচিত করবে। এজন্য সহিস ঐ পাত্রটি বারবার তার সামনে নিয়ে আসে। যার ফলে সে ধীরে ধীরে এ পাত্রের সাথে পরিচিত হয়ে যায়। পরিচিত হওয়ার ফলে আর লাফিয়ে উঠবে না।

মনকে এই হৈ চৈ-এ অভ্যস্ত করে নিবে

এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলছেন যে, এই ঘরেই যেহেতু তোমাকে থাকতে হবে। স্থায়ীভাবে তুমি এই ঘর ছেড়ে যেতে পারবে না। এজন্য নফসকে এই হৈ-চৈয়ের মধ্যে যিকির করতে অভ্যস্ত কর। এ অবস্থায় যদি যিকির করতে মন অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তো আল্লাহর নিয়ামত। আর যদি একাগ্রতা না আসে তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। তবে ধীরে ধীরে তার মধ্যে একাগ্রতা আসবে এবং মন এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

অস্বাভাবিক পথ অবলম্বন করা ক্ষতিকর

সারকথা এই যে, একাগ্রতা ও প্রশান্তি অর্জনের জন্য অস্বাভাবিক কোন পন্থা অবলম্বন করার জরুরত নেই। বরং অস্বাভাবিক কোন পন্থা অবলম্বন করাই ক্ষতিকর। অযীফা পালন করতে একাগ্রতা অর্জনের জন্য সামর্থ্য মোতাবেক অল্প বিস্তর চিন্তা-চেষ্টা করবে। যেমন, আমি এইমাত্র বললাম যে, ঘরের যে অংশে হৈ চৈ বেশি তা ছেড়ে দাও এবং যে অংশে হৈ চৈ কম সেখানে বসে যিকির কর। কিন্তু ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেয়ো না। এসব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কথা। হযরত থানবী (রহ.) নিজেও এসব ধাপ অতিক্রম করেছেন এবং অন্যদেরকেও এসব ধাপ অতিক্রম করিয়েছেন। শত শত বরং হাজার হাজার মানুষকে তিনি এসব ধাপ অতিক্রম করিয়েছেন। এজন্য এসব কথা তাঁর অভিজ্ঞতার নির্যাস। অন্যথায় এসব কথা বহু বছর পেরেশান হওয়ার পর অর্জন হয়। কিন্তু হযরত থানবী (রহ.) দু-চার কথার মধ্যে এ সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন।

একাগ্রতার জন্যে বেশি চিন্তা করো না

মোটকথা, যিকির নিজেই লক্ষ্যবস্তু। যিকিরের মধ্যে একাগ্রতা হলো কি হলো না, এ নিয়ে বেশি ফিকির করা উচিত না। তবে অল্প-বিস্তর চিন্তা করায় কোন ক্ষতি নেই। এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)কে লিখেছেন যে, যিকিরের মধ্যে আমার একাগ্রতা হয় না। উত্তরে হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'একাগ্রতার পর্যায়ের একাগ্রতা না হলেও যিকির ফায়দা থেকে খালি নয়।'

এজন্য একাগ্রতা আছে, না নাই সে চিন্তায় পড় না। যে মহান সত্তার যিকির মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, তার নূর ও বরকত এবং তার ফায়দা ইনশাআল্লাহ লাভ হবে এবং ধীরে ধীরে একাগ্রতাও লাভ হবে।

অধিকতর উপকারী যিকির

হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'অধিক নৈকট্য রয়েছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মধ্যে। কারণ, এ যিকির কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য যিকির যেমন 'ইল্লাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আল্লাহ' একাগ্রতা লাভের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবিকই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যিকির মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়। এজন্য তা অধিক উপকারীও বটে।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৭)

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যিকির মানব প্রকৃতির সাথে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ

হাদীস শরীফেও বর্ণিত আছে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্রেষ্ঠ যিকির। হযরত থানবী (রহ.) বারো তাসবীহ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে একথা বলেছেন। বারো তাসবীহ'র মধ্যে প্রথমে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তাসবীহ পড়া হয়। তারপর ইল্লাল্লাহ'র তাসবীহ পড়া হয়। তারপর 'আল্লাহু' আল্লাহ তাসবীহ পড়া হয়। এ সমস্ত তাসবীহ'র মধ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তাসবীহ দ্বারা বেশি নৈকট্য লাভ হয়। কারণ, এটি হাদীসে বর্ণিত যিকির। আর অন্যান্য যিকির অর্থাৎ, ইল্লাল্লাহ বা আল্লাহু আল্লাহ ইত্যাদি একাগ্রতা লাভের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ কথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, হাদীসে বর্ণিত যিকির মানব প্রকৃতির সঙ্গে অধিক সাযুজ্যপূর্ণ। অর্থাৎ, যে সমস্ত যিকির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত– তিনি নিজে করেছেন বা অন্যদের করতে বলেছেন, তা যে পরিমাণ উপকারী এবং প্রকৃতির অনুকূল, অন্য যিকির এমন নয়। এর কারণে, এ ধরনের যিকির উপকারীও বেশি।

মাসনূন যিকিরে নূর এবং বরকত থাকে

যত অযীফা, যিকির ও আমল রয়েছে, তার মধ্যে যেগুলো সুন্নাতের নিকটবর্তী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সেগুলোর মধ্যে যে নূর ও বরকত রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে যে উপকার রয়েছে, তা অন্যান্য যিকির ও অযীফার মধ্যে নেই। বুযুর্গদের থেকে অনেক যিকির এবং অযীফাই বর্ণিত আছে। ঐ সমস্ত যিকিরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে, যা

অস্বীকার করা যায় না এবং সেগুলোকে নাজায়েয ও খারাপও বলা যায় না, তবে কুরআন- হাদীসে বর্ণিত যিকিরের মধ্যে সুন্নাতের যে নূর লাভ হয়, তা অন্যান্য যিকিরের মধ্যে লাভ হতে পারে না।

কতক লোকের স্বভাব

কতক লোক এমন আছে, তাদের মন কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যিকিরের মধ্যে বসে না। এ কারণে তারা এদিক-সেদিকের অন্যান্য যিকিরের চক্করে লেগে থাকে। কেউ কেউ লাখি দরূদ, দরূদে তাজ এবং কেউ কেউ দু'আয়ে গাঞ্জুল আরশ ইত্যাদিতে লেগে থাকে। সেগুলোর দিকে তাদের মন খুব ধাবিত হয়। কিন্তু কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যিকিরের দিকে তাদের মন নিবদ্ধ হয় না। অথচ উপরোল্লেখিত যিকিরসমূহ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত নয়। এগুলোর কতকের মধ্যে তো শরীয়ত বিরোধী বিষয়ও রয়েছে। আর কিছু আছে যেগুলোর মধ্যে শরীয়ত বিরোধী বিষয় নেই। যেমন, 'হিযবুল বাহার'। এর মধ্যে শরীয়ত বিরোধী বিষয় নেই। বুযুর্গগণ এটি পড়েও থাকেন। কিন্তু কুরআন-হাদীসে যে সমস্ত দু'আ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর চেয়ে উত্তম কোন দু'আ হতে পারে না। সেগুলোর মধ্যে যে নূর, বরকত ও উপকার রয়েছে, তা অন্যান্য যিকিরের মধ্যে নেই।

দু'আয়ে মাছুরা'র বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই

বাস্তব কথা এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব কিছুর দু'আ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের কোন প্রয়োজন, কোন ঠেকা এবং কোন উপকারী জিনিস এমন নেই, যা এ সমস্ত দু'আর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এজন্য কুরআন-হাদীসে বর্ণিত এ সমস্ত দু'আর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনটাই কি? মানুষ যদি রাত-দিন এসব দু'আ পড়ার নিয়ম বানিয়ে নেয়, তাহলে এগুলোই যথেষ্ট। যিকিরের অবস্থাও একই। যে সমস্ত যিকির কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যেই নূর, যেই বরকত এবং যেই উপকার রয়েছে, তা অন্যান্য যিকিরের মধ্যে নেই।

ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ অধিক সংক্ষিপ্ত

সুফিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন তরীকা তথা পন্থা রয়েছে। এক সিলসিলায় এক পন্থা অবলম্বন করা হয়, আরেক সিলসিলায় আরেক পন্থা অবলম্বন করা হয়। সবগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করা। তবে পথ ভিন্ন ভিন্ন। কোনটি সংক্ষিপ্ত এবং কোনটি দীর্ঘ। হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, 'আমি তো দেখেছি যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ হলো, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, অন্য কোন পথ এত সংক্ষিপ্ত নয়। সুফিয়ায়ে কেরাম রিয়াযত, মুজাহাদা ও মুরাকাবার যে সমস্ত পন্থা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো উপকারী হওয়া অস্বীকার করি না এবং সেগুলোকে ছোট করাও উদ্দেশ্য নয়, তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাতে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ যত দ্রুত কার্যকর অন্য কোন পথ এত দ্রুত কার্যকর নয়।

ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মধ্যে প্রিয়ভাজন হওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে

এর কারণ এই যে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মধ্যে মাহবুবিয়্যাত বা প্রিয়ভাজন হওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থ, 'আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত রাখ, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।'

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, সুন্নাতের অনুসারীকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন। এটি চূড়ান্ত এবং প্রমাণিত কথা যে, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করবে, তার মধ্যে প্রিয়ভাজন হওয়ার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হবে। প্রিয়ভাজন হওয়ার বৈশিষ্ট্য হল, 'জযব' তথা আকর্ষণ। অর্থাৎ, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে আকর্ষণ করে থাকে। প্রেমিক প্রিয়জনকে নিজের দিকে টানার চেষ্টা করে। এজন্য যে ব্যক্তি ইত্তেবায়ে সুন্নাতের কাজ করবে, সে আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের দিকে টেনে নিবেন। 'জযবে'র এ পথ দ্রুত গন্তব্যে পৌছিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থ, 'আল্লাহ যাকে চান নিজের দিকে টেনে নেন।' (সূরা শুরা : ১৩)

অতএব ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মধ্যে মাহবুবিয়্যাত রয়েছে। আর মাহবুবিয়াতের মধ্যে রয়েছে 'জযবে'র বৈশিষ্ট্য। এজন্য আল্লাহ তাআলা সুন্নাতের অনুসরণকারীকে 'জযব' তথা আকর্ষণ করে থাকেন। এর ফলে পথ দ্রুত অতিক্রম হয়।

এক বুযুর্গ এবং এক বাদশাহর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক বাদশাহ তার দুর্গের চূড়ায় বসেছিলেন। নিচ দিয়ে এক বুযুর্গ যাচ্ছিলেন। বাদশাহর চিন্তা হল যে, এই বুযুর্গ থেকে কিছু উপকৃত হওয়া দরকার। তখন বাদশাহ ঐ বুযুর্গকে ডেকে বললেন, হযরত আমাদের দিকে একটু সুদৃষ্টি দিন। ঐ বুযুর্গ বললেন, আমি তোমার দিকে কিভাবে দৃষ্টি দিব। তোমার পর্যন্ত আসার তো কোন পথই নেই। কারণ, এত বড় দুর্গ ঘুরে ফটকে আসতে হবে। তারপর চৌকিদার ও পাহারাদারদের থেকে অনুমতি নিয়ে ভিতরে আসতে হবে। তারপর তোমার কাছে পৌঁছতে হবে। এ তো বড় কঠিন কাজ।

বাদশাহ বললেন, আমার পর্যন্ত পৌঁছা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। একথা বলে তিনি উপর থেকে একটি টুকরী নামিয়ে দিলেন। তারপর ঐ বুযুর্গকে বললেন যে, আপনি এই টুকরীর মধ্যে বসুন। তিনি তার মধ্যে উঠে বসলেন। বাদশাহ তার খাদেমদের দ্বারা টুকরীটি টেনে উপরে উঠালেন।

আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ

ঐ বুযুর্গ উপরে পৌঁছে বাদশাহকে বললেন যে, এবার বলুন কি ব্যাপার? বাদশাহ বললেন, আমাকে বলুন আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ কি? ঐ বুযুর্গ বললেন, আল্লাহ তাআলার কাছে এভাবে পৌঁছে যাও, যেভাবে আমি তোমার কাছে পৌঁছলাম। তুমি আমাকে ডাকলে, আমি সমস্যার কথা বললাম যে, এত লম্বা-চওড়া পথ অতিক্রম করে কিভাবে আসব। তখন তুমি আমাকে তোমার কাছে টেনে তুলে নিলে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে আসতে চায়, সে যেন আমাকে ডাকে আর বলে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যেতে চাই। তখন আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে নিজের কাছে টেনে নেন।

বান্দা চাইলে আল্লাহ টেনে নেন

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে–

اَللّٰهُ يَجْتَبِىٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে টেনে নেন, তিনি যাকে চান। কারণ يَشَاءُ শব্দের সর্বনাম আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরেছে। তবে এ আয়াতের মধ্যে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, يَشَاءُ শব্দের সর্বনাম مَنْ এর

দিকে ফিরবে। তখন এর অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে নিজের কাছে টেনে নেন, যে চায় যে তাকে টেনে নেয়া হোক। এজন্য কেউ যদি আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তাহলে তার উচিত আল্লাহ তাআলাকে ডাকা এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য চাওয়া। তখন আল্লাহ তাকে নিজের কাছে টেনে নেন।

এটি 'কলন্দরী' পথ

এজন্য টেনে নেয়ার এ পথ অধিকতর সংক্ষিপ্ত পথ। পক্ষান্তরে মুজাহাদা ও সাধনার পথ দূরের পথ। ফারসী ভাষায় প্রসিদ্ধ কবিতা রয়েছে যে–

صنما رہ قلندر سزا وار بمن نمائی
کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پارسائی

অর্থাৎ, রিয়াযত, মুজাহাদার যে পথ এটি তো অতি লম্বা-চওড়া পথ, যা অতিক্রম করার সামর্থ্য আমার নেই। আমাকে 'কলন্দরী' পথ দেখিয়ে দিন। 'কলন্দরী' পথ দ্বারা মহব্বতের পথ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ উদ্দেশ্য। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মাধ্যমে যখন মহব্বত পয়দা হবে, ঐ মহব্বত মানুষের মধ্যে স্টীম ভরে দিবে। ঐ ইঞ্জিন তাকে দ্রুত পথ অতিক্রম করাবে। দেখুন, রেলের ইঁন লোহার তৈরি এবং খুব ভারি জিনিস। কিন্তু যখন তার মধ্যে স্টীম ভরে দেয়া হয়, তখন ঐ ইঞ্জিন নিজেও দ্রুত যেতে থাকে এবং পুরো গাড়িকেও দ্রুত নিয়ে যেতে থাকে। একইভাবে আল্লাহ তাআলা যদি অন্তরে মুহাব্বতের স্টীম ভরে দেন, তখন রাস্তা অতি দ্রুত অতিক্রম হয়।

ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ নীরবতার পথ

এজন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ কাছের পথ। এ পথ দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তবে এ পথে কোন হৈ-চৈ নেই, যার কারণে দর্শক বুঝতে পারে না যে, এ ব্যক্তি কোন লম্বা-চওড়া পথ অতিক্রম করছে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি বসে যিকির-শোগলে মগ্ন থাকে, মুরকাবা করতে থাকে, চিল্লা লাগাতে থাকে তখন দর্শকও বুঝতে পারে যে, এ ব্যক্তি কিছু একটা করছে। কিন্তু 'কলন্দরী'র এই পথে এবং ইত্তেবায়ে সুন্নাতের এই পথে দর্শক বুঝতেই পারে না যে, সে কোন আমল করছে। যেমন, এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করল, তখন কেউ কি বুঝতে পারল, সে কি আমল করল? কিন্তু ইত্তেবায়ে সুন্নাতের ফলে আল্লাহ

তাআলার নৈকট্য লাভ হল। বাতাস প্রবাহিত হল, এজন্য সে মনে মনে বলল اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ কেউ জানতেও পারল না যে, কি থেকে কি হয়ে গেল এবং কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সম্পন্ন করল। আর তা হল শোকরের ইবাদত।

এ পথ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ

মোটকথা, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ এমন যে, দর্শক কিছু বুঝতেই পারে না। এর ফল এই হয় যে, শয়তানের যত কুমন্ত্রণা আছে অর্থাৎ, সম্পদের লিপ্সা, পদের লিপ্সা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, আত্মশ্লাঘা, প্রদর্শন প্রবৃত্তি ইত্যাদি এ পথে কম হয়ে থাকে। এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলতেন যে, নিজের মধ্যে এমনভাবে পরিবর্তন আন, যাতে মানুষ তোমার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ না করে। এমন যেন না হয় যে, কাল তো এই অবস্থা ছিল, আর আজ বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল। এর ফল এই হবে যে, মানুষ তার দিকে দেখিয়ে বলবে যে, এ ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন এসেছে। এই আঙ্গুলি নির্দেশ ফেতনার কারণ হয়ে থাকে। এর ফলে মানুষের মধ্যে আত্মশ্লাঘা, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

নীরবে পরিবর্তন আন

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, এমনভাবে পরিবর্তন আন, যেমন শিশু বালেগ হয়ে থাকে। কেউ বুঝতে পারে না যে, কোন দিন সে বালেগ হল। একদিন একদিন করে চলে গেছে। আর দেখতে দেখতে সে বালেগ হয়ে গেছে। কেউ বুঝতেই পারেনি যে, সে কখন কোন দিন বালেগ হল। এভাবে পরিবর্তন আন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নকল কর

এ পরিবর্তন এভাবে আসে যে, প্রত্যেকটি কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক করার চেষ্টা কর। সত্যি কথাতো এই যে, সমস্ত দ্বীন, সমস্ত বিধি-বিধান, সমস্ত শরীয়ত ও তরীকতের সারকথা যদি কিছু থাকে, তা হলো ইত্তেবায়ে সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা এজন্য নবী করে পাঠিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে দেখ, তাঁর নকল কর এবং তাঁর অনুসরণ কর।

প্রতিদিন নিজেকে যাচাই কর

আমাদের হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, মানুষ মনে করে যে, দ্বীন ও শরীয়তের উপর আমল করা বড় কঠিন। আরে কোন কঠিন

নয়। আমলের একটি তালিকা তৈরি করে নাও এবং তার আলোকে প্রতিদিন নিজেকে যাচাই কর। আমি তো তোমাদের জন্য 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামে একটি ডায়েরী তৈরি করে দিয়েছি। প্রতিদিন এটা দেখতে থাক যে, কোন কোন কাজে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করছি এবং কোন কাজে করছি না। যেসব কাজে সুন্নাতের অনুসরণ হচ্ছে না, একটি একটি করে সেগুলোতেও অনুসরণ আরম্ভ করে দাও। এভাবে ধীরে ধীরে বালেগ হয়ে যাবে। আর কেউ জানতেও পারবে না যে, কি থেকে কি হয়ে গেল।

পানির ফোঁটা পাথরকে ছিদ্র করে ফেলে

দেখুন, নল দিয়ে যদি ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকে, আর তার নিচে পাথর রাখা থাকে, পানির ফোঁটা একদিন পড়ল, দুদিন পড়ল, এক সপ্তাহ পড়ল, এক মাস পড়ল, ধীরে ধীরে ঐ পানি ঐ পাথরকে ছিদ্র করে ফেলবে। পানির ফোঁটার দিকে তাকালে দেখতে পারবে যে, তার মধ্যে পাথর ছিদ্র করার যোগ্যতা নেই এবং কেউ এটা বুঝতেও পারে না যে, পানির কোন্ ফোঁটা পাথর ছিদ্র করল। তবে সবগুলো ফোঁটা সমন্বিতভাবে ঐ পাথরকে ছিদ্র করে থাকে। এমনিভাবে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের আমলগুলো বাহ্যিকভাবে দেখতে খুব ছোট ছোট মনে হয়। কিন্তু সেগুলো সম্মিলিতভাবে ছিদ্র করে ফেলে। তখন দ্বীন অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এজন্য আমাদের বুযুর্গগণ অন্যসব পথ পরিহার করে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের পথ অবলম্বন করেছেন এবং এটাকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর যাহেরী ও বাতেনী উন্নতির চূড়ান্তে পৌছা

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর একথা শুনাতেন যে, তিনি বলেন, যখন আমি যাহেরী ইলম শেষ করলাম তখন শুনলাম যে, কিছু বাতেনী ইলমও আছে, যা সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট রয়েছে। আমি চিন্তা করলাম যে, সেগুলোও দেখা উচিত যে, সেগুলো কি? সুতরাং আমি সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে চার ধরনের সিলসিলা রয়েছে। চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, সাহরাওয়ার্দীয়া এবং কাদেরিয়া। এগুলোর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক শাখা রয়েছে। আমি একেক সিলসিলার লোকের কাছে গিয়ে ঐ সমস্ত সিলসিলার ইলম হাসিল করলাম এবং প্রত্যেক সিলসিলার লোকেরা যে সমস্ত

পন্থা নির্ধারণ করেছিল ঐ সমস্ত পন্থা শুধু দেখেছি তা-ই নয়, বরং সেগুলো বাস্তবায়ন করেছি এবং সে অনুপাতে আমল করেছি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক উঁচু মাকাম দান করেন। তারপর তাতে উন্নতি করতে করতে এমন মাকামে পৌঁছি যে, তা যাহেরী আলেমগণ বুঝা তো দূরের কথা, বাতেনী আলেমগণও তা বুঝতে অক্ষম।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর দু'আ

কিন্তু আমি সব মাকাম অতিক্রম করার পর একটি দু'আ করি এবং যে ব্যক্তি এই দু'আর উপর আমীন বলবে ইনশাআল্লাহ তার জন্যও এ দু'আ কবুল হবে। সেই দু'আ এই যে,

'হে আল্লাহ! আমাকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের তাওফীক দান করুন। আমীন

হে আল্লাহ! আমাকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উপর জীবিত রাখুন। আমীন

হে আল্লাহ! আমাকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের উপর মৃত্যু দান করুন। আমীন

মোটকথা, যে সমস্ত যিকির কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং যে সমস্ত দু'আ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেই নূর ও বরকত রয়েছে, সেই নূর ও বরকত অন্যান্য যিকিরের মধ্যে নেই।

হাদীসে বর্ণিত দরূদ পড়া উচিত

বর্তমানে মানুষ অন্যান্য দরূদ তালাশ করে থাকে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরূদ শরীফের অনেক পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। সে সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) পূর্ণাঙ্গ কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাবের নাম 'আল-কউলুল বাদী' ফিস-সালাতি 'আলাল হাবিবিশ্ শাফী'। এ কিতাবে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দরূদ শরীফের শত শত বাক্য সংকলন করেছেন। এজন্য নিজেদের পক্ষ থেকে দরূদ শরীফ বানানোর দরকার নেই। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত যিকির, দু'আ ও দরূদই পড়া উচিত। এতে অনেক বরকত রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের জন্য যিকির এবং শেষ পর্যায়ের লোকের জন্য তেলাওয়াত

এরপর হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে–

> 'প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের যিকিরের প্রতি অধিক মগ্নতা মুনাসিব। আর শেষ পর্যায়ের লোকের জন্য মুনাসিব তেলাওয়াত।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৭)

সূচিপত্র

প্রাথমিক পর্যায়ের লোকের প্রথম দিকে মন বসে না, এজন্য যিকির করা তার জন্য বেশি উপযোগী। কারণ, এর মধ্যে তার মন বসে যায়। কিন্তু শেষ পর্যায়ের লোকের জন্য তেলাওয়াত করা মুনাসিব। তারা যত বেশি তেলাওয়াত করবে, তত বেশি তাদের জন্য ফায়দা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বিয়াল্লিশতম মজলিস

ইস্তিগফার ও অন্যান্য অযীফা আদায় করা

ইস্তিগফার ও অন্যান্য অযীফা আদায় করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'রাতে জাগ্রত হওয়া নিশ্চিত না হলে ইশার পর সব অযীফা আদায় করা উত্তম।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৭)

রাতের বেলা ঘুম ভাঙ্গলে ইস্তিগফার কর

কতক সময় তাহাজ্জুদের নামাযের সাথে কিছু অযীফা নির্ধারণ করা হয়। সেগুলোর জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় হল, শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার এবং অযীফা আদায় করার অভ্যাস করা। তবে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) আমাদের মত দুর্বলদের জন্য খুব সহজ সমাধান দিয়েছেন। যাদের শেষ রাতে উঠার অভ্যাস নেই, বা কোন কারণে তার জন্য শেষ রাতে উঠা কঠিন, এমন লোকদের জন্য একটি পদ্ধতি তো আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) এই বলেছেন যে, যখনই রাতের বেলা ঘুম ভাঙ্গবে, তখনই উঠে অল্প সময় বিছানার উপর বসবে এবং কিছু দু'আ করবে। কমপক্ষে তিনবার এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, রাতের বেলা আল্লাহ তাআলার ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকে যে, আছে কোন ক্ষমাপ্রার্থী? যাকে আমি ক্ষমা করব। ঘোষক তো ঘোষণা করছে, কিন্তু মানুষ অমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবে আর কিছু চাবে না, এটি বড় অবমূল্যায়নের কথা। এজন্য রাতে যখন ঘুম ভাঙ্গবে, তখন নামায ইত্যাদি পড়তে না পারলেও কমপক্ষে বসে অল্প সময় দু'আই করবে। দু'আ করার পর আবার ঘুমিয়ে পড়বে। তবে এটি আবশ্যক করে নিবে যে, যখনই চোখ খুলবে তখনই এই আমল করবে। যখন কোন ব্যক্তি এটাকে

আবশ্যক করে নিবে, ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন তার তাহাজ্জুদ পড়ার অবশ্যই তাওফীক হবে।

এক নেকী অন্য নেকীকে আকর্ষণ করে

আল্লাহ তাআলা নেক কাজের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, এক নেকী অপর নেকীকে আকর্ষণ করে। এজন্য ঘুম ভাঙ্গলে যখন উঠে বসবে এবং দু'আ করবে এবং অন্তরে ঈমানও রয়েছে, তখন তার মনে অবশ্যই এই চিন্তা আসবে যে, এখন তো আমি উঠেই গেছি। ঘুমও হয়েছে। দু-চার রাকাত নামায পড়েই নেই। এভাবে ধীরে ধীরে আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করেন।

ইশার সাথে তাহাজ্জুদ পড়ার প্রমাণ

দ্বিতীয় পদ্ধতি হযরত থানবী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, রাতে উঠার যদি সাহস না হয়, তাহলে ইশা'র ফরয ও সুন্নাতের পর এবং বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে কয়েক রাকাত নামায পড়বে। আমাদের সব বুযুর্গই এই পদ্ধতির কথা বলে এসেছেন। এ পদ্ধতি ভিত্তিহীন নয়। বরং থানবী (রহ.) নিজে এই মালফূযের পর 'মু'জামে কাবীরে'র উদ্ধৃতিতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে–

عَنْ اِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ صَلَاةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ نَاقَةً وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

হযরত ইয়ায ইবনে মুয়াবিয়া আল মুযানী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের বেলা কম-বেশি নামায অবশ্যই পড়। যদিও এতটুকু সময়ের জন্য হোক না কেন, যতটুকু সময়ে বকরীর দুধ দোহন করা হয়। অর্থাৎ, অল্প সময়ের জন্য হলেও এবং ইশা'র নামাযের পর যে নামায পড়া হবে তা রাতের মধ্যেই গণ্য হবে।

রাতের অন্ধকারে কিছু ইবাদত

একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সমস্ত আমলের কথা বলেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করে। এ রকম কয়েকটি আমল বর্ণনা করার পর অবশেষে একটি চমৎকার শব্দ বলেছেন,

وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ

অর্থ– 'এবং রাতের অন্ধকারে কিছু অংশ।'

এজন্য شَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ রাতের শেষ ভাগে না হলে, রাতের শুরু ভাগেই করবে। ইশা'র পরেই পড়বে। উপরে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে–

وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

অর্থ, ইশার পরে যে সময় রয়েছে তা সবই রাতের অংশ। এজন্য ইশার পর যে ইবাদত করা হবে তাও রাতের ইবাদত বলে গণ্য হবে।

তাহাজ্জুদের আসল সময়

এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে উত্তম হল শেষ রাতে পড়া। রাতকে দু'ভাগে ভাগ করা হলে শেষ অর্ধেক উত্তম সময়। মোটকথা, অর্ধেক রাতের পর তাহাজ্জুদের নামায পড়া উত্তম। অধিক উত্তম হলো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়া। কারণ, তাহাজ্জুদ শব্দটি 'হুজুদ' থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ রাতে ঘুমানো (মিসবাহুল লুগাত : "হাজদ")। এজন্য ঘুমিয়ে ওঠার পর তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম। তবে কোন কারণে যদি রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া মুশকিল হয়, তাহলে রাতের প্রথমভাগেই পড়বে। যেন তাহাজ্জুদের ফযীলত থেকে বঞ্চিত না হয়। তবে এই নিয়ত রাখবে যে, শেষ রাতে ঘুম ভাঙ্গলে তখনো তাহাজ্জুদ পড়ব। আর না জাগলে এগুলোই তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

বিতরের পরের দু' রাকাতের গুরুত্ব

বিতরের পর যে দু' রাকাত নফল পড়া হয়, সে সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে যে, তা এজন্য পড়া হয় যে, শেষ রাতে যদি ঘুম না ভাঙ্গে তাহলে যেন মানুষ তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত না হয়। এর দ্বারা জানা গেল যে, রাতের প্রথম ভাগে তাহাজ্জুদের নিয়তে কয়েক রাকাত পড়লেও ইনশাআল্লাহ তাহাজ্জুদের ফযীলত ও সওয়াব লাভ হবে।

টিকা : পুরা হাদীস এই–

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر و لن يشاد

الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة

অর্থাৎ, 'রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দরবারে কিছু আমল করাও এসব আমলের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো মানুষকে জান্নাতে পৌঁছায়'।

এই রাকাতগুলো তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত

আমি একবার আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর কাছে চিঠিতে লিখি যে, হযরত! মন চায় যে, شَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ এর তাওফীক হোক। কিন্তু আমার স্বভাবগত দুর্বলতা ও ঘুমের অনিয়মের কারণে সুযোগ হয় না। হযরত উত্তরে লিখেন যে, ইশার সাথে তো আপনি পড়েন। এটাই شَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ এর স্থলাভিষিক্ত। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার দয়ায় যা লাভ হয় তাই নিয়ামত। যদি শেষ রাতে ওঠার সুযোগ না হয় তাহলে রাতের প্রথম ভাগেই কয়েক রাকাত পড়ে নেয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দয়া করে 'কিয়ামুল লাইলে'র তাওফীক দান করুন এবং তার বরকত থেকে বঞ্চিত না করুন। আমীন।

ইশা'র পর অযীফা পুরা কর

এর সাথে হযরত থানবী (রহ.) এ কথাও বলেন যে, যে সমস্ত অযীফা তাহাজ্জুদের সময়ই আদায় করতে হয়। যেমন, কতক বুযুর্গ বলেছেন যে, বারো তাসবীহের সবচেয়ে উত্তম সময় হল তাহাজ্জুদের সময়। ঐ সময় পড়া সবচেয়ে বেশি উপকারী। কিন্তু যদি তাহাজ্জুদের সময় ওঠা না হয় তাহলে ইশার পরেই ঐ সমস্ত অযীফা পুরা করবে। ইনশাআল্লাহ, এটা তাহাজ্জুদের সময় পড়ার স্থলাভিষিক্ত হবে।

অযীফা পুরা না হওয়ার কারণে তাওবা-ইস্তিগফার

হযরত থানবী (রহ.) বলেন,

> 'যদি অধিক কাজ-কারবারের কারণে আমল ও অযীফা পুরা করতে না পারে তাহলে যতটুকু সম্ভব করতে থাকবে এবং যেটুকু অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ইস্তিগফার ও অনুতাপের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ করবে। সফলতা লাভের জন্য এটাই যথেষ্ট।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৮)

অর্থাৎ, মানুষ যতটুকু আমল ও অযীফা নির্ধারণ করবে, তা একথা চিন্তা করে নির্ধারণ করবে যে, এগুলো আমাকে পুরা করতে হবে। এজন্য অতটুকুই নির্ধারণ করবে, যা পুরা করতে পারবে। তবে যেহেতু প্রত্যেক মানুষের সাথেই কিছু না কিছু সমস্যা লেগে থাকে। এজন্য কোন সমস্যার কারণে যদি কেউ তার অযীফা পুরা করতে না পারে তাহলে এজন্য নিরাশ হবে না। বরং যেটুকু সম্ভব তা পুরা করবে এবং যেটুকু ছুটে গিয়েছে, তার জন্য ইস্তিগফার করবে এবং অনুতপ্ত হবে।

অযীফার পরিমাণ কমাও, কামাই দিও না

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, 'যে পরিমাণ অযীফা নির্ধারণ করেছে, তা বাদ দিবে না। তবে প্রয়োজনের সময় তা সংক্ষিপ্ত করবে। যেমন, অযীফা নির্ধারণ করেছিল ১০০ বার। এখন কোন কারণে ১০০ বার পড়া মুশকিল হলে ৫০ বার পড়বে। ৫০ বার পড়াও মুশকিল হলে তেত্রিশ বার পড়বে। তেত্রিশ বার পড়াও মুশকিল হলে এগার বার পড়বে। এগার বার পড়াও মুশকিল হলে সাতবার পড়বে এবং সাতবার মুশকিল হলে তিনবার পড়বে এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, অতক্ষণ বিছানায় যাব না, যতক্ষণ তিন তিনবার এই অযীফা পুরা না হবে। তবে আমল ছাড়বে না। কারণ, আমল ছাড়ার মধ্যে অনেক বে-বরকতী রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার রহমতের কাছে এই আশা রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা এই অল্প পরিমাণ আমলেও সফলতা দান করবেন।

অবশিষ্টটুকুর ক্ষতিপূরণ ইস্তিগফারের মাধ্যমে করবে

একদিকে তো অল্প পরিমাণ আমলই করবে। অপর দিকে যে পরিমাণ আমল ছুটে গিয়েছে, তার জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা, লজ্জা প্রকাশ করবে ও ইস্তিগফার করবে এবং আল্লাহ তাআলাকে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি এর উপর আমল করতে পারিনি। তাহলে এই অক্ষমতা, অসহায়ত্ব ও ইস্তিগফার অবশিষ্টটুকুর ক্ষতিপূরণ করবে। ইস্তিগফার বড় বিস্ময়কর জিনিস। কোন আমল ছুটে গেলে তা পরিমাণের দিক দিয়ে ছুটুক বা মানের দিক দিয়ে ছুটুক– যেমন একটি ইবাদত যে পরিমাণ করা দরকার ছিল তা করেনি, বা যেভাবে করা দরকার ছিল সেভাবে করেনি– তাহলে ইস্তিগফারের মাধ্যমে উভয়টির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

ইবাদতের পর আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং আসতাগফিরুল্লাহ বলা

আমি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর কাছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর একটি বাণী শুনেছি, যা কোন কিতাবে চোখে পড়েনি। তবে তিনি কোন কিতাব থেকেই যে বর্ণনা করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাণীটি এই–

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যে কোন ইবাদত করার পর যদি এই দুটি বাক্য বলে– একটি হল, আলহামদুলিল্লাহ আর অপরটি আস্তাগফিরুল্লাহ– তাহলে শয়তান বলে যে, সে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে।'

যেমন, নামায পড়ল এবং নামাযের পর আলহামদুলিল্লাহ এবং আস্তাগফিরুল্লাহ বলল, তাহলে শয়তান বলে যে, সে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে।

শয়তানের একটি ষড়যন্ত্রের চিকিৎসা ইস্তিগফার

এর কারণ এই যে, শয়তানের চাল দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি ষড়যন্ত্র এই হয়ে থাকে যে, যখন মানুষ নামায পড়ে শেষ করে তখন শয়তান তাকে বলে যে, তুই কি নামায পড়লি, তুই কয়েকটি ঠোকর মারলি মাত্র। তুই কি, তোর নামাযই বা কি? তোর এই নামাযের কোন দাম নেই। কারণ, নামাযের মধ্যে তোর ধ্যান একদিকে ছিল, মন আরেক দিকে ছিল। তোর দ্বারা নামাযের আদবও পুরা হয়নি, শর্তও পুরা হয়নি। এজন্য এ নামায দ্বারা তুই কোন সওয়াব ও প্রতিদান পাবি না। তোর এ নামায বেকার। এসব কথার মাধ্যমে শয়তান তার মধ্যে নামাযের ব্যাপারে নিরাশা সৃষ্টি করে। এই নিরাশার চিকিৎসা এই যে, নামাযের পর বলবে আস্তাগফিরুল্লাহ। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই নামাযের ভিতর যেসব ত্রুটি হয়েছে, আমি তা মাফ চাচ্ছি। এজন্য ইস্তিগফার করছি। এর ফল এই হবে যে, যে সমস্ত ত্রুটি হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা সেগুলো পুরা করে দিবেন। কারণ, এই ইস্তিগফার প্রত্যেক ত্রুটিপূর্ণ আমলকে পরিপূর্ণ বানিয়ে দেয়।

অপর ষড়যন্ত্রের চিকিৎসা আলহামদুলিল্লাহ্

শয়তানের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র এই হয়ে থাকে যে, মানুষ যখন ইবাদত করে, তখন তাকে অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত করে। সে বলে যে, বাহ্! তুই তো অনেক উত্তম ও উন্নত মানের ইবাদত সম্পন্ন করেছিস। এখন তো তুই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিস।

আরবীতে প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে–

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ

'একবার এক জোলা দু' রাকাত নামায পড়ে ওহীর প্রতীক্ষায় বসে রইল, কখন আমার উপর ওহী নাযিল হয়।'

এমনিভাবে আমাদের মত মানুষের অল্প-বিস্তর ইবাদতের তাওফীক হলে মাথার মধ্যে শয়তান ঢুকে পড়ে। এরও চিকিৎসা এই যে, ইবাদত শেষ করে বল 'আলহামদুলিল্লাহ'। আরে আমি কি আর আমার ইবাদতই বা কি? তাঁর দেয়া ও তাওফীকেই এই ইবাদত সম্পন্ন হয়েছে। আমার কী মূল্য আছে যে, আমার দ্বারা ইবাদত হতে পারে।

جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے
جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

'যা কিছু হয়েছে তা আপনার দয়াতেই হয়েছে, আর যা কিছু হবে তাও আপনার দয়াতেই হবে।'

আল্লাহ তাআলার মর্জি ছাড়া একটি অণুও নড়তে পারে না। এজন্য ইবাদতের পর বল 'আলহামদুলিল্লাহ'। হে আল্লাহ! আপনার শোকর আদায় করছি যে, আপনি আমাকে ইবাদত করার তাওফীক দান করেছেন। মোটকথা, প্রত্যেক ইবাদতের পর আলহামদুলিল্লাহ এবং আস্তাগফিরুল্লাহ বল। আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর দেয়া তাওফীকের জন্য শোকর আদায় কর এবং আস্তাগফিরুল্লাহ বলে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাও এবং মনে কর যে, আমার দ্বারা সঠিকভাবে ইবাদত সম্পন্ন হয়নি। এই দু'টি জিনিস যখন একত্রিত করে নিবে, তখন শয়তান বলবে যে, সে আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। এখন আমার আর এখানে পথভ্রষ্ট করার কোন উপায় নেই।

প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার ইস্তিগফার

এ কথাতো হাদীস শরীফের মধ্যে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ! বলতেন। তিনি বলতেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ!' এখন প্রশ্ন জাগে যে, এখানে ইস্তিগফার করার কি হল? কারণ, ইস্তিগফার তো গোনাহের পর করা হয়, ইবাদত করার পর নয়। কিন্তু এখানে নামায পড়ার পর সাথে সাথে ইস্তিগফার করা হচ্ছে। এর কারণ কী? এর কারণ এই যে, ইস্তিগফারের মাধ্যমে এ কথার স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে যে, হে আল্লাহ! যেমন নামায পড়া উচিত ছিল, এমন নামায পড়া আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। হে আল্লাহ! এজন্য আমাকে মাফ করুন।

একদিনে সত্তরবার ইস্তিগফার

মোটকথা, এই ইস্তিগফার এক অপূর্ব গোনাহনাশক প্রক্রিয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। সব সময় ইস্তিগফার করার অভ্যাস করা উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, আমি প্রতিদিন সত্তরবার ইস্তিগফার করি। আলেমগণ বলেন যে, এই 'সত্তর' সংখ্যা আধিক্য বুঝানোর জন্য এসেছে, 'সত্তর' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ বুঝানোর জন্য নয়। অর্থাৎ, আমি খুব বেশি ইস্তিগফার করি। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত গোনাহ থেকে নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও যখন এত বেশি ইস্তিগফার করতেন, তাহলে

তো আমাদের সব সময় ইস্তিগফার করা উচিত। কারণ, আমরা তো সব সময় গোনাহ এবং ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত থাকি। আর না হলেও আমাদের ইবাদতে তো ত্রুটি হয়ে থাকে। তার সমাধান হল এই ইস্তিগফার।

ইস্তিগফারের দ্বারা মর্যাদার উন্নতি হয়

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, ইস্তিগফার এমন এক জিনিস, যার মাধ্যমে কতক সময় মানুষ এত উঁচু মর্যাদা লাভ করে যে, যদি মানুষ ভুল না করত, তাহলে হয়ত: এত উঁচু মর্যাদা লাভ করতে পারত না, যা ভুল করার পর ইস্তিগফার করার দ্বারা লাভ হয়।

আমার গোনাহ গোল্লায় যাক!

আমাদের এক বুযুর্গ ছিলেন, হযরত বাবা নাজম আহসান সাহেব। তিনি হযরত থানবী (রহ.)-এর মুজাযে সোহবত ছিলেন। অসাধারণ বুযুর্গ লোক ছিলেন তিনি। ভাল কবিতা রচনা করতেন। 'দাগ' ও 'মীর'-এর ন্যায় সাবলীল কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁর এক অপূর্ব কবিতা আছে যে–

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی - ایسی تیسی میرے گناہوں کی

'আহ্'– এর দৌলত আমি পেয়ে গেছি। তাই আমার গোনাহ গোল্লায় যাক।'

এখানে 'আহ!' দ্বারা ইস্তিগফার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আমি যখন ইস্তিগফারের দৌলত লাভ করেছি, তখন আর গোনাহ আমার কী করবে?

ভঙ্গুর মন পসন্দনীয়

আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, ভুল হয়ে যাওয়ার পর একজন মানুষ যখন খাঁটিভাবে ইস্তিগফার করে। ঐ ইস্তিগফারের ফলে মনে যে ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হয়, অসহায়ত্ব, দাসত্ব সৃষ্টি হয়। এ অসহায়ত্ব ও দাসত্বের ফলে আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে অনেক উঁচু মর্যাদায় পৌঁছে দেন। কতক সময় এজন্য ভুল করানো হয়, যাতে তার মধ্যে ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এই ইস্তিগফার এক বিরল– বিস্ময়কর জিনিস।

আমাদের শায়েখ (রহ.) বলতেন যে, একজন মানুষ বসে কাঁদছে, আর বলছে যে, আমার ভুল হয়ে গেছে। তার এই কান্না আল্লাহ তাআলার খুব পসন্দনীয়। তখন ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার 'সাত্তার' ও 'গাফফার' নামের প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরিগণিত হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার 'সাত্তার' ও 'গাফফার' গুণ তখনই তার উপর প্রকাশ পায়।

শয়তান তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়ে দেয়ার ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) প্রতিদিন নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। একদিন তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গেনি, ফলে তাহাজ্জুদ ছুটে গেছে। ভোরে জাগার পর মনে খুব ব্যথা হয়েছে। আজ আমার তাহাজ্জুদের নামায ছুড়ে গেল। এর ফলে তিনি সারা দিন কাঁদতে থাকেন এবং তাওবা-ইস্তিগফার করতে থাকেন। পরের দিন ঘুমিয়ে গেলে তাহাজ্জুদের সময় তাঁকে জাগানোর জন্য এক ব্যক্তি আসে। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কে? সে বলে, 'আমি শয়তান।' তিনি বলেন, 'তাহাজ্জুদের জন্য জাগানোর সাথে তোমার কি সম্পর্ক?' সে বলে, 'এসব কথা ছেড়ে দাও। তাড়াতাড়ি উঠে তাহাজ্জুদ পড়।' তিনি বললেন, 'কিন্তু তুমি আমাকে উঠাচ্ছো কেন? তুমি তো নামায থেকে দূরে সরিয়ে নাও'। শয়তান উত্তর দিল যে, 'গতকাল আমি আপনাকে গাফেল করে ঘুমিয়ে দিয়েছিলাম। এর ফলে আপনার তাহাজ্জুদ কাযা হয়েছিল। যে কারণে আপনি সারা দিন কাঁদতে এবং ইস্তিগফার করতে থাকেন। এর ফলে আল্লাহ তাআলা আপনার মর্যাদা এত উঁচু করে দিয়েছেন যে, তাহাজ্জুদ পড়লেও ঐ মর্যাদা লাভ হত না। এজন্য আমি চিন্তা করেছি যে, আজ আমি নিজেই উঠিয়ে দিব, যাতে অধিক মর্যাদা লাভ না হয়।'

ইস্তিগফার অত্যন্ত কার্যকর জিনিস

মোটকথা, এই ইস্তিগফার অনেক কার্যকর জিনিস। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, একদিকে গোনাহ করতে থাক, আর অপর দিকে ইস্তিগফার করতে থাক। বরং এর অর্থ হল কখনো যদি ভুল হয়ে যায়, ত্রুটি হয়ে যায়– আর মানুষের দ্বারা এমন হয়েই থাকে– তখন ইস্তিগফারকে নিজের নিয়মিত আমলে পরিণত করে নাও। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে ইস্তিগফার কর। ঐ সময় পর্যন্ত মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইস্তিগফারকে নিজের নিয়মিত আমলে পরিণত না করে। এজন্য যখনই ইবাদত-বন্দেগীতে এবং চিন্তা ও কল্পনায় কোন ভুল হয়ে যায়, সাথে সাথে বল–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

এই ইস্তিগফার সব বিষের প্রতিষেধক।

ইস্তিগফার শয়তানের বিষের প্রতিষেধক

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, আল্লাহ তাআলা শয়তানকে সৃষ্টি করে একটি বিষ সৃষ্টি করেছেন। আর এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা বিষ সৃষ্টি করবেন, আর বিষনাশক সৃষ্টি করবেন না।

এজন্য তিনি শয়তানের বিষের সাথে ইস্তিগফারের বিষনাশক সৃষ্টি করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, যখনই শয়তান তোমাদেরকে দংশন করবে, তখনই এই বিষনাশক ব্যবহার করবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিষাক্ত গাছ

আল্লাহ তাআলার নিয়ম হল– তিনি যখন কোন রোগ সৃষ্টি করেন, তখন তার ঔষধ সৃষ্টি করেন। যখন বিষ সৃষ্টি করেন, বিষনাশকও সৃষ্টি করেন। একবার আমরা গাড়িতে দক্ষিণ আফ্রিকার শহর কেপটাউন সফর করছিলাম। পথে নামাযের সময় হল। এমন সময় একটি সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাই। আমরা চিন্তা করলাম যে, এখানে নেমে নামায পড়ে নিই। গাড়ি থেকে নামলাম। সাথীরা অযু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ঐ সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করার জন্য নিকটবর্তী গাছ ও ঘরের কাছে যাই। ওখানে একটি গাছ ছিল, তার পাতা ছিল খুব সুন্দর। আমি যখন পাতা ছেঁড়ার জন্য হাত বাড়ালাম, তখন আমার এক সাথী মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে আমার কাছে এসে বলে যে, না মাওলানা! এতে হাত লাগাবেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনি বললেন যে, এটি অত্যন্ত বিষাক্ত গাছ। এতে হাত দিলে হাতের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। বিচ্ছু দংশন করলে যেমন বিষের লহর উঠতে থাকে। এতে হাত দিলেও এমন লহর উঠতে থাকে। এটি এত মারাত্মক। এজন্য আমি আপনাকে হাত দিতে নিষেধ করেছি।

আমি বললাম, এতো মারাত্মক বিপজ্জনক গাছ। এখন না হয় আপনি আমাকে বললেন। কিন্তু অজানা কোন মানুষ এসে যদি এতে হাত দেয়, তখন তো তার পুরো শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়বে। সফর সঙ্গীরা বললেন যে, একথা তো ঠিক। কিন্তু যেখানে এই গাছ গজায়, তার গোড়াতেই আরেকটি গাছ অবশ্যই গজায়, যা এর বিষের প্রতিষেধক। এজন্য এ গাছে হাত লাগার কারণে কোন ব্যক্তির যদি বিষ ওঠে, আর সে নিচের গাছে হাত লাগায়, তখন ঐ বিষ শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা সব বিষেরই প্রতিষেধক সৃষ্টি করেছেন।

তাওবাকারী ব্যক্তি গোনাহ থেকে পবিত্র

এমনিভাবে এই শয়তানও একটি বিষ। আল্লাহ যখন একে সৃষ্টি করেছেন, তখন এর প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন। সেই প্রতিষেধক খুব সহজ। তা অর্জন করতে খুব দূরে যেতে হয় না। বরং যে কোন মানুষ একটু মনোযোগ দিয়ে খাঁটি অন্তরে অনুতপ্ত হয়ে এবং আগামীতে গোনাহ না করার সংকল্প নিয়ে যদি বলে– أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ তাহলেই সমস্ত বিষ শেষ হয়ে যায়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

'গোনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই।'

তাওবা করার পর তার আমলনামা থেকে ঐ গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। যে গোনাহ থেকে তাওবা করা হয় তা আমলনামায় অবশিষ্ট থাকে না। এজন্য ইস্তিগফার বড় চমৎকার জিনিস।

শেষ রাতে ইস্তিগফার কেন

কুরআন কারীমে যখন এ আয়াত নাযিল হল−

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

'আল্লাহ তাআলার নেক বান্দারা রাতে খুব কম ঘুমায় এবং সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং ভোর রাতে তারা ইস্তিগফার করে।'

তখন হযরত আয়েশা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ভোর রাতে ইস্তিগফার করার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সারারাততো ইবাদত করেছেন। কোন গোনাহ তো করেননি যে, তার থেকে ইস্তিগফার করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই ইবাদতের ব্যাপারে ইস্তিগফার করেন যে, হে আল্লাহ! আমি তো ইবাদত করেছি, কিন্তু আপনার ইবাদতের হক আদায় হয়নি। তাই ইস্তিগফার করছি। আর যখনই বলল যে, আমার দ্বারা হক আদায় হয়নি, তখনই ঐ ইবাদত কবুল হয়ে গেল।

সারকথা

এজন্য সব সময় ইস্তিগফার করার অভ্যাস করা উচিত। যখনই অতীতের কোন গোনাহের কথা স্মরণ হবে, তখনই ইস্তিগফার করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তেতাল্লিশতম মজলিস

আমল ও অযীফার উদ্দেশ্য 'দাসত্ব'

আমল ও অযীফার উদ্দেশ্য 'দাসত্ব'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

অযীফার আসল উদ্দেশ্য 'দাসত্ব'

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'অযীফার আসল উদ্দেশ্য যা, তা রোগের মধ্যেও লাভ হয়– অর্থাৎ 'দাসত্ব'। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৮)

কতক সময় রোগ ইত্যাদি কারণে মানুষের অযীফা ছুটে যায়। অযীফা ছুটে যাওয়ার কারণে কারো কারো দুঃখ হয়। বিষয়টি দুঃখের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কতক সময় বিষয়টি অস্থিরতা ও পেরেশানীর পর্যায়ে পৌছে যায়। এ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, অযীফা ছুটে গেলে পেরেশান হওয়া ঠিক নয়। কারণ, এ সমস্ত যিকির-আযকার, আমল ও অযীফার সারবস্তু হলো, 'বন্দেগী' তথা দাসত্ব প্রকাশ করা। তাই অসুস্থতার কারণে যদি আমল ছুটে যায়, অসুস্থতার কারণে যদি অযীফা ছুটে যায়, তখন অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মধ্যে যে অক্ষমতা ও ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হয়, এই ভঙ্গুরতার কারণেও আপনা-আপনি দাসত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে।

'রুখসত' তথা ছাড়ের উপর আমল করাও পসন্দনীয়

আল্লাহু তাবারকা ওয়াতাআলা যত বিষয়ে 'রুখসত' তথা ছাড় দিয়েছেন, সে সবগুলোর এই একই অবস্থা। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتٰى رُخَصُهٗ كَمَا يُحِبُّ اَنْ تُوْتٰى عَزَائِمُهٗ

অর্থ: 'আল্লাহ তাআলা যেভাবে 'আযীমত' তথা মূল বিধানের উপর আমল করা পসন্দ করেন, তেমনিভাবে 'রুখসত' তথা ছাড়ের উপর আমল করাও পসন্দ করেন।'

কারণ, 'আযীমত' আল্লাহ্ তাআলার আযমতের হক, আর 'রুখসত' মানুষের দাসত্বের হক এবং দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্ তাআলার সামনে মানুষ কী বাহাদুরী দেখাবে? না, বরং আল্লাহ্ তাআলার সামনে তো ভঙ্গুরতা, দাসত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত। 'রুখসতে'র উপর আমল করলে মানুষের মধ্যে অক্ষমতা, দাসত্ব ও ভঙ্গুরতার ভাব সৃষ্টি হয়। আর এই মনোভাব মানুষকে অনেক উঁপরে পৌঁছে দেয়। এজন্য 'রুখসতে'র উপর আমল করতে কখনোই মন ছোট করা উচিত নয়।

'রুখসতে'র উপর আমল করতে মন ছোট করবে না

মানুষ আগে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিবে যে, 'রুখসতে'র উপর আমল করার সুযোগ আছে কি না। অর্থাৎ, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সময় 'রুখসতে'র উপর আমল করার অবকাশ আছে কি-না। যখন এ বিষয়ে নিশ্চিত হবে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে 'রুখসতে'র উপর আমল করার সুযোগ আছে, তখন 'রুখসতে'র উপর আমল করতে মন ছোট করবে না। এ সময় ব্যাথিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এটাই পসন্দনীয়।

এ রোযা কার জন্য রাখছো

এ রোযা তুমি কার জন্য রাখছো? যদি নিজের জন্য এবং নিজের খুশির জন্য রাখো এবং নিজের আকাঙ্ক্ষা পুরা করার জন্য রাখো, আর অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই এ জন্য দুঃখ কর যে, অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা ছুটে গেল। আর যদি রোযা আল্লাহর জন্য রেখে থাকো, আর আল্লাহ বলছেন যে, অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছেড়ে দাও, তাহলে রোযার যে উদ্দেশ্য, রোযা ছেড়ে দেয়ার দ্বারাও তা লাভ হবে। না খাওয়ার দ্বারা যে উদ্দেশ্য লাভ হবে, এখন খাওয়ার দ্বারা সে উদ্দেশ্য লাভ হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যখন খেতে বলছেন, তখন খাওয়াই উচিত। কারণ, দ্বীনের হাকীকত হলো আল্লাহর হুকুম মানা। হুকুম মানতে গিয়ে মন ছোট করার কিছু নেই। রোযা না রাখাও কোন কোন অবস্থায় পছন্দনীয় হয়ে থাকে, আর কোন কোন অবস্থায় 'ওয়াজিব' হয়ে থাকে। কিন্তু আপনিতো পণ করে রেখেছেন যে, অসুস্থ হই আর যাই হই আমি তো রোযা রাখবোই। মনে রাখবেন, এটি আল্লাহ্ তাআলার দাসত্ব ও আনুগত্যের পরিপন্থী। বরং আল্লাহর সামনে নিজের বাহাদুরী দেখানো। আমি বড় বাহাদুর, অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখছি।

সফর অবস্থায় রোযা রাখা

এ কারণে হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন–

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ

'সফরের অবস্থায় রোযা রাখা নেক কাজ নয়।'

এখানে ঐ সফর উদ্দেশ্য, যার মধ্যে বেশি কষ্ট হয়। এমন সফরে রোযা রাখা নেক কাজ নয়। আর চিন্তা করে দেখুন, এক দিকেতো রোযার ফায়দা বয়ান করা হচ্ছে, তার সওয়াব ও প্রতিদানের কথা বলা হচ্ছে এবং ঘোষণা করা হচ্ছে— রোযা আমার জন্য, আমিই তার বদলা দিব। এই রোযা সম্পর্কেই আবার বলছেন যে, এখন রোযা রাখা নেক কাজ নয়। কেন? এ কারণে যে, এখন আমার হুকুম নেই। যখন আমার হুকুম নেই, তখন রোযা রাখা কোন ফযীলতের কাজ নয়। কোন নেকীর কাজ নয়।

তিনি যেমন বলেন তেমন কর

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার সামনে বাহাদুরী করা ভাল কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন অসুখ দিয়েছেন, সমস্যা দিয়েছেন, তখন এর দাবি হল— এখন 'রুখসতে'র উপর আমল কর। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন—

چوں کہ بر میخت بندد بستہ باش
چوں کشاید چابک و برجستہ باش

'যখন তিনি বেঁধে ফেলে রাখেন, তখন পড়ে থাকাই বন্দেগীর দাবি। আর যখন তিনি ছেড়ে দেন, তখন খুব দুরন্তপনা দেখাও।'

এখন আল্লাহ তোমাকে 'রুখসত' দান করেছেন, তাই রুখসতের উপর আমল কর। 'রুখসতে'র উপর আমল করতে কখনো মন ছোট করো না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন

কতক মানুষের মন কঠোরতা তালাশ করে। তারা চায় যে, অধিক থেকে অধিক কষ্টের কাজ করবে। তারা কষ্ট খুঁজে থাকে। কারণ, তারা মনে করে যে, এতে বেশি ফযীলত রয়েছে, এতে বেশি সওয়াব রয়েছে। অনেক বুযুর্গ থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে। এজন্য তাদের ব্যাপারে এমন কোন কথা বলা উচিত নয়, যার দ্বারা তাদের শানে বেয়াদবী হয়। তবে সুন্নাত তরীকা এটা নয়। সুন্নাত তো ঐটা, যা হাদীস শরীফের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বলে বর্ণিত হয়েছে।

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلَّا اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا

'যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হতো, তখন তিনি অধিকতর সহজটিকে গ্রহণ করতেন।'

(আবু দাউদ শরীফ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকতর সহজটি অবলম্বন করা কি তাঁর আরাম-আয়েশের জন্য ছিল। কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কি তিনি এমন করতেন? নাকি দুনিয়ার বিলাসিতা লাভের জন্য তিনি এমন করতেন? নাউযুবিল্লাহ! বলাবাহুল্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে এমন কথা কল্পনা করা যায় না যে, তিনি আরামের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন। আসল কথা হল– সহজপন্থা অবলম্বন করার মধ্যে অধিক দাসত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলার সামনে বাহাদুরী দেখাতে নেই। বরং অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত যে, আমি দুর্বল বান্দা। আমি তো সহজ পন্থা অবলম্বন করব। এটি হল দাসত্ব। এই দাসত্ব প্রকাশ করার জন্য তিনি সহজ পন্থা অবলম্বন করতেন। যদি কষ্টসাধ্য পন্থা অবলম্বন করতেন– তাহলে তার অর্থ হতো, তিনি নিজের বাহাদুরী দেখাচ্ছেন।

সৌন্দর্যের অহমিকা ভাঙ্গতে চাও কি?

আমার এক বড় ভাই ছিলেন। তাঁর নাম মরহুম যকী কাইফি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচু মর্যাদা দান করুন। আমীন। তিনি উন্নত মানের কবিতা রচনা করতেন। 'কাইফিয়াত' নামে তার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়টিকে তিনি একটি কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে মানুষ তাঁর এ কবিতা বুঝে না। তিনি বলেন–

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں
توڑنا ہے حسن کا پندار کیا

'তুমি কি সৌন্দর্যের অহমিকা ভাঙ্গতে চাও যে, তুমি আমাকে যত কষ্ট দিবে, সব আমি সহ্য করব।' (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ তাআলার কাছে বাহাদুরী দেখাতে নেই। সেখানেতো ভঙ্গুরতা ও অক্ষমতা পসন্দনীয়।

এক বুযুর্গের ঘটনা

একবার এক বুযুর্গ অন্য এক অসুস্থ বুযুর্গকে দেখতে যান। তিনি গিয়ে দেখলেন, ঐ বুযুর্গ অসুস্থ অবস্থায় 'আলহামদু লিল্লাহ'-এর অযীফা পড়ছেন। যে

বুযুর্গ দেখতে গেলেন, তিনি তাকে বললেন যে, আপনার মাকামতো অনেক উর্ধ্বে। কারণ, আপনি এ অবস্থায়ও শোকর আদায় করছেন। তবে একটি কথা বলি, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আলহামদু লিল্লাহ'র অযীফা পড়তে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থতা লাভ হবে না এবং আপনার এই কষ্টও দূর হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেন যে, একটু 'হায় হায়' করুন! এবং আল্লাহ তাআলাকে বলুন যে, হে আল্লাহ! এ কষ্ট দূর করে দিন।

নবীসুলভ আমল

যেমন হযরত আইউব (আ.) বলেছিলেন–

أَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

'নিশ্চয়ই আমি অসুস্থতায় আক্রান্ত, আর আপনি হলেন সর্বাধিক দয়ালু।'

এটি হলো, নবীসুলভ আমল। যখন কষ্টে আক্রান্ত হবে, তখন বলবে যে, হে আল্লাহ! আমার এই কষ্ট হচ্ছে। আপনি দয়া করে তা দূর করে দিন। আল্লাহ তাআলাকে ডাক। নিজের কষ্টের কথা তাঁকে বল। আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ বলে তুমি তাঁর সামনে বাহাদুরী দেখাচ্ছ যে, আমি যত অসুস্থই হই না কেন, তারপরও আহ! উহ! করব না। এমনটি যেন না হয়। বরং আল্লাহ তাআলার সামনে অক্ষমতা প্রকাশ কর। এরই নাম দাসত্ব। তিনি যখন চাচ্ছেন যে, তোমার কষ্টের কথা তাঁর সামনে তুলে ধর, তখন এটি তুলে ধরার মধ্যেই দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। তবে এই তুলে ধরা যেন অভিযোগের আকারে না হয়, বরং নিজের অক্ষমতা প্রকাশের জন্য হয় যে, হে আল্লাহ! আমি অক্ষম বান্দা। আপনি সুস্থতা দান করুন।

দাসত্বের দাবি

মোটকথা, দাসত্বের দাবি এই যে, মানুষ 'আযীমতে'র উপরও আমল করবে এবং 'রুখসতে'র উপরও আমল করবে। 'রুখসতে'র উপর আমল করতে মন ছোট করবে না। আর যদি সহজাত দুঃখ হয়– আর এমনটি হয়ও। কারণ, এক ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রেখে এসেছে। এখন অসুস্থতার কারণে যদি রোযা ছুটে যায়, তাহলে এর জন্য দুঃখ হয়। তখন এই দুঃখের জন্য ইনশাআল্লাহ সওয়াব হবে। তবে 'রুখসতে'র উপর আমল করতে মন ছোট করবে না। এর নাম দাসত্ব। এর নাম বন্দেগী।

মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা

মনে রাখবেন, মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা, যার উপরে মানুষের আর কোন মর্যাদা হতে পারে না, তা হলো দাসত্বের মর্যাদা। আল্লাহ তাআলার বন্দেগীর

মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

'হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে এমন মর্যাদামণ্ডিত রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, আপনি সাক্ষী হবেন। আপনি সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁরই নির্দেশে আহ্বানকারী এবং আপনি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।'

দেখুন! এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর কত গুণ বর্ণনা করেছেন। কেমন উচ্চাঙ্গীকে তাঁর উচু মর্তবা তুলে ধরেছেন, কিন্তু কুরআনুল কারীমে যেখানে মেরাজের আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, 'আমি তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়েছি। উর্ধ্ব:লোকে ভ্রমণ করিয়েছি।' সেখানে যে শব্দ বলেছেন, তা হলো এই–

سُبْحَانَ الَّذِيْٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থ, 'পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি রাতের একটি ক্ষণে তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে ভ্রমণ করিয়েছেন।'

এক্ষেত্রে–

شَاهِدًا ، مُبَشِّرًا ، دَاعِيًا ، سِرَاجًا مُّنِيرًا

এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কোন একটিও বর্ণনা করেননি। এখানে শুধুমাত্র "عبد" শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে নিয়ে গেছেন। এর দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা দাসত্বের মর্যাদা। আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের দাসত্ব, অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করার মর্যাদা।

আল্লাহ তাআলা ভগ্ন হৃদয়ের সাথে থাকেন

এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ

অর্থ: 'আল্লাহ তাআলা ভগ্ন হৃদয়ের সাথে থাকেন'।

যেমন, অসুস্থতার কারণে রোযা ছুটে গেল, রোযা ছুটে যাওয়ার দুঃখে মন ভেঙ্গে গেল। আল্লাহ তাআলা সেই ভগ্ন হৃদয়ের সাথে থাকেন এবং ভগ্ন হৃদয়কে সম্মানিত করেন। এই মন-ভাঙ্গা তার দুঃখের কারণে হোক, বেদনার কারণে

হোক, দুশ্চিন্তার কারণে হোক, আল্লাহর ভয়ে হোক, আখেরাতের ফিকিরে হোক, যেভাবেই হোক না কেন, যখন মন ভেঙ্গে যায়, তার উপর আল্লাহ তাআলার রহমত অবতীর্ণ হয়। যখন মনের উপর রাত-দিন আঘাত পড়তে থাকে, এক সময় কষ্ট হল, এক সময় দুঃখ হল, এক সময় পেরেশানী হল, এভাবে মনকে ভাঙ্গা হয়। কেন ভাঙ্গা হয়? এজন্য যে, এই মনের উপরে আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত, তাঁর দয়া ও করুণা বর্ষণ করবেন। কবি বলেন–

تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

'তুমি এই আয়নাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখো না। কারণ, এটি এমন এক আয়না, যা ভেঙ্গে গেলে কারিগরের চোখে অধিক প্রিয়।

এই মন যত ভাঙ্গবে, ততই তার সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে প্রিয় হবে।

একে ভেঙ্গে নতুন কিছু বানাবো

আমাদের শায়ক হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) একটি কবিতা শুনাতেন। নির্বাচিত কবিতা হযরতের মুখস্ত ছিল। তিনি বলতেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন অন্তরকে ভাঙ্গেন, তখন মূলত: ঐ ব্যক্তিকে অনেক উর্ধ্বে পৌঁছানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মানুষের উপর যত দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা আসে, এগুলো অনৈচ্ছিক মুজাহাদা আর অনৈচ্ছিক মুজাহাদা মানুষকে এত দ্রুত উন্নত করে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এত দ্রুত উন্নতি সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে তিনি একটি কবিতা শুনাতেন–

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اسکو بگاڑ کے

'একথা বলে পেয়ালার কারিগর পেয়ালা নিক্ষেপ করল যে, এটি ভেঙ্গে নতুন কিছু বানাবো।'

যখন এই মন ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে, তখন অন্য কিছুই হয়ে যায়। তখন ঐ মনের উপর আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী এবং তাঁর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) এ বিষয়ে আরো একটি কবিতা শোনাতেন–

بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں
جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں

'চন্দ্রমুখী প্রেমাস্পদ বিরান ঘরে বাস করে। যাকে ধ্বংস করে তারই অন্তরে বিরাজ করে।'

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর তাজাল্লী দান করেন। এজন্য এ সমস্ত দুঃখ-বেদনার ফলে যে অশ্রু ঝরে এতে ভয় পেয়ো না। এই যে মন ভাঙ্গছে, এই যে তপ্ত শ্বাস বের হচ্ছে, এতে ঘাবড়িও না। অন্তরে যদি আল্লাহর উপর ঈমান থাকে, অন্তরে যদি আল্লাহর বিশ্বাস থাকে, তাহলে এ সমস্ত তপ্ত শ্বাস, এ সমস্ত বেদনার প্রকাশ তোমাকে অনেক উপরে পৌঁছে দিবে। কবির ভাষায়–

وادی عشق بسے دور دراز ست ولے
طے شود جادہ صد لہ بآ ہے گاہے

অর্থ: 'প্রেমের উপত্যকা যদিও অনেক দূর, কিন্তু অনেক সময় একটি তপ্ত শ্বাসে শত বছরের পথ অতিক্রান্ত হয়ে যায়।'

এজন্য নিজের ভিতরে ভগ্নতা সৃষ্টি কর। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হবে এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের অন্তরে এ অক্ষমতা ও ভগ্নতা সৃষ্টি করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চুয়াল্লিশতম মজলিস

যিকিরে মন না বসার কারণসমূহ

যিকিরে মন না বসার কারণসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

যিকিরের ফায়দা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'শুধু অন্তরে যিকির করাও উপকারী যদি তা ইচ্ছা করে করা হয়, অন্যথায় ইচ্ছা ছাড়া কাঙ্ক্ষিত উপকার লাভ হয় না। অন্তর ও মুখ উভয়কে সমন্বিত করলে অধিক উপকারী হয়।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৮)

অর্থাৎ, যিকিরের শব্দগুলো যদি মুখে যিকির করা না হয় শুধু অন্তরে যিকির করা হয়। অন্তরে যিকির করার অর্থ হলো, জিহ্বা নাড়ানো ছাড়া শুধু মনে মনে দোহরাইতে থাকলো। যদি স্বেচ্ছায় মনে মনে ঐসব শব্দ দোহরায় তাহলে এটা উপকারী। আর যদি ইচ্ছা ছাড়া দোহরায়, তাহলে উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। কারণ, হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

'যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সওয়াবের আশায় রমযানে রোযা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।'

এ হাদীসে রোযার ফলে গোনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত বলা হয়েছে। এক হলো, ঐ ব্যক্তিকে ঈমানদার হতে হবে। দ্বিতীয় হলো, 'ইহতিসাব' থাকতে হবে। 'ইহতিসাবে'র অর্থ হল, সওয়াবের নিয়তে রোযা রাখতে হবে। তাই যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং সওয়াব হাসিলের নিয়তে রোযা রাখবে তখন এই ফায়দা হবে।

স্বাদ লাভের জন্য রোযা রাখা

এজন্য কোন ব্যক্তি যদি শুধু রোযা রাখার নিয়তে রোযা রাখে তাহলে মাসআলার দিক থেকেতো রোযা হয়ে যাবে, কিন্তু ঐ রোযার উদ্দেশ্য যেহেতু

আল্লাহ তাআলাকে রাজী করা এবং সওয়াব হাসিল করা ছিল না, এজন্য এই রোযার সওয়াবও হবে না। হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন যে, একবার উচ্চ শিক্ষিত খুব মডার্ণ এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসল। সে দ্বীনের অন্যান্য হুকুমের উপরতো আমল করত না, তবে খুব নিয়মতান্ত্রিকভাবে রোযা রাখত। একদিন এ বিষয়ে কথা হলে, আমি তাকে বললাম যে, মাশাআল্লাহ! আপনিতো খুব নিয়মতান্ত্রিকভাবে রোযা রাখেন। উত্তরে তিনি বললেন, শরীয়ত যদি রোযার হুকুম নাও দিত, তবুও মানুষের সুস্থতার জন্য বছরে এক মাস রোযা রাখা জরুরী। আমি এজন্য রোযা রাখি যে, এক মাস রোযা রাখার ফলে স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকে। দ্বিতীয়ত: ইফতারের সময় খানা খেতে যে স্বাদ পাওয়া যায়, তা সারা বছরে অন্য কোন সময় পাওয়া যায় না। এ দুই কারণে আমি রোযা রাখি। এখন দেখুন, ঐ ব্যক্তি সারা মাস রোযা রাখছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ইফতারের স্বাদ অর্জন করা এবং সুস্থতা লাভ করা। তাই ঐ রোযা 'ইহতিসাব' অর্থাৎ, সওয়াবের উদ্দেশ্যে হলো না। এমন রোযার ঐ ফযীলত পাওয়া যাবে না, যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু রোযা রাখার ইচ্ছা ছিল এজন্য যদি কোন মুফতীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ রোযা হয়েছে কি-না? তাহলে ঐ মুফতী জওয়াব দিবেন যে, রোযা হয়েছে। কিন্তু কোন 'সুফী'র কাছে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহলে সে জওয়াব দিবে যে, ঐ রোযা হয়নি। অর্থাৎ, ঐ রোযার যে উদ্দেশ্য ছিল তা লাভ হয়নি।

জিহ্বা ও অন্তর উভয়ের দ্বারা যিকির করবে

এ কারণেই হযরত থানবী (রহ.) এই মালফূযে বলেন যে, 'যিকিরও তখনই উপকারী হয়, যখন তা ইচ্ছা করে করা হয়। যদি এমনিতেই যিকির করার জন্য জিহ্বা চলতে থাকে আর তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে রাজী করা উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে ঐ যিকিরের উপকার পাওয়া যাবে না। এরপর হযরত বলেন, 'অন্তর ও জিহ্বা উভয়কে যিকিরের মধ্যে সমন্বিত করা অধিক উপকারী।'

অর্থাৎ, অধিক উপকার ঐ যিকিরের মধ্যে হয়, যেখানে মুখে যিকির করা হয় আর অন্তরেও তার কল্পনা থাকে। এরূপ যিকির অধিক উপকারী। এর প্রথম কারণ এই যে, এ অবস্থায় দু'টি অঙ্গ আল্লাহর স্মরণে মশগুল। যদি শুধু অন্তর দ্বারা যিকির করত, তাহলে শুধু একটি অঙ্গ মশগুল থাকত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, জিহ্বা যদি সাথে যিকির না করে তাহলে অন্তর খুব তাড়াতাড়ি পদস্খলিত হয়। এইমাত্র যিকির করতে শুরু করল, হঠাৎ অন্তরে অন্য কোন চিন্তা আসল, সাথে সাথে-অন্তর পদস্খলিত হয়ে যায়। কিন্তু জিহ্বাও যদি সাথে যিকির করতে থাকে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইচ্ছা করে তাকে না থামাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে

চলতেই থাকবে। এ কারণে জিহ্বা দ্বারা যিকিরের মধ্যে দৃঢ়তা, অবিচলতা ও স্থায়িত্ব জন্মায়। এজন্য বুযুর্গগণ বলেন, মানুষ যেন এই ধোঁকায় না থাকে যে, শুধু অন্তরে যিকির থাকাই যথেষ্ট, বরং অন্তরের যিকিরের সাথে মুখের যিকিরও অব্যাহত রাখবে।

যিকিরের মধ্যে মন না বসার কারণসমূহ

একটি মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) বলেন, 'মন না বসার অনেকগুলো ধরন রয়েছে। কখনো তো কোন কাজের চিন্তায় মন অস্থির থাকে। কখনো কোন অঙ্গ রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে মন অস্থির থাকে। কখনো ক্ষুধার কারণে, কখনো গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে। এ সমস্ত কারণের মধ্যে যা প্রতিহত করার ক্ষমতা রয়েছে, তা প্রতিহত করে যিকিরে রত হবে। ক্ষুধার্ত হলে খানার ব্যবস্থা থাকলে খেয়ে নিবে। নাজায়েয সম্পর্ক থাকলে তা পরিত্যাগ করে যিকিরে মশগুল থাকবে। এরপরও যদি মন না বসে, তাহলে কোন পরোয়া করবে না। যিকিরকে উদ্দেশ্য মনে করে তা পুরা করবে। ইনশাআল্লাহ, যিকিরের বদৌলতে অবস্থার সংশোধন হয়ে যাবে।

আগে কাজ কর তারপর যিকির কর

অনেক মানুষ এ রকম আছে যারা বলে, আমরা যিকির করি কিন্তু যিকিরের মধ্যে মন বসে না। এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন যে, 'যিকিরের মধ্যে মন না বসার অনেক কারণ থাকে। কতক সময় যিকিরের মধ্যে মন এজন্য বসে না যে, মনের মধ্যে কোন কাজ করার চাহিদা রয়েছে। ঐ চাহিদার কারণে মন বসে না। এমন সময় যেই কাজের চাহিদা রয়েছে আগে ঐ কাজ করে নিবে। তারপর নিশ্চিন্তে যিকির করবে। মনে রাখবেন, নামায হোক, যিকির হোক, অযীফা হোক বা যে কোন ইবাদত হোক যথাসম্ভব খালি মনে করার চেষ্টা করবে। এজন্য মনের মধ্যে কোন কাজের চাহিদা থাকলে প্রথমে ঐ কাজ করবেন তারপর ইবাদত করবেন। এ কারণে শরীয়তের হুকুম এই যে, যদি পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়, তাহলে আগে ঐগুলো থেকে ফারেগ হও বা প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগে থাকলে আগে খানা খেয়ে নাও।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর আমল

হাদীস শরীফে এসেছে যে-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتّٰى يَفْرُغَ وَاِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ

অর্থ, কতক সময় জামাত দাঁড়িয়ে যায়। ইমাম সাহেব তিলাওয়াত আরম্ভ করে দেন, তার তিলাওয়াতের আওয়াজ কানে আসতে থাকে, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) খানা খেতে থাকেন এবং খানা খাওয়া শেষ করে নামাযে অংশ নেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত জামাত দাঁড়িয়ে গেছে, আর আপনি খানা খাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন–

لَاَنْ اَجْعَلَ طَعَامِىْ صَلَاةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَجْعَلَ صَلَاتِىْ طَعَامًا

অর্থ, আমি আমার খাওয়াকে নামায বানাই, তা আমার কাছে নামাযকে খাওয়া বানানোর চেয়ে অধিক পসন্দনীয়।

কারণ, তীব্র ক্ষুধা অবস্থায় গিয়ে নামাযে দাঁড়ালে মন-মগজ খানার সঙ্গে আটকে থাকবে। ফলে নামাযের মধ্যে মন বসবে না। পক্ষান্তরে যদি আমি জামাত দাঁড়ানো অবস্থায় খানা খেতে থাকি, তখন মন নামাযের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে যে, জলদি খাওয়া শেষ করে জামাতে গিয়ে শামিল হও। তখন এই খানাও নামাযে পরিণত হবে। আর খানাকে নামায বানানো উত্তম, নামাযকে খানা বানানোর তুলনায়। এজন্য আমি খানা খাচ্ছি।

নামায শেষ হওয়ার জিনিস নয়

আমাদের মুখে একটি ভুল বাক্য খুব বেশি ব্যবহার হয়, সেদিকে আমাদের মনোযোগ নেই। কিন্তু এমন কথার দিকে বুযুর্গদের নজর ঠিকই যায়, সাধারণ মানুষের নজর যায় না। আমরা সচরাচর এ কথাটি বলে থাকি যে, নামায থেকে অবসর হয়ে নিই, তারপর নিশ্চিন্তে খানা খাবো, বা নামায থেকে অবসর হয়ে নিই, তারপর নিশ্চিন্তে কথা বলব। একবার হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)-এর সামনে আমি এ কথা বলি যে, নামায থেকে অবসর হয়ে নিই, তারপর কিছু কথা বলব। হযরত ওয়ালিদ সাহেব বললেন যে, তুমি এ কেমন কথা বললে যে, নামায থেকে অবসর হয়ে তারপর কথা বলব। মনে রাখবে নামায অবসর হওয়ার জিনিস নয়। তোমার কথার অর্থ তো এই যে, নামায একটি বোঝা। তা থেকে তাড়াতাড়ি অবসর হতে চাও। আর তোমার আসল কাজ ঐটা, পরবর্তীতে যেটা করতে চাও। যেমন, তুমি যদি বলো, নামায থেকে অবসর হয়ে নিই, তারপর খাবার খাবো। তার অর্থ এই হয় যে, তোমার আসল উদ্দেশ্য হলো খাবার খাওয়া। নামায হলো একটি বোঝা, যা তাড়াতাড়ি মাথা থেকে নামিয়ে তা থেকে অবসর হতে চাও। তিনি বললেন, এটি বেয়াদবীপূর্ণ কথা এবং সম্পূর্ণ ভুল কথা। কুরআনুল কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে যে–

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থ– যখন আপনি অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হবেন, তখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে নামায ও অন্যান্য ইবাদত পালন করে ক্লান্ত হন।

এজন্য অন্যান্য কাজ থেকে অবসর হয়ে নামাযের দিকে মনোযোগী হবে। এমন নয় যে, নামায থেকে অবসর হয়ে অন্যান্য কাজে মনোযোগী হবে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য কাজ কেমন ছিল। তিনি কি টাকা-পয়সা জমা করছিলেন, কোন চাকরি করছিলেন, না-কি কোন ধন-সম্পদ জায়গা-জমি বানাচ্ছিলেন? এমন ছিল না, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত ব্যস্ততা দ্বীনের ব্যস্ততাই ছিল। কখনো জিহাদের ব্যস্ততা, কখনো তালীমের ব্যস্ততা, কখনো তারবিয়াতের ব্যস্ততা, কখনো সিয়াসতী বা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যস্ততা, কখনো বিবিদের মনোরঞ্জনের কাজ, কখনো সাহাবায়ে কেরামের সমস্যা দূরীকরণের কাজ ইত্যাদি। এসব কাজও দ্বীনের কাজ ছিল। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেন যে, এসব কাজ থেকে অবসর হয়ে আমার দিকে মনোযোগী হও।

নামায মৌলিক নেক কাজ

এর কারণ এই যে, এ সমস্ত কাজ পরোক্ষ নেক কাজ, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার তাসবীহ-তাহলীল করা প্রত্যক্ষ নেক কাজ। ঐ সমস্ত কাজ ছিল পরোক্ষ উদ্দেশ্য, আর এ কাজ হল প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। দ্বীনের অন্যান্য কাজের মধ্যে আর ইবাদতসমূহের মধ্যে এটাই পার্থক্য। এজন্য এই হুকুম দেয়া হচ্ছে যে, পরোক্ষ উদ্দেশ্য থেকে অবসর হয়ে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের দিকে আস। এজন্য একথা বলা বেয়াদবী যে, নামায থেকে অবসর হয়ে খানা খাব। কারণ, নামায অবসর হওয়ার জিনিস নয়। বরং খানা থেকে অবসর হয়ে নামায পড়। প্রথমে মনকে খানা থেকে অবসর কর। তারপর মৌলিক উদ্দেশ্যের দিকে আস।

শায়খ হাসান মাশশাত (রহ.)-এর আমল

মক্কা মুকাররমায় আমার এক শায়খ ছিলেন, হযরত শায়খ মাশশাত মালেকী (রহ.)। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঁচু মর্যাদা দান করুন, আমীন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে যখন মক্কা মুকাররমায় যাই, তখন সেখানে দীর্ঘ সময় থাকার সুযোগ হয়। তিনি প্রতিদিন আছর নামাযের পর হারাম শরীফে হাদীস শরীফের দরস দান করতেন। তাঁর দরসে বসার সৌভাগ্য আমার লাভ হয়েছে। বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। আরবে এমন বুযুর্গ খুব কম দেখেছি। ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও উত্তম আখলাকের প্রতিমূর্তি ছিলেন। মানুষ খুব বেশি তাঁর কাছে যাতায়াত করত। কেউ তাঁর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে, কেউ মাশওয়ারা করছে, কেউ অন্য কথা বলছে, আমি তাঁর এই নিয়ম দেখেছি যে, মাগরিবের নামাযের পর অবিলম্বে দুই

রাকাত সুন্নাত পড়তেন। তারপর আগত লোকদের সাথে সাক্ষাত দান করতেন। তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতেন। এভাবে কতক সময় আধা ঘণ্টা পার হয়ে যেত। যখন সবাইকে উত্তর দিয়ে অবসর হতেন এবং সবাইকে বিদায় করে দিতেন, তখন দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে আওয়াবিন নামায আরম্ভ করতেন।

এভাবে কাজ করায় দু'টি ফায়দা রয়েছে

সাধারণ নিয়ম তো এই যে, কেউ আওয়াবিন পড়তে চাইলে মাগরিব নামাযের পর দু' রাকাত সুন্নাত পড়ে সাথে সাথে ছয় রাকাত আওয়াবিন পড়বে। মানুষ অপেক্ষা করতে থাকলে অপেক্ষা করবে। কিন্তু তাঁর উপরোক্ত নিয়ম ছিল। এতে দুটি ফায়দা ছিল। একটি ফায়দা এই ছিল যে, আগত লোকদের প্রয়োজন তাড়াতাড়ি পুরা হতো এবং তারা তাড়াতাড়ি অবসর হতো। দ্বিতীয় ফায়দা এই যে, এসব লোক অপেক্ষমান থাকা অবস্থায় নামাযে রত হলে নামাযের মধ্যে একাগ্রতার সাথে মন বসবে না। এজন্য তাদেরকে নামাযের আগেই মুক্ত করে দিলেন। যখন একা হলেন এবার আওয়াবিন আরম্ভ করলেন। মোটকথা, যে জিনিসে মন ব্যস্ত থাকে আগে তা থেকে অবসর হয়ে নিবে।

কোন্ জায়গায় বসে নামাযী ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করবে

দেখুন, এ আদবটিও মনে রাখা দরকার। বেশির ভাগ লোক এ ব্যাপারটিতে ত্রুটি করে। তা এই যে, একজন মানুষ নামায বা যিকিরে মগ্ন আছে। তার সাথে আপনার কোন কাজ রয়েছে। তখন বেশির ভাগ এ রকম হয়ে থাকে যে, যার কাজ রয়েছে, সে এমনভাবে এসে মাথার কাছে দাঁড়ায় বা তার পাশে এমনভাবে বসে, যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে, আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। তার ফল এই হয় যে, নামাযী ব্যক্তির মনোযোগ তার দিকে নিবদ্ধ হয়। এর ফলে নামাযের দিকে সঠিকভাবে মনোযোগ থাকে না। এজন্য এটি বড় ধরনের বেয়াদবী। এতে একদিকে নামাযের সঙ্গে বেয়াদবী হয়, অপর দিকে নামাযীকে কষ্ট দেয়া হয়। আদব এই যে, যার সঙ্গে আপনার কাজ রয়েছে। আর সে নামাযে রত রয়েছে। আপনি এত দূরে বসে তার অপেক্ষা করবেন, যেন সে বুঝতেই না পারে যে, কেউ আমার অপেক্ষায় আছে। তারপর ঐ ব্যক্তি সালাম ফিরানোর পর তার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আগে থেকে একদম কাছে গিয়ে বসা বেয়াদবী। মনে রাখবেন, এগুলো দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত আদব। দ্বীনের বাইরের জিনিস নয়। এগুলো মেনে চলাও এ পরিমাণ জরুরী, যেমন অন্যান্য ইবাদত নিয়মিতভাবে পুরা করা জরুরী।

আগে অন্য কাজ তারপর নামায

মোটকথা, যদি ক্ষুধার কারণে নামাযে মন না বসে, তাহলে আগে খানা খেয়ে নাও, তারপর নামায পড়। যদি পিপাসা লেগে থাকে, তাহলে আগে পানি পান কর, তারপর নামায পড়। যদি ঘুম আসতে থাকে, আর তুমি নফল নামায পড়তে চাও বা তুমি তেলাওয়াত করতে চাও, তখন হাদীস শরীফে এসেছে যে, আগে ঘুমিয়ে যাও, তারপর ঘুম থেকে অবসর হয়ে মনের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তখন নামায আরম্ভ কর।

ক্ষমতা বহির্ভূত পেরেশানীতে যিকির ছাড়বে না

কিন্তু কতক অবস্থায় নামাযের সময় মন এমন বিক্ষিপ্ত থাকে যে, তা প্রতিহত করা মানুষের ক্ষমতায় থাকে না। যেমন, মাথায় ব্যথা হচ্ছে। এই ব্যথার কারণে যিকিরে মন বসছে না বা এমন ধরনের অন্য কোন ক্ষমতা বহির্ভূত সমস্যা দেখা দিলো এ অবস্থায় মন বসার চিন্তা মোটেও করো না। কারণ, এমন সময় মন না বসলে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, যিকির প্রত্যক্ষভাবে উদ্দেশ্য। মন বসুক বা না বসুক, যিকিরকে উদ্দেশ্য মনে করে করতে থাক। ইনশাআল্লাহ ঐ যিকিরের বদৌলতে অবস্থার সংশোধন হয়ে যাবে।

মন ঘাবড়ে গেলে তাড়াতাড়ি যিকির শেষ কর

পরবর্তী মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) বলেন,

> 'যিকির ও তেলাওয়াতের মধ্যে মন খুব বেশি ঘাবড়াতে আরম্ভ করলে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিবে। এটি ওযর। ওযরের কারণে হুকুমের মধ্যে শিথিলতা এসে যায়।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৮)

অর্থাৎ, যিকির করার সময় মন খুব বেশি ঘাবড়ে গেলে যিকির তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা উচিত। তবে অল্প-বিস্তর ঘাবড়ালে তার পরোয়া করা উচিত না। তখন তো জোর করে যিকিরে রত থাকবে। তবে বেশি ঘাবড়ে গেলে যিকির ছেড়ে দিবে।

বিরক্তি আসার পূর্বে যিকির বন্ধ কর

এক হাদীস শরীফের বিষয়বস্তু এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার যিকির কর, যতক্ষণ পর্যন্ত বিরক্তি ও অনীহা সৃষ্টি না হয়। এর আগ পর্যন্ত যিকির করতে থাক। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলতেন, যে কোন ইবাদত কর, তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে

একদম শেষ করে দিও না। কিছু চাহিদা অবশিষ্ট থাকতে ইবাদত বন্ধ কর। বিষয়টিকে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাতেন। তিনি বলতেন যে, শিশুদের খেলার যে 'ইয়ো ইয়ো' রয়েছে, তার উপরে সুতা পেচানো থাকে। তা সামনে নিক্ষেপ করে, তারপর তাকে নিজের দিকে টানে, ফলে তা চলে আসে। 'ইয়ো ইয়ো'র নিয়ম হল, নিক্ষেপ করার সময় যদি উপরে পেচানো সমস্ত সুতা ছেড়ে দেয় তা আর ফিরে আসে না। এজন্য অল্প সুতা তাতে জড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই তাকে টানতে হয়। তখন সে ফিরে আসে। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) এ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, ইবাদতেরও একই অবস্থা। মনের মধ্যে ইবাদতের অল্প টান বাকি থাকতে ইবাদত করা ছেড়ে দাও। সব আবেগ-উদ্দীপনা একবারে শেষ করে ফেলো না। কারণ, একবারে সমস্ত আবেগ ঠাণ্ডা করে ফেললে, তখন মন পুনরায় ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট হবে না। এজন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে, 'বিরক্তি আসার আগে আগেই ইবাদত ছেড়ে দাও। তাহলে আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাওফীক দান করবেন। মনের মধ্যে প্রফুল্লতা আসলে পুনরায় আরম্ভ কর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পঁয়তাল্লিশতম মজলিস

মনের চাহিদার পরিবর্তে হুকুম মানার নাম দ্বীন

মনের চাহিদার পরিবর্তে হুকুম মানার নাম দ্বীন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

আযানের সময় যিকির বন্ধ করে দেয়া উচিত

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'যিকির করার সময় যদি আযান হতে আরম্ভ করে, তাহলে যিকির বন্ধ করে (আযানের) উত্তর দেওয়াই বেশি মুনাসিব। এটাকে যিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মনে করবে না। সুন্নাতের বরকতে যিকিরের উৎস নূরান্বিত হয়। এর দ্বারা যিকিরের মধ্যে অধিক সহযোগিতা লাভ হয়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৮)

অর্থাৎ, কেউ যিকির বা তেলাওয়াতে রত হলে আর এ সময় আযান হতে আরম্ভ করলে, তখন যিকির ও তেলাওয়াতকে বন্ধ করে আযানের উত্তর দেয়া উচিত এবং আযানের উত্তরকে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী মনে করা উচিত নয়। এমন মনে করবে না যে, আযানের জবাবের কারণে আমার যিকির বন্ধ হয়ে গেল। কারণ এই যে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতের জন্য আপনি যিকির বন্ধ করেছেন, এর ফলে যিকিরের খনি এর দ্বারাই নূরান্বিত হবে। এজন্য আযানের উত্তর যিকিরের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নয়, বরং যিকিরের মধ্যে সহযোগিতাকারী এবং যিকিরকে অধিক নূরান্বিতকারী। কারণ, যখন আযানের উত্তরের কারণে যিকির বন্ধ হল, তখন ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নূর যিকিরকে আরো আলোকিত করবে।

সময়ের দাবি অনুপাতে আমল করার নাম দ্বীন

এর দ্বারা আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর সে কথাটিই সামনে আসে যে, 'দেখ! সময়ের দাবি অনুপাতে আমল করার নাম দ্বীন। যে সময় যে কাজের দাবি রাখে, ঐ সময় ঐ কাজ করবে। এরই নাম দ্বীন। নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করবে না যে, আমি অমুক কাজ করব। এখন একটি কাজ করার চিন্তা করছে এর মাঝখানে যদি অন্য কাজ করার চাহিদা সৃষ্টি হয়, তখন মন ব্যথিত হয় এবং দুঃখিত হয় যে, আমি যে কাজ করতে চেয়েছিলাম তা হল না।

এ কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমাদের মত লোক, যারা তালিবে ইলম হওয়ার দাবি করি এবং লেখাপড়ার মধ্যে মগ্ন থাকি, তাদের জন্য বিশেষভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

কিতাব লেখার সময় সাক্ষাত করতে এলে কষ্ট লাগা

আমার অনেক ব্যস্ততা ও কাজ রয়েছে। এজন্য একটি সময়সূচি বানিয়ে নিয়েছি। অমুক সময় এই কাজ করব, অমুক সময় এই কাজ করব। কিতাব লেখার জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। এ দুই ঘণ্টা সময় কুতুবখানায় বসে কিতাব লেখার কাজ করব। কিতাব লেখার এই সময়ে কেউ সাক্ষাত করতে এলে মনের মধ্যে বড় কষ্ট হত যে, এই লোক আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এসেছে, বা অন্য কোন প্রয়োজন তখন সামনে এলে মনের মধ্যে খুব কষ্ট ও চাপ অনুভব হত।

কিতাব লেখার কাজ কার জন্য করছ?

আমি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)কে বিষয়টি অবগত করি যে, আমার সঙ্গে এমন হচ্ছে। হযরত এমন কথা বললেন যে, আলহামদু লিল্লাহ। সেই দিন আর আজকের দিনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। হযরতের কথার কারণে আল্লাহ তাআলা অন্তরে প্রশান্তি দান করেন। হযরত বলেন যে, তোমার এই কষ্ট এজন্য হয় যে, তুমি নিজের থেকে এটা নির্ধারণ করেছ যে, আমি অমুক সময় অমুক কাজে অবশ্যই ব্যয় করব। তাই ঐ সময় যদি ঐ কাজ কর তাহলে সফলতা আর তা না হলে ব্যর্থতা। আরে ভাই! তুমি এ কথা বল যে, কিতাব লেখার যে কাজ তুমি করছ, তা আল্লাহ তাআলার জন্য করছ, নাকি তার মাধ্যমে লেখক হওয়ার এবং নিজের লেখাকে পরিপূর্ণ করার শখ করছ? যদি তুমি লেখক হওয়ার জন্য এবং নিজের লেখাকে পরিপূর্ণ করার স্বার্থে এ কাজ করছ, তাহলে তোমার এ কষ্ট, ব্যথা ও দুঃখ পুরোপুরি ঠিক আছে। কারণ, অন্যের প্রতিবন্ধকতার কারণে তোমার লেখা পূর্ণ হলো না। আর যদি এ কিতাব লেখার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাকে খুশি করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি লেখার কাজে খুশি, ততক্ষণ পর্যন্ত লিখতে থাক, আর যখন কোন মেহমান সাক্ষাত করতে আসে, তখন তো আল্লাহ তাআলা এতে খুশি যে, তুমি মেহমানকে সম্মান কর। কারণ, মেহমানকে সম্মান করা সুন্নাত। বা লেখার সময়ে অন্য কোন কাজ দেখা দিল যেমন, মা-বাবার খেদমতের কোন প্রয়োজন হলো, বা বউ-বাচ্চার খেদমতের কোন প্রয়োজন হল, বা ছাত্রদের কোন খেদমতের প্রয়োজন হল, বা কোন মুরব্বী তোমাকে তখন ডেকে পাঠালেন, তখন এই লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে ঐ কাজ করাই সময়ের দাবি। এর মধ্যেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি রয়েছে। তাই এতে তোমার কি ক্ষতি? যে কাজ তুমি আগে করছিলে, তাতেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হচ্ছিল। এখন সেই কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করছ, তাও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মোতাবেক করছ। উদ্দেশ্য

হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। তা ঐ কাজের মাধ্যমে লাভ হোক বা এই কাজের মাধ্যমে লাভ হোক। হযরত একথা বলার পর আলহামদু লিল্লাহ মন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

ঐটাও আল্লাহর জন্য এটাও আল্লাহর জন্য

মানুষ তো মানুষই। যখন সে একটি সময়সূচি তৈরি করে, আর তার মধ্যে বিঘ্ন ঘটে, তার কারণে কখনো কষ্ট হয়, তবে এই কষ্ট সহজাত, যৌক্তিক নয়। যৌক্তিকভাবেতো মন প্রশান্ত থাকে যে, আলহামদু লিল্লাহ ঐ কাজও আল্লাহর জন্য করছিলাম এবং এই কাজও আল্লাহর জন্য করছি। এজন্য যে সময় যে কাজ করার তাওফীক আল্লাহ দেন, তা তাঁর বিষয়। মোটকথা, এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সময় শরীয়তের দাবি কি?

নিজের শখ পুরা করার নাম দ্বীন নয়

আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা মাসিহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.) এমন ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর অন্তরে আল্লাহ তাআলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা ঢেলে দিতেন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই বলতেন যে, ভাই নিজের শখ পুরা করার নাম দ্বীন নয়। দ্বীনতো হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মানার নাম। এমন যেন না হয় যে, আমার অমুক কাজ করার আগ্রহ হয়েছে, তাই এখন তো আমি ঐ কাজই করব। যেমন আলেম হওয়ার শখ হয়েছে, তুমি মাদরাসায় গিয়ে আলেম হতে চাও। কিন্তু তোমার জন্য আলেম হওয়া জায়েয আছে, না নাই তা দেখলে না। বা যেমন ঘরে মা অসুস্থ হয়েছে, বা বাপ অসুস্থ হয়ে আছে, দেখাশুনা করার মত অন্য কেউ নেই, এখন মা-বাপকে অসুস্থ রেখে তুমি মাদরাসায় চলে আসলে এটা দ্বীন নয়। এটা নিজের শখ পুরা করা। দ্বীনের কাজ হল, এমন সময় পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে মা-বাবার খেদমত কর।

মুফতী হওয়ার শখ

যেমন, মুফতী হওয়ার শখ জেগেছে। আমার কাছে অনেক ছাত্র আসে এবং বলে যে, আমার 'তাখাসসুস' পড়ার শখ। আমি ফতোয়া শিখতে চাই। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে, মা-বাবার মত কি? উত্তর দেয়– মা-বাপ তো আমাকে 'তাখাসসুস' পড়াতে রাজী নয়। এখন লক্ষ্য করুন, মা-বাপ তো রাজী নয় কিন্তু সে মুফতী সাহেব হতে চায়। এটা দ্বীন নয়, এটা নিজের শখ পুরা করা।

তাবলীগ করার শখ

যেমন, তাবলীগের সফরে বের হওয়ার শখ হয়েছে। তাবলীগ করাতো বড় সওয়াব ও ফযীলতের কাজ, কিন্তু এখন ঘরে বিবি অসুস্থ হয়ে আছে। তাকে

দেখাশোনা করার জন্য অন্য কোন মাহ্‌রাম আত্মীয় নেই। এমতাবস্থায় তাবলীগের জন্য বের হওয়া এবং চিল্লা লাগানো দ্বীন নয়। এটা নিজের শখ পুরা করা। কারণ, এ সময় দ্বীনের এবং সময়ের দাবি হলো– ঐ অসুস্থের সেবা-শুশ্রূষা কর। তার প্রতি যত্ন নাও। এটা দুনিয়া নয়, এটাও দ্বীনের দাবি।

এমন সময় নামাযের জামাত ছেড়ে দাও

হযরত মাওলানা মাসিহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.) এর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিতেন যে, এক ব্যক্তি নির্জন জঙ্গলে অবস্থান করছে। আশে-পাশে কোন জনবসতি নেই। স্বামী-স্ত্রী নির্জন এলাকায় অবস্থান করছে। এখন স্বামীর মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়ার শখ হল। বিবি তাকে বলছে যে, এটা জঙ্গল-নির্জন জায়গা। তুমি যদি নামায পড়ার জন্য দূরে জনবসতি এলাকায় চলে যাও, তখন তো আমি একা থেকে যাব। আমার তো এখানে একা জঙ্গলের মধ্যে ভয় হচ্ছে। ভয়ে জান যাওয়ার অবস্থা। এজন্য আজ তুমি এখানেই নামায পড়। কিন্তু স্বামী যেহেতু জামাতে নামায পড়ার প্রতি খুব আগ্রহী ছিল, তাই সে বিবিকে একা রেখে মসজিদে চলে গেল। হযরত বলেন, এটি দ্বীনের উপর আমল নয়, এটি তো নিজের শখ পুরা করা। কারণ, এ সময়ের দাবি এই ছিল যে, সে এ জায়গাতেই নামায পড়বে এবং বিবির কষ্ট দূর করবে। এটা তখন, যখন নির্জন এলাকায় কোন জনবসতি নেই। দেখাশোনা করার মতও অন্য কোন লোক নেই। কিন্তু যেখানে জনবসতি রয়েছে, সেখানে যদি এ অবস্থা হয়, তখন তো নামায পড়ার জন্য মসজিদেই যাওয়া উচিত।

মোটকথা, কারো জিহাদ করার শখ, কারো তাবলীগ করার শখ, কারো মৌলভী হওয়ার শখ, আর এই শখের ফলে অন্যান্যদের যে হক নিজের দায়িত্বে রয়েছে, সেগুলো আদায় করার প্রতি লক্ষ্য নেই যে, এই সময়ে ঐ সমস্ত হকের দাবি কী?

হযরত ওয়ায়েস করণী (রহ.)

হযরত ওয়ায়েস করণী (রহ.)কে দেখুন! দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন ছাড়া সাহাবী হওয়ার মর্যাদা কারো লাভই হতে পারে না। সাহাবী হওয়ার এই মর্যাদা তাঁকে লাভ করতে দেওয়া হয়নি। কেন দেওয়া হয়নি? মায়ের খেদমতের জন্য দেওয়া হয়নি। এর ফল এই হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমর (রা.)কে নসীহত করছেন

যে, ওয়ায়েস করণী নামে এক বুযুর্গ আছেন। তিনি করণ থেকে তাশরীফ আনবেন। তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাত হলে তাঁর দ্বারা নিজের জন্য মাগফিরাতের দুআ করাবে।

এমন ক্ষেত্রে শায়খের প্রয়োজন পড়ে

আল্লাহ্, আল্লাহর রাসূলের হুকুম মানার দ্বারা এবং সময়ের দাবির উপর আমল করার দ্বারা এ মর্যাদা লাভ হয়। এটা এমন নয় যে, মনের মধ্যে কোন আমলের শখ পয়দা হলো, আর সেই আমল আরম্ভ করে দিল। এর জন্য একজন পথ-প্রদর্শক ও শায়খের প্রয়োজন হয়। এই যে বলা হয় যে, কোন শায়খের সাথে তায়াল্লুক কায়েম কর, এটা মূলত: এজন্যই। এমন সময় সে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। অন্যথায় মানুষ সীমা লংঘনে লিপ্ত হয়ে যায়।

আমি এসব কাজের বিরোধী নই

আমি যেসব কথা বলছি, কেউ আমার দিকে এসব কথাকে সম্পৃক্ত করে অন্যের কাছে এভাবে বলবে যে, অমুকতো বলছিল, মুফতী হওয়া খারাপ কাজ। সেতো তাবলীগ বিরোধী। সে তাবলীগের বিরুদ্ধে কথা বলছিল যে, তাবলীগে চিল্লা লাগাতে যাওয়া ঠিক না। সেতো বলছিল যে, জিহাদে যাওয়া ঠিক না। অথচ আসল কথা হল, এসবই যথাসময়ে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির কাজ। এটা দেখ যে, কোন সময়ের দাবি কোনটা। এখন কোনটা চাওয়া হচ্ছে, সেই চাহিদা মোতাবেক আমল কর। সেই দাবি মোতাবেক আমল কর। এমন যেন না হয় যে, নিজের বুঝ মতো একটি পন্থা অবলম্বন করে নিলে যে, আমাকে তো এটি করতে হবে। তারপর সে অনুপাতে চলতে থাকলে, এটা দ্বীন নয়। দ্বীন তো হলো, সব সময় দেখতে হবে যে, আল্লাহ্ কি বলছেন। আল্লাহ্ কোনটার হুকুম করছেন।

প্রেমাস্পদের চাহিদার সাজইতো প্রকৃত সাজ

এজন্য আসল জিনিস দেখার বিষয় এই যে, আমার এই কাজে তিনি খুশি কিনা। আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) হিন্দী ভাষার একটি প্রবাদ বলতেন যে,

سہاگن وہ جسے پیا چاہے

'প্রেমাস্পদের চাহিদার সাজই তো প্রকৃত সাজ।'

এই প্রবাদের পিছনে একটি ঘটনা রয়েছে। তা এই যে, এক মেয়েকে বধূরূপে সাজানো হচ্ছিল। মেকআপ করার পর যেই তাকে দেখে সেই প্রশংসা

করছে যে, খুব সুন্দর লাগছে। তোমার চেহারা এত সুন্দর। তোমার শরীর এত সুন্দর! তোমার কাপড়-অলংকার এত সুন্দর! কিন্তু ঐ মেয়ে সবার প্রশংসা শুনে কোন প্রকার আনন্দ প্রকাশ করছে না। শুনেও না শুনার ভান করছে। একজন ঐ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোর সাথীরা তোর এত প্রশংসা করছে, এতে কি তোর খুশি লাগছে না? তখন ঐ মেয়ে উত্তর দেয় যে, এদের প্রশংসায় কী খুশি হব? এদের প্রশংসাতো বাতাসে মিলে যাবে। তখন না কথা হবে, যখন যার জন্য সাজানো হচ্ছে সে প্রশংসা করবে। সে যদি পসন্দ করে বলে যে, হ্যাঁ খুব সুন্দর হয়েছে, তখন না লাভ। তার ফলে না আমার জীবন সজ্জিত হবে। কিন্তু এ সখীরা আমার প্রশংসা করে চলে যাওয়ার পর যার জন্য আমাকে সাজানো হয়েছে, সে যদি আমাকে অপসন্দ করে, তাহলে এ বধু-সাজের কী লাভ?

ঐ সত্তার পসন্দ দেখ

এ ঘটনা শুনিয়ে হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) বলতেন যে, এটা দেখ যে, যার জন্য কাজ করছ, তার পসন্দ কি না? মানুষে যদি বলে যে, আপনি অনেক বড় মুফতী, আপনি বড় মাওলানা সাহেব! বা মানুষে বলল যে, ইনি বড় মুবাল্লিগ, তাবলীগে অনেক সময় লাগায়, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে। বা কারো সম্পর্কে বলল যে, ইনি অনেক বড় মুজাহিদ! বলুন, মানুষের এসব কথায় কী কাজ হল? লাভ তো তখন হবে, যখন যার জন্য কাজ করা হচ্ছে তিনি বলবেন যে, এই বান্দা আমার জন্য কাজ করছে। আমি তার উপর খুশি হয়েছি, তখনই না লাভ হবে। কারণ, এসব কাজ দ্বারা তাঁকেই তো খুশি করা উদ্দেশ্য।

যিকির বন্ধ করে আযানের জবাব দাও

যখন তাঁকে খুশি করা উদ্দেশ্য, তখন মানুষের দেখা উচিত যে, এখন আল্লাহ তাআলা আমার কাছে কি চাচ্ছেন। এজন্য বলা হচ্ছে যে, যখন আযান হচ্ছে তখন যিকির বন্ধ করে মুয়াযযিনের আযান শোন এবং তার জবাব দাও। এখন যদি আপনি একথা চিন্তা করেন যে, এখন তো সময় নষ্ট হচ্ছে। এ সময় যদি আমি যিকির করতাম তাহলে কয়েকশ' বার আল্লাহর নাম নিতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ্ যখন হুকুম দিচ্ছেন যে, এখন যিকির বন্ধ কর, তখন বন্ধ করা উচিত। তখন যিকির বন্ধ করার মধ্যেই ফায়দা।

আমার হুকুমের মধ্যেই সবকিছু রয়েছে

হজ্জকে আল্লাহ বড় বিস্ময়কর ইবাদত বানিয়েছেন। হজ্জের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে পদে পদে আল্লাহ তাআলা নিয়মের

প্রতীমা ভেঙ্গেছেন। যেমন মসজিদে হারামের মধ্যে এক নামাযের সওয়াব এক লক্ষ নামাযের সমান। কিন্তু আটই জিলহজ্জ হুকুম করা হচ্ছে যে, মসজিদে হারামকে ছেড়ে মিনায় চলে যাও। সেখানে একদিন অবস্থান কর। অথচ মিনাতে হারাম নাই, কাবা নাই, উকূফ নাই, রমী নাই, অন্য কোন কাজও নাই; তারপরও হুকুম করা হচ্ছে যে, সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়। এক লক্ষ নামাযের সওয়াব ছেড়ে সেখানকার ময়দানে গিয়ে নামায পড়। এই হুকুমের মাধ্যমে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, মৌলিকভাবে না কাবার মধ্যে কিছু আছে, না হারামের মধ্যে কিছু আছে, না মসজিদে হারামের মধ্যে কিছু আছে। যা কিছু আছে সব আমার হুকুমের মধ্যে আছে। যখন আমি মসজিদে হারামের মধ্যে নামায পড়তে বলি, তখন এক নামাযে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব। আর যখন আমি মসজিদে হারামের নামাযকে ছাড়তে বলি, তখন সেখানে নামায পড়লে সওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। কারণ, তুমি আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করেছ।

আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর আনুগত্য

যথাসময়ে নামায পড়ার কত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে! কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

‘নিশ্চয়ই নামায ঈমানদারদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।’

এই আয়াতের মধ্যে নামাযকে সময়ের সাথে নির্ধারণ করা হয়েছে। নামাযের সময় যেন পার হয়ে না যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, ‘মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নাও। এই নামাযে বিলম্ব করো না।’ কিন্তু আরাফার ময়দানে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, অথচ হুকুম দেয়া হচ্ছে এখনই নামায পড়ো না। হযরত বেলাল (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন–

اَلصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায।’

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন–

اَلصَّلَاةُ اَمَامَكَ

‘নামায সামনে রয়েছে।’

অর্থাৎ, নামায এখানে পড়া যাবে না। বরং মুযদালিফার ময়দানে নামায পড়তে হবে। এর মাধ্যমে এ শিক্ষায়ই দেয়া হল যে, তোমরা মনে করো না যে, মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যে কিছু আছে বা ওয়াক্ত মত নামায পড়ার তাগিদ দেয়ার মধ্যে কিছু আছে। বরং যা কিছু আছে তা তো আমার হুকুমের মধ্যে আছে। যখন আমি মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়তে বলেছিলাম, তখন তাড়াতাড়ি পড়া জরুরী ছিল। আর যখন মাগরিবের নামাযের সময় পার করে ইশার নামাযের সঙ্গে মিলিয়ে তা পড়তে বলছি, এখন এভাবে পড়াই তোমার জন্য ফরয। আল্লাহ তাআলা হজ্জের ইবাদতের মধ্যে পদে পদে নিয়ম ভেঙ্গে দিয়েছেন। যেন বাহ্যিক শর্তকে দেবতা বানানো না হয়। এর মাধ্যমে এ কথারই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন জিনিসকে মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য মনে করো না। নামাযও মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য নয়, রোযাও মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য নয়। অন্য কোন ইবাদতও মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানা।

ইফতার তাড়াতাড়ি করতে হয় কেন

দেখুন, শরীয়তের একটি হুকুম হলো, রোযার ইফতারের সময় হলে তাড়াতাড়ি ইফতার কর। বিনা কারণে বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ। এটা এ কারণে মাকরূহ যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি পানাহার করতে নিষেধ করেছিলাম, ফলে এতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকা সওয়াবের কারণ ছিল। পিপাসার্ত থাকা সওয়াবের কারণ ছিল। এর অনেক ফযীলত ছিল, এর অনেক প্রতিদান ছিল। এমনকি বলা হচ্ছিল যে, 'এ রোযা আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দিব।' কিন্তু আমি যখন বলছি যে, 'খাও'। তখন খেতে বিলম্ব করা গোনাহ। কারণ, এখন বিলম্ব করলে নিজের পক্ষ থেকে রোযার সময় বাড়ানো হবে।

সাহরীতে বিলম্ব উত্তম কেন

এমনিভাবে সাহরী খেতে বিলম্ব করা উত্তম। যদি কেউ সাহরীর সময় হওয়ার পূর্বেই সাহরী খেয়ে ঘুমিয়ে যায়, তাহলে তা সুন্নাতের পরিপন্থী হবে। শেষ সময় সাহরী খেতে হবে। এজন্য আগেই সাহরী খেয়ে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন রোযার সময় নিজের থেকে বাড়িয়ে নিল। মোটকথা, আমাদের অন্তরে একথা বসে যেতে হবে যে, দ্বীনের পুরোটাই হল হুকুম মানার মধ্যে। আল্লাহর হুকুম মানতে হবে। আরে! তুমি তো তাঁর বান্দা। বান্দার অর্থই হল, তিনি যা বলবেন তা-ই করতে হবে।

'চাকর' ও 'গোলামের' সংজ্ঞা

হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান অমৃতসরী (রহ.) বলতেন, এক হল 'চাকর'। তার নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ডিউটি থাকে। যেমন, চাকরের ডিউটি থাকে ঝাড়ু দেয়া। কোন কোন চাকরের আট ঘণ্টা ডিউটি থাকে। আট ঘণ্টা পর তার ছুটি। আরেক থাকে 'গোলাম'। তার নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট কাজ থাকে না। সে হুকুমের অধীন। মনিব যা হুকুম দিবে তা-ই তাকে করতে হবে। মনিব যদি বলে, তুমি এখানে বিচারপতি হয়ে বস এবং বিচার কাজ কর, তখন সে বিচারপতি হয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, পায়খানা বহন করো তাহলে সে পায়খানা বহন করবে। না তার বিধিবদ্ধ কোন সময় আছে, না বিধিবদ্ধ কোন কাজ আছে। সে তো চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম। এটা হলো গোলামের সংজ্ঞা।

বান্দার সংজ্ঞা

গোলামের চেয়েও উপরে একটি স্তর রয়েছে, তা হলো বান্দা। গোলাম তার মনিবের পূজা করে না, কিন্তু বান্দা তার মনিবের ইবাদত করে তার পূজা করে। বান্দার নিজস্ব কোন মর্জি থাকে না। বান্দাতো মনিবের মর্জি মোতাবেক চলে। মনিব তাকে যে হুকুম দেয়, তাকে তা-ই করতে হয়। সে নিজের থেকে কোন কাজ করে না। সমস্ত বিদআতের মূলও এর দ্বারাই কেটে যায়। কারণ, নিজের মতামত প্রয়োগ করার দ্বারাই বিদআত সৃষ্টি হয়। নিজের সিদ্ধান্তকে খতম করে দাও এবং তাঁর মর্জি ও হুকুম মত চল। এরই নাম 'দ্বীন'।

সারকথা

মোটকথা, সময়ের চাহিদাকে দেখ, এ সময়ের চাহিদা কি? এখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে কি চাচ্ছেন, তা-ই কর। এজন্যই হযরত থানবী (রহ.) এ মালফূযে বলছেন যে, 'আযানের জওয়াব দেয়া যিকিরের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নয়।' বরং এ সময়ের চাহিদাই এটা যে, যিকির বন্ধ করে আযানের জওয়াব দাও। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ছেচল্লিশতম মজলিস

দরস ও তাদরীসের সঙ্গে আমলের ইসলাহ

দরস ও তাদরীসের সঙ্গে আমলের ইসলাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

অধিক যিকির এবং আমলের ইসলাহ

আধ্যাত্মিকতার পথের মূল জিনিস

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'আধ্যাত্মিকতার পথে দু'টি জিনিস রয়েছে। একটি হল, অধিকহারে যিকির করা। দ্বিতীয়টি হল, আমলের ইসলাহ তথা সংশোধন করা। তালিবে ইলম অবস্থায় অধিকহারে যিকির করা তো মুনাসিব নয় এবং অধিকহারে যিকির করার যে উদ্দেশ্য তা তাদের ইলমী ব্যস্ততার দ্বারা লাভ হয়ে যায়। তবে এর জন্য তাকওয়া শর্ত। বাকি রইল আমলের ইসলাহ। তা সর্বাবস্থায় ফরয। তালিবে ইলম অবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই এ ধারা আরম্ভ করা উচিত। এর পদ্ধতি এই যে, প্রথমে 'কসদুস সাবীল' কিতাবটি মনোযোগ সহকারে দু'বার অধ্যয়ন করে আধ্যাত্মিকতার যে সারকথা বুঝে আসবে, তা (শায়খকে) অবগত করাবে। তারপর ইসলাহের তরীকা জিজ্ঞাসা করবে।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৯)

কোন শায়খের সাথে সম্পর্ক করার উদ্দেশ্য

কোন আল্লাহওয়ালা এবং কোন শায়খের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য হয় দু'টি জিনিস অর্জন করা। এক অধিক যিকির করার অভ্যাস লাভ করা। যাতে সর্বদা মন-মস্তিষ্কে আল্লাহর ধ্যান থাকে এবং সব সময় মুখে আল্লাহ তাআলার যিকির থাকে। প্রথম জিনিস হল অধিক যিকিরের নিয়ামত লাভ করা। দ্বিতীয় জিনিস হল, ইসলাহে আমল। অর্থাৎ, আমলের সংশোধন করা। যাতে গোনাহ থেকে হেফাযতে থাকতে পারে। নাফরমানী ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে।

ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাবসমূহের উপর আমল করতে পারে। আমলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আমল করার তাওফীক হয়। মোটকথা, কোন শায়খের কাছে যাওয়ার দ্বারা এই দু'টি জিনিস অর্জন করা মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

তালিবে ইলম অবস্থায় অধিক যিকির মুনাসিব নয়

কিন্তু যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের কাজে ব্যস্ত, সে যদি কোন শায়খের সাথে সংশোধনের জন্য সম্পর্ক গড়ে, তাহলে সেও কি এই দু'টি জিনিস অর্জনের চিন্তায় মশগুল হবে? এ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, 'অধিক যিকির তো তালিবে ইলম অবস্থায় মুনাসিব নয়।' অর্থাৎ, কোন তালিবে ইলম দরস, মুতালাআ ও তাকরারের পরিবর্তে অযীফা পড়ছে, এই অযীফা পড়া তার জন্য মুনাসিব নয়। তার তো উচিত সবক, মুতালাআ ও তাকরারের প্রতি মনোযোগী থাকা। এগুলোর মধ্যে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে।

ইলমী কাজে ব্যস্ত থাকায় অধিক যিকিরের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়

তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যখন সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ যিকির করবে না, তখন অধিক যিকিরের যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হতে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে হযরত বলেন যে, সে যিকিরের ফায়দা থেকে মাহরূম হবে, এমনটি নয়; বরং অধিক যিকিরের যে উদ্দেশ্য রয়েছে, তা তার ইলমী ব্যস্ততার দ্বারাই লাভ হয়। তবে এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক হলো, তাকওয়া অর্থাৎ, তার মধ্যে গোনাহ থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্ব থাকতে হবে। চোখের হেফাযত, কানের হেফাযত ও যবানের হেফাযতের ইহতিমাম থাকতে হবে। দ্বিতীয় হল, ইখলাস থাকতে হবে। তার এ নিয়ত থাকতে হবে যে, আমি যেই ইলম অর্জন করছি, তা শুধুই আল্লাহর জন্য অর্জন করছি। আমি যে পড়াচ্ছি, তা কেবল আল্লাহ তাআলার জন্য পড়াচ্ছি। এমতাবস্থায় এই দরস ও তাদরীস এবং এই পঠন-পাঠন অধিক যিকিরের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তার মাধ্যমে অধিক যিকিরের উদ্দেশ্য লাভ হবে।

তালিবে ইলমের অবশ্যই কিছু যিকির করা উচিত

কিন্তু তালিবে ইলমের একথা বুঝা উচিত নয় যে, এখন যিকির করার জরুরত নেই। কারণ, এখানে অধিক যিকিরের কথা বলা হচ্ছে, শুধু যিকিরের কথা বলা হচ্ছে না। অর্থাৎ, এই দরস ও তাদরীস এবং এই মুতালাআ ইনশাআল্লাহ অধিক যিকিরের স্থলাভিষিক্ত হবে, তবে কিছু যিকির তারপরও করতে হবে। কারণ, সব জায়গা ও সব অবস্থার একটি দাবি থাকে। এজন্য এরূপ মনে করা ঠিক হবে না

যে, আমরা যেহেতু দরস ও তাদরীসে ব্যস্ত আছি, এজন্য আমাদের যিকির ও নফলের প্রয়োজন নেই। হাদীস শরীফে আছে–

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اِحْيَاءِ هَا

অর্থাৎ, 'রাতের একটি অংশে ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং ইলমের তাকরারের কাটানো, সারা রাত জাগ্রত থাকার চেয়ে উত্তম।'

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়ছে, তার তুলনায় রাতের একটি অংশে ইলমী কাজ করা অধিক উত্তম। তবে শর্ত হল, তার মধ্যে ইখলাস থাকতে হবে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সারা জীবন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে না, শুধু বসে বসে তাকরার করবে। এটাই যদি অর্থ হত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কেউই নফল ইবাদতের ইহতিমাম করতেন না। অথচ এঁরা নফল ইবাদতের খুব ইহতিমাম করতেন।

ইলমকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণকারীদের অবস্থা

মূলত: এখানে দু'টি শ্রেণীর কথা বলা উদ্দেশ্য। এক শ্রেণী তো তারা, যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিল ইলমকে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী তারা, যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল ইবাদতকে। কিন্তু যারা ইলমকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিল, তারা নফল ইবাদত থেকে সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ও অমুখাপেক্ষী ছিল, তা নয়। বরং নিজেদের অবস্থা মত তারাও কম-বেশি নফল ইবাদত করত। তারাও যিকির করত। তারাও নফল নামায পড়ত। তারাও তাহাজ্জুদ নামায পড়ত, তবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু এই এক কাজেই ব্যস্ত থাকত না।

কোন্ আলেমের আবেদের উপর ফযীলত রয়েছে

কিন্তু বর্তমান যুগের আলেমদের এই হাদীস তো খুব মুখস্ত থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَاكُمْ

অর্থঃ আবেদের উপর আলেমের এমন ফযীলত রয়েছে, যেমন তোমাদের সাধারণ ব্যক্তিদের উপর আমার ফযীলত রয়েছে।

অন্য হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন–

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

অর্থঃ একজন ফকীহ্ শয়তানের জন্য হাজার আবেদের চেয়ে অধিক কঠিন এবং ভারী।

এ জাতীয় হাদীস আমাদের মত মানুষের খুব মুখস্ত থাকে। খুব ভাল করে বুঝে নিন, এ সমস্ত হাদীসের মধ্যে 'আলেম' শব্দ দ্বারা সেই আলেম উদ্দেশ্য, যে ইলমের ব্যস্ততার সাথে সাথে নফল ইবাদতও কিছু না কিছু করে এবং আবেদ দ্বারা সে আবেদ উদ্দেশ্য, যে ইবাদতে ব্যস্ত থাকার সঙ্গে সঙ্গে ইলমের সঙ্গেও কিছু ব্যস্ততা রাখে।

হাদীসের মধ্যে 'আলেম' ও 'আবেদ' দ্বারা কারা উদ্দেশ্য?

এ বিষয়টি আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর মুকাদ্দামার মধ্যে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন। অথচ ইবনে খালদুন (রহ.) আবেদ হিসাবে প্রসিদ্ধ নন। তিনি একজন সাধারণ ঐতিহাসিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি লিখেন, এ হাদীসে 'আলেম' দ্বারা ঐ 'আলেম' উদ্দেশ্য, যে 'ইলম'কে তার রাত-দিনের কাজ বানিয়েছে, কিন্তু সে ইবাদত থেকে শূন্য নয়। আর 'আবেদ' দ্বারা ঐ 'আবেদ' উদ্দেশ্য, যে ইবাদতকে তার রাত-দিনের কাজ বানিয়েছে, কিন্তু ইলম থেকে সে রিক্ত নয়। কারণ, যেই আবেদের কিছুমাত্র ইলম নেই, তার ইবাদত বেকার। একইভাবে এমন আলেমের ইলমও বেকার, ইবাদতের মধ্যে যার কোন অংশ নেই।

আমল ও ইবাদত ছাড়া ইলম বেকার

এমনিভাবে ইবনে খালদুন (রহ.) একথাও বলেছেন যে, কোন আলেম যদি এমন থাকে যে, নীরেট ইলম নিয়ে ব্যস্ত, ইবাদতের দিকে তার কোন মন নেই। আমল ও আখলাক সংশোধনের কোন চিন্তা নেই। অপরদিকে এমন 'আবেদ', যে শুধু ইবাদতে ব্যস্ত, ইলমের প্রতি তার কোন ধ্যান নেই। এতদুভয় ব্যক্তিকে তুলনা করা হলে, তাদের দু'জনের মধ্যে আবেদ আলেমের চেয়ে উত্তম। এজন্য হাদীসের মধ্যে যে আবেদ ও আলেমের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা ঐ আবেদ এবং আলেম উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে উভয়টার সমন্বয় ঘটেছে। অন্যথায় শুধু ইলম তো শয়তানেরও ছিল। সেও অনেক বড় আলেম ছিল। এজন্য কোন ব্যক্তি যদি শুধু ইলম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, ইবাদতেও তার কোন অংশ নেই এবং গোনাহ থেকে বাঁচারও তার কোন ফিকির নেই এবং নাফরমানী থেকে পরহেয করার কোন ইহতিমাম নেই, বরং নিজের খাহেশাতের পিছনে ছুটছে, তাহলে এমন ইলম কোন্ কাজের, যা তাকে গোনাহ থেকে বাচায় না? এমন ব্যক্তির জন্য কুরআন কারীমের আয়াত রয়েছে যে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

অর্থঃ তাদেরকে ঐ ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শোনান, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। তারপর সে ঐ আয়াতসমূহকে ছেড়ে দেয়। তখন শয়তান তার পিছু নেয়। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

অতএব যে আলেমের কথা এ আয়াতে বলা হচ্ছে, সে আবেদ থেকে কি করে উত্তম হতে পারে। বরং এমন আলেম থেকে তো আবেদই উত্তম। যাইহোক, হযরত থানবী (রহ.) যে বললেন, অধিক যিকির দ্বারা যা উদ্দেশ্য, ইলমী ব্যস্ততার মাধ্যমে তাদের তা লাভ হয়ে থাকে। এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি ইলমের পঠন-পাঠনে ব্যস্ত, সে অল্প-বিস্তর যিকিরতো করবে। কিন্তু তার এ মুতালাআ, তাকরার, দরস ও তাদরীস, কিতাব লেখা ও ফতোয়া লেখা আবেদের অধিক যিকিরের স্থলাভিষিক্ত হবে।

অল্প দ্বারাই আপনার উদ্দেশ্য হাসিল আছে

আমার ওয়ালিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহ.) একবার হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে চিঠিতে লেখেন যে, 'হযরত দিন-রাত কাগজ কালো করতেই সময় চলে যায়। আপনার খানকায় দেখি যে, মানুষ সেখানে এসে কত যিকির- আযকারে মগ্ন থাকে। মুজাহাদা ও সাধনা করে। আমার দ্বারা এসব হয়নি। আমি এসব থেকে বঞ্চিত। অল্প কিছু অযীফা আছে, শুধু তা-ই আদায় করি।'

উত্তরে হযরত থানবী (রহ.) লিখেন যে, 'অধিক দ্বারা তাদের যে উদ্দেশ্য হাসিল আছে, আলহামদুলিল্লাহ্ অল্প দ্বারা আপনার সে উদ্দেশ্য হাসিল আছে'। এর কারণ এই যে, বুযুর্গগণ বলেন–

كُلُّ مُطِيْعٍ لِلّٰهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের যে কোন কাজ করছে, সে মূলত: আল্লাহরই যিকির করছে। আল্লাহ তাআলা ইখলাস ও তাকওয়া দান করলে এসব কাজও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

'কুতবী' পড়ে ঈসালে সওয়াব

আমি আমার ওয়ালিদ সাহেবের কাছে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর এই ঘটনা শুনেছি যে, এক শায়খ নিজের কোন প্রিয় ব্যক্তির জন্য ঈসালে সওয়াবের

উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) তখন 'কুতবী'র সবক পড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন যে, আমি এই 'কুতবী'র সবক পড়ে তোমার আত্মীয়ের জন্য ঈসালে সওয়াব করে দিব। লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হযরত 'কুতবী' পড়ে ঈসালে সওয়াব! ঈসালে সওয়াব তো কুরআন শরীফ, বুখারী শরীফ ইত্যাদি পড়ে হয়। হযরত উত্তরে বললেন, আমাদের কাছে 'কুতবী'র মধ্যে এবং 'বুখারী'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ, বুখারী পড়ার যে উদ্দেশ্য, কুতবী পড়ারও একই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার রহমতের কাছে আশা রয়েছে যে, বুখারী শরীফ পড়ার দ্বারা যে সওয়াব পাওয়া যায়, কুতবী পড়ার দ্বারাও তিনি সে সওয়াব দান করবেন, যদি নিয়ত ঠিক থাকে।

তালিবে ইলম অবস্থায় আমলের ইসলাহ

এরপর হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'বাকি রইল আমলের ইসলাহ। তা সর্বাবস্থায় ফরয, তালিবে ইলম অবস্থায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই এ কাজের ধারা আরম্ভ করে দেয়া উচিত।'

অর্থাৎ, তালিবে ইলম হোক আর তালিবে ইলম না হোক, সবাইকে নিজের আমলের ইসলাহ করতে হবে। আপনারা হয়ত শুনেছেন যে, যখন কোন তালিবে ইলম কোন বুযুর্গের নিকট বায়আত হতে যায়, তখন ঐ বুযুর্গ তাকে বায়আত করে না। বরং তাকে বলে যে, তুমি পড়াশুনা শেষ করলে তখন দেখা যাবে। অপরদিকে এমনও হয়ত শুনেছেন যে, কতক তালিবে ইলমের বুযুর্গদের সাথে তাওয়াল্লুক রয়েছে। আসল কথা এই যে, যেই বায়আতের মধ্যে অধিক হারে যিকির ও অযীফা পালন জরুরী, এমন বায়আত তালিবে ইলমদের করে না, কারণ, এর ফলে তাদের দরস, মুতালাআ ও তাকরারের ক্ষতি হবে। তার মন ঐ সমস্ত অযীফা এবং যিকিরের দিকে ধাবিত হবে। তবে নিজের আমল ও আখলাক সংশোধন করানোর বিষয়ে যারা তালিবে ইলম এবং যারা তালিবে ইলম নয়, সবাই সমান।

প্রথমে 'কসদুস সাবীল' পড়বে

এরপর হযরত থানবী (রহ.) বলেন,

> এর পদ্ধতি এই যে, 'প্রথমে 'কসদুস সাবিল' মনোযোগ সহকারে দু'বার মুতালাআ করে আধ্যাত্মিকতার যে সারকথা বুঝে আসবে, তা জানাবে। তারপর ইসলাহের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করবে।'

অর্থাৎ, 'কসদুস সাবীল' নামে হযরত থানবী (রহ.)-এর একটি পুস্তিকা রয়েছে। সেই পুস্তিকায় হযরত থানবী (রহ.) কোন শায়খ এবং বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার এবং তাসাওউফের উদ্দেশ্য কী, তার সারকথা বর্ণনা করেছেন। এই পুস্তিকার মধ্যে কিছু ফারসী, আরবী শব্দও ছিল। যার ফলে সাধারণ মানুষের তা পড়তে কষ্ট হত। এজন্য আমার ওয়ালিদ সাহেব পুস্তিকাটিকে সহজ করে তুলে ধরেছেন। নাম দিয়েছেন 'তাসহীলে কসদুস সাবীল'। হযরত থানবী (রহ.) বলেন, এই পুস্তিকাটি দু'বার পড়, যাতে করে এর বিষয়বস্তু মনে বসে যায়। এটি পড়লে তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতার সারকথা কি, তা বুঝে আসবে। যখন তাসাওউফ সম্পর্কে বুঝে আসবে, তখন নিজের শায়খ এবং মুসলিহকে অবগত করতে থাক যে, আমি এই আমল করছি। আমার অবস্থা এই। তারপর শায়খের নিকট মাশওয়ারা নিতে থাক এবং দিক-নির্দেশনা চাইতে থাক।

পত্রযোগে সংশোধনের সূচনা

আমাদের হযরত থানবী (রহ.)কে আল্লাহ তাআলা মুজাদ্দিদ বানিয়েছিলেন। তিনি তাসাওউফ ও তরীকতের পথে চিঠি লেনদেন ও পত্র যোগাযোগের এক বিরল-বিস্ময়কর ধারা চালু করেন। প্রথমে চিঠি লেনদেন ও পত্র যোগাযোগের এমন ব্যবস্থা ও গুরুত্ব ছিল না। একমাত্র পথ ছিল শায়খের খেদমতে যাও। তার সোহবতে বস। তার কাছে থেকে নিজের ইসলাহ করাও, চিল্লা লাগাও, মুরাকাবা কর। তারপর ইসলাহ লাভ হতো। হযরত যখন দেখলেন যে, মানুষের কাছে এখন সময় নেই, অবসর নেই, কোথায় গিয়ে নিজের ইসলাহ করাবে? এভাবে মানুষ নিজের ইসলাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি বলেন যে, 'শায়খের সাথে চিঠি লেনদেন কর। এই চিঠি লেনদেন সাহচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত হবে। বরং অনেক সময় এমন হয় যে, একজন তার শায়খের কাছে গিয়ে তার সান্নিধ্যে সময় অতিবাহিত করছে, সে অবস্থায়ও কতক সময় অনেক কথা মুখে বলতে জটিল মনে হয়। তাই শায়খের কাছে যা বলার আছে তা লিখে দাও। তারপর শায়খ তাকে লিখিত আকারে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনা দান করবে। তার হেদায়েত অনুপাতে আমল কর। এর মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে।

'তারবিয়াতুস সালিক' চিঠিপত্রের নমুনা

হযরত থানবী (রহ.)-এর কিতাব, 'তারবিয়াতুস সালিক', তাসাওউফ সংক্রান্ত বিরল, বিস্ময়কর এক জিনিস। বড় বড় ব্যক্তি যারা লিখিত আকারে নিজেদের অবস্থা জানাত, হযরত থানবী (রহ.) লিখিত আকারে তাদের সমস্যার

সমাধান দিতেন। এ কিতাব সেগুলোর নির্বাচিত চিঠিপত্রের সংকলন। আমাদের মত লোক এর কি মূল্য বুঝবে? যে এ অবস্থা অতিক্রম করেছে, যে এই ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে, সে এর মূল্য বুঝতে পারবে যে, এর মধ্যে কত হীরা-মানিক রয়েছে। সত্যি কথা হল, হযরত থানবী (রহ.) দুধ ও পানিকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা হযরত থানবী (রহ.)কে দ্বীনের, তাসাওউফের, শরীয়তের এবং তরীকতের বিস্ময়কর জ্ঞান দান করেছিলেন। মোটকথা, চিঠি লেনদেন ও পত্র যোগাযোগ বড় উপকারী জিনিস। আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে অনেক বরকত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপন দয়ায় আমাদেরকে এসব কথার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাতত্রিশতম মজলিস

সুস্থতার জন্য দু'আ করা সুন্নাত

সুস্থতার জন্য দু'আ করা সুন্নাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

এক রোগী ব্যক্তির চিঠি

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখে যে,

> 'এখন আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে ডেকে নেন। দৃষ্টিশক্তি ছাড়া জীবন বেকার। তেলাওয়াত, মাওয়ায়েয ইত্যাদি থেকে বঞ্চনার তীব্র বেদনা রয়েছে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৭৮)

ঐ ব্যক্তির শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া নিঃসন্দেহে একটি কঠিন বিপদ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযতে রাখুন। বিশেষভাবে যে ব্যক্তি ভাল দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিল এবং কিতাব মুতালাআ করত, এমন ব্যক্তির যদি দৃষ্টিশক্তি চলে যায় তাহলে ভীষণ কষ্টের বিষয়। এই কষ্টের কারণে সে হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে লিখে যে, এখন তো এই দু'আ করি যে, আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে নিজের কাছে তুলে নেন। যখন চোখ নেই, তখন আর এই জীবনে কোন লাভও নেই। এখন তো কুরআন শরীফও তেলাওয়াত করতে পারি না, মাওয়ায়েযও পড়তে পারি না। এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছি।

সুস্থতার দু'আ করা দাসত্বের আলামত

হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে লিখেন যে,

> 'সুস্থতার দু'আ করা তো সুন্নাত এবং দাসত্বের আলামত। কিন্তু একথা বলা যে, এখন আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে ডেকে নেন, দৃষ্টিশক্তি ছাড়া জীবন বেকার, এটি চরম বেয়াদবী এবং দাসত্বের পরিপন্থী কথা। আমাদের মতামত পেশ করার কী অধিকার রয়েছে? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা-ই আসে, তা-ই কল্যাণ। কুরআন তেলাওয়াত ও কিতাব পড়ার মধ্যে সওয়াব ও সন্তুষ্টি সীমাবদ্ধ নয়। প্রথমত সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত আমলকারী ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় আমল করা ছাড়াও পূর্বের আমলের সওয়াব পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত: কতক সময়,

সবরের প্রতিদান, আমলের প্রতিদানের চেয়েও অধিক হয়। তবে দৃষ্টিশক্তির জন্য দু'আ করা নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়া নয়। এর অনুমতি রয়েছে। দু'আ করবে এবং অন্তর দিয়ে করবে। সাথে একথা মনে করবে যে, এর বিপরীত হলে তাও কল্যাণকর। তার উপরও রাজী থাকবে।' (প্রাগুক্ত)

অসুস্থ অবস্থায় দু'আ করার প্রমাণ

দু'টি বিষয় ভিন্ন। উভয়টির হাকীকত বুঝার দরকার রয়েছে। প্রথম বিষয় হলো কেউ অসুস্থ হলে, বা কষ্টে থাকলে, তখন ঐ অসুস্থ অবস্থায় সুস্থতার জন্য দু'আ করা যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন।' শুধু জায়েযই নয়, বরং সুন্নাত। এজন্য দু'আ করা উচিত। হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম আখলাক এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্টের অবস্থায় এই ভাষায় দু'আ করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ وَصَبْرًا عَلٰى بَلِيَّتِكَ وَخُرُوْجًا مِنَ الدُّنْيَا اِلٰى رَحْمَتِكَ

এই দু'আর মধ্যে শুধু নিরাপত্তাই কামনা করেননি, বরং দ্রুত কামনা করেছেন যে, 'হে আল্লাহ! দ্রুত নিরাপত্তা দান করুন। বিপদে ধৈর্য দান করুন।' বিধায় দ্রুত নিরাপত্তার দু'আ করাও সুন্নাত এবং এতে সওয়াব রয়েছে। দাসত্ব ও বন্দেগীর দাবি এই যে, মানুষ আল্লাহর কাছে কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দু'আ করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলার কাছে বাহাদুরী দেখানো ভাল জিনিস নয়। এমন যেন না হয় যে, বুক ফুলিয়ে বললে, আরো অসুখ দাও, আমি সহ্য করব। এটা দাসত্বের দাবি নয়। দাসত্বের দাবি হল, যখন অসুস্থ হবে, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতার দু'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন। যেমন, হযরত আইউব (আ.) বলেন–

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ

অন্যত্র বলেন–

اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

'আমার এই কষ্ট পেয়ে বসেছে, আর আপনি হলেন সর্বাধিক দয়ালু।'
যাই হোক, সুস্থতার জন্য দু'আ করাও আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত।

এক বুযুর্গের ঘটনা

আমি আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)-এর কাছে এ ঘটনা শুনেছি যে, এক বুযুর্গ অসুস্থ হন। অপর এক বুযুর্গ তাঁকে দেখতে যান। তিনি গিয়ে দেখেন যে, ঐ অসুস্থ বুযুর্গের বড় কষ্ট হচ্ছে। ঐ কষ্ট অবস্থায়ও তিনি আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ অযীফা পড়ছেন। তিনি আহ্! উহ্!ও করছেন না এবং সুস্থতার দু'আও করছেন না। এই বুযুর্গ এ অবস্থা দেখে বললেন যে, দেখ ভাই! তুমি যদি এভাবে 'আলহামদু লিল্লাহ'র অযীফা চালু রাখো, তাহলে সুস্থতা লাভ হবে না। যদি তুমি সুস্থতা চাও, আর চাও যে, তোমার কষ্ট দূর হোক, তাহলে একটু আহ্! উহ্! কর। আল্লাহ তাআলার কাছে সুস্থতা চাও এবং বল যে, হে আল্লাহ! আমি অক্ষম, আমি দুর্বল, আমি এই কষ্ট সইতে পারি না। আপনি আমার এই কষ্ট দূর করে দিন। সুস্থতা দান করুন। মোটকথা, আল্লাহ তাআলার সামনে অক্ষমতা ও ভগ্নতা প্রকাশ করা উচিত। মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে বাহাদুরী প্রকাশ করবে না।

এ পরিমাণ দুঃখ সহ্য করাও ভাল নয়

আমার বড় ভাই ছিলেন মুহাম্মদ যাকী কাইফি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উচু মর্যাদা দান করুন। আমীন। তিনি খুব মানসম্মত কবিতা বলতেন। তিনি এক কবিতায় একথাটি বর্ণনা করেন। কবিতাটি এই–

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں - توڑنا ہے حسن کا پندار کیا

দুঃখ হজম করা এমনিতে তো ভাল জিনিস। কিন্তু এ পরিমাণ হজম করা উচিত না যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে বাহাদুর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার অহমিকা কি ভাঙতে চাও যে, আমাকে যতই কষ্ট দেন, আমি সহ্য করব। আমি অনেক বড় বীর। মনে রাখবে, এটি দাসত্বের দাবি নয়। দাসত্বের দাবি এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সুস্থতা দান করুন।

ক্ষুধার কারণে এক বুযুর্গের কান্না

হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) শুনাতেন যে, এক বুযুর্গ বসে কাঁদছিলেন। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, হযরত! কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন যে, ক্ষুধা লেগেছে, তাই কাঁদছি এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করছি যে,

হে আল্লাহ! ক্ষুধা লেগেছে, খানা খাওয়ান। একজন বলল, আপনি তো শিশুদের মত কাঁদছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা এজন্য আমাকে ক্ষুধা দান করেছেন যেন আমি কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে দু'আ করি এবং তাঁর কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করি।

অসুস্থ অবস্থায় আহ! উহ! করা

যাইহোক, অসুস্থ অবস্থায় তো সুস্থতার দু'আ করা সুন্নাত। তবে তা এমন পন্থায় না হতে হবে যে, তার মধ্যে অভিযোগ লুকায়িত থাকে। নাউযুবিল্লাহ। অসুস্থ অবস্থায় আহ! উহ! করায় কোন দোষ নেই। কষ্টের কথা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। তবে কষ্টের বহি:প্রকাশ এমন ভাষায় না হতে হবে যে, তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত তাকদীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে। কারণ, এটি খুব বিপজ্জনক বিষয়। বরং এরূপ বলা উচিত যে, হে আল্লাহ! আপনার সিদ্ধান্তই সঠিক। আপনার চাওয়াই যথার্থ, কিন্তু আমি দুর্বল, অক্ষম। এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না। হে আল্লাহ! এই কষ্ট দূর করে দিন।

কষ্টে হযরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর ধৈর্যধারণ

আমি আমার ওয়ালিদ হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.)কে দেখেছি যে, তাঁর তীব্র হার্টের কষ্ট ছিল। তার সাথে পায়ের ব্যথাও ছিল। শরীরেও ফোসকা উঠেছিল। ডাক্তার এবং চিকিৎসক এসে ঐ সমস্ত ফোসকা দেখতো। আর বলত যে, এই ফোসকা এমন যে, শরীরে তা বের হলে এমন মনে হয়, যেন শরীরের উপর কেউ আঙ্গার রেখে দিয়েছে। পায়ের নলা পুরোটা ঐ ফোস্কা দিয়ে ভরা ছিল এবং বুকেও ফোস্কা বের হয়েছিল। আমার মনে আছে যে, ঐ সময় হযরত ওয়ালিদ সাহেব (রহ.)কে দেখার জন্য বড় বড় সাতজন ডাক্তার আসেন। তাদের মধ্যে হাকীম সাঈদ সাহেবও ছিলেন। যখন এঁরা ওয়ালিদ সাহেবকে দেখে বের হন, তখন তিনি বলেন যে, আমাদের অবাক লাগছে যে, মুফতী সাহেব কিভাবে এই কষ্ট সহ্য করছেন! কারণ, এই ফোস্কাগুলো একদম অঙ্গারের মত কষ্টদায়ক।

রহমতের দু'আর উপর ইস্তিগফার

নিজের এতসব কষ্টে আক্রান্ত থাকা অবস্থায় আমাদের বড় ভাই যাকী কাইফী (রহ.)-এর মৃত্যুর খবর আসে। তিনি ছিলেন বয়সে যুবক ও আব্বাজানের প্রিয় সন্তান। আপনি অনুমান করে দেখুন যে, এক দিকে হার্টের কষ্ট, অপর দিকে পায়ে ব্যথা। তৃতীয়ত: ফোস্কা। চতুর্থত: জওয়ান ছেলের মৃত্যু সংবাদ। তখন আপনা আপনি মুখে এই শব্দ চলে আসে। হে আল্লাহ! দয়া করুন, হে আল্লাহ! রহম করুন। অল্প পরেই তিনি বলেন যে, আমি এ কি বললাম। হে আল্লাহ! রহম করুন। এর অর্থ তো এই যে, এখন পর্যন্ত আল্লাহর

পক্ষ থেকে রহম করা হচ্ছে না। নাউযুবিল্লাহ, এ তো অভিযোগ করা হলো। এর মধ্যে তো অভিযোগের গন্ধ পাওয়া গেল। অথচ আমরা সব সময় আল্লাহ তাআলার রহমতের বৃষ্টির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি আমার এ কথার জন্য আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। তারপর এই দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! এই অসুস্থতাও আপনার নিয়ামত। কিন্তু হে আল্লাহ! আমরা অক্ষম, দুর্বল। এই নিয়ামতকে সহ্য করার শক্তি আমাদের মধ্যে নেই। হে আল্লাহ! এই অসুস্থতার নিয়ামতকে সুস্থতার নিয়ামত দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।

দু'আর মধ্যে যেন অভিযোগের রং না থাকে

আপনি অনুমান করুন যে, যাঁর উপর এত কষ্ট, এত পেরেশানী চলছে তাঁর এমন সময়ে, এদিকে মন যাওয়া যে, হে আল্লাহ! রহম করুন। আমার এ কথা তো ভুল হল না। এমন ব্যক্তির চিন্তাই এদিকে যেতে পারে, যার সব সময় আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। ইতর-ভদ্র সবার চিন্তা এদিকে যেতে পারে না। এর মাধ্যমে আদব শেখানো হয়েছে যে, সুস্থতার দূ'আ কর। কিন্তু এমনভাবে করো না যে, তার মধ্যে অভিযোগের রং থাকে। বরং নিজের দুর্বলতার এবং অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে সুস্থতার দু'আ কর। নিজের ভঙ্গুরতা তুলে ধরে সুস্থতা চাও। তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা এই দূ'আর উপর সওয়াবও দান করবেন। এজন্য এই মালফুযে হযরত থানবী (রহ.) বলেন, 'সুস্থতার দু'আ করা তো সুন্নাত এবং দাসত্বের আলামত'।

রাসূল সা.-এর শানে গুণ প্রকাশক শব্দাবলী

মনে রাখবেন, মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা– যার উপর আর কোন মর্যাদা নেই– তাহলো দাসত্বের মর্যাদা। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়া। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন ভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করেছেন। গুণ এবং প্রশংসার কোন শব্দই বাদ রাখেননি। এক জায়গায় ইরশাদ করেছেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

'হে নবী! আমি আপনাকে এমন মর্যাদাপূর্ণ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি যে, আপনি সাক্ষী হবেন, আপনি সুসংবাদ দাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আপনি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ।

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'তোমাদের নিকট এমন এক নবী আগমন করেছেন, যিনি তোমাদের সমজাতীয়। তোমাদের জন্য ক্ষতিকর জিনিস, তাঁর কাছে খুবই কষ্টকর। তিনি তোমাদের কল্যাণের বড় আকাঙ্ক্ষী। ঈমানদারদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল এবং দয়ালু।'

বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ বর্ণনা করেছেন। কোথাও يَآاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলছেন এবং কোথাও يَآاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলছেন। কোথাও 'কম্বলওয়ালা' বলে সম্বোধন করছেন। আর কোথাও 'চাদরওয়ালা' বলছেন। আদর ও ভালবাসার এবং সম্মান ও মর্যাদার কোন শিরোনামই বাদ রাখেননি।

মেরাজের আলোচনায় 'আব্দ' শব্দ ব্যবহার করা

কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা মেরাজের সময় তাঁকে নৈকট্যের সর্বোচ্চ ধাপ এবং সর্বোচ্চ ধাম দান করলেন। যেখানে তাঁকে সরাসরি কথা বলার মর্যাদা দান করলেন এবং এমন মাকামে পৌঁছলেন যে, জিবরাঈল আমীনও সেখানে পৌঁছতে পারলেন না। কুরআনুল কারীমে যেখানে এই উঁচু মর্যাদা দান করার আলোচনা এসেছে। সেখানে তাঁর জন্য শুধুমাত্র 'আবদ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের এক ক্ষণে মসজিদুল হারাম থেকে ভ্রমণ করিয়েছেন।

এখানে شَاهِدًا، مُبَشِّرًا، نَذِيْرًا কোন শব্দই আসেনি। এখানে শুধু بِعَبْدِهٖ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দাসত্বের চেয়ে অধিক মর্যাদাশালী আর কোন স্তর নেই। মানুষ যত উপরেই যাক না কেন, কিন্তু তার সর্বোচ্চ ধাম হল, সে আল্লাহ তাআলার বান্দা হয়ে যাবে। বিধায় মানুষের সর্বোচ্চ মাকাম হল 'আবদিয়াত' তথা দাসত্ব। মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করা এবং অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করার মাধ্যমে এই দাসত্ব লাভ হয়।

এগুলো বেয়াদবীর শব্দ

যাইহোক, হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, সুস্থতার দু'আ করা তো সুন্নাত এবং দাসত্বের আলামত, কিন্তু একথা বলা যে, এখন আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে ডেকে নিক, দৃষ্টিশক্তিহীন জীবন বেকার। এটি চরম বেয়াদবী। এ ধরনের কথা বেশির ভাগ মানুষের মুখে চলে আসে যে, এখন আল্লাহ ঈমানের সাথে তুলে নিক। এখন তো জীবন বেকার। এ ধরনের কথা সম্পর্কে হযরত বলেন যে, এটা অত্যন্ত বেয়াদবীপূর্ণ কথা এবং দাসত্বের পরিপন্থী কথা। আরে আমরা মত দেয়ার কি অধিকার রাখি যে, আমাদের জীবন সম্পর্কে এ মত দিব যে, এখন তো জীবন বেকার? এর অর্থতো এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনর্থক জীবিত রেখেছেন।

এই কষ্ট তোমাকে অনেক উঁচু পর্যায়ে তুলে দিচ্ছে

তুমি কি জান যে, তোমার জন্য জীবন উত্তম না মৃত্যু উত্তম? তোমার কি জানা আছে যে, সামনের জীবনে কোন একটি আমল এমন হবে, যার দ্বারা আখেরাতের ঘাঁটি পার হয়ে যাবে? তোমার কি জানা আছে যে, যেই কষ্টের কারণে তুমি কোঁকাচ্ছ এবং তুমি মৃত্যুর কামনা করছ, এই কষ্ট তোমাকে কোন উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে? আল্লাহ তাআলার বিষয়গুলো বিস্ময়কর হয়ে থাকে। কেউ তা বুঝতে পারে না। কবির ভাষায়–

ما پروریم دشمن و ما می کشیم دوست

کسے را چراں و چوں نہ رسد در قضاء ما

'আমি শত্রুকে প্রতিপালন করি এবং বন্ধুকে মেরে ফেলি। আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারো কথা বলার সুযোগ নেই।'

আল্লাহর বড় দুশমন এবং দ্বীনের বড় দুশমনকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। তারা চাঁদের বুকে পতাকা উড়াচ্ছে। আর যারা প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র তাদেরকে করাত দিয়ে চেরা হচ্ছে।

এক হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কতক সময় আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে বিশেষ মাকামে পৌছাতে চান। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তার আমল দ্বারা ঐ মাকামে পৌছতে পারল না। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে কোন কষ্টে আক্রান্ত করেন। কখনো দেহে, কখনো মনে, কখনো চিন্তায়, কখনো আবেগ-উদ্দীপনায় কষ্ট দেন। তারপর ঐ কষ্টের ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে অনেক উর্ধ্বে পৌছে দেন।'

একজন মুসলমান ও একজন ইহুদীর ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন যে, এক শহরে একজন ইহুদী ছিল, আরেকজন মুসলমান ছিল। উভয়জন মৃত্যুমুখে পতিত হল। ইহুদীর মনে মাছ খাওয়ার বাসনা জাগল। আহা! কোথাও থেকে যদি মাছ পেতাম, তাহলে খেতাম। আর মুসলমানের যয়তুনের তেল খেতে মন চাইল। আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে বললেন যে, অমুক শহরে এক ইহুদী আছে। তার মাছ খেতে মন চাচ্ছে। তুমি একটি মাছ ধরে তার বাড়ির পুকুরে ফেলে দিয়ে আস। সে ঐ মাছ ধরে খেয়ে নিবে। আরেকজন ফেরেশতাকে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন যে, অমুক মুসলমানের যয়তুন খেতে মন চাচ্ছে। ওর ঘরের আলমারিতে যয়তুন আছে। তুমি গিয়ে ঐ যয়তুন নষ্ট করে দিয়ে আস। সুতরাং উভয় ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করার জন্য রওনা হল।

ফেরেশতারা নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করল

পথে উভয় ফেরেশতার পরস্পর সাক্ষাত হল। এক ফেরেশতা অপর ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে উত্তর দিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই হুকুম দিয়েছেন যে, এক ইহুদীর মাছ খেতে মন চাচ্ছে। তার পুকুরে যেন মাছ ফেলে দিই। যাতে সে তা খেয়ে নেয়। অপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে জবাব দিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, অমুক মুসলমানের যয়তুনের তেল খেতে মন চাচ্ছে; তুমি গিয়ে তার তেল নষ্ট করে দাও। যেন সে তা না খেতে পারে। আল্লাহ তাআলার হুকুম তো সর্বাবস্থায়ই হুকুম। তা অবশ্যই মানতে হবে। সুতরাং উভয় ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করল।

হে আল্লাহ! বিষয়টি বুঝে এলো না

ঐ দুই ফেরেশতা নিজ নিজ কাজ করে আল্লাহর দরবারে ফিরে এসে আরজ করল যে, হে আল্লাহ! বিষয়টি আমাদের বুঝে এলো না। একদিকে ইহুদী, কাফের। তার বাসনা আপনি তো এভাবে পুরা করালেন যে, তার পুকুরে মাছ ছিল না, তা সত্ত্বেও তার বাসনা পুরা করার জন্য তার পুকুরে মাছ ফেলার ব্যবস্থা করলেন। অপর দিকে মুসলমান, যার ঘরে যয়তুনের তেল বিদ্যমান ছিল, তারপরও আপনি তার তেল নষ্ট করালেন, যাতে সে তার বাসনা পুরা করতে না পারে। বিষয়টি বুঝে এলো না।

কাফেরদের বিষয় ভিন্ন

আল্লাহ তাআলা বললেন, আসল ব্যাপার এই যে, অমুসলিম কাফেররা দুনিয়াতে যে ভাল কাজ করে, যেমন কোন দান-খয়রাত করল, অন্যের সঙ্গে ভাল

ব্যবহার করল, জনহিতকর কাজ করল। আমি দুনিয়াতেই তাদের ভাল কাজের বদলা দিতে চাই। যখন তারা আমার কাছে আসবে, তখন যেন তাদের ভাল কাজের হিসাব দুনিয়াতেই পূর্ণ থাকে। আখেরাতে যেন তাদের ভাল কাজের কোন বদলা আমার দায়িত্বে না থাকে। এজন্য আমি তাদের ভাল কাজের বদলা দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি। এই ইহুদী দুনিয়াতে অনেক ভাল কাজ করত। আমি তার সমস্ত ভাল কাজের বদলা দুনিয়াতেই দিয়েছি। শুধু একটি ভাল কাজের বদলা তাকে দেয়া হয়নি, এখন সে আমার কাছে আসছে। তাই আমি চাইলাম যে, তার এই শেষ বাসনাও পুরা করে দিই। যেন তার ভাল কাজের বদলা সমান হয়ে যায়। তাই আমি তার বাসনা পুরা করে, তার ভাল কাজের হিসাব চুকিয়ে দিলাম। এখন সে আমার কাছে এলে তার কোন ভাল কাজের বদলা দেয়া আমার দায়িত্বে অবশিষ্ট থাকবে না।

মুসলমানদের ব্যাপার ভিন্ন

আর মুসলমানদের সাথে আমার নিয়ম এই যে, মুসলমান দুনিয়াতে গোনাহ করে থাকে। আমি চাই দুনিয়াতেই তার গোনাহের হিসাব শেষ হয়ে যাক, যাতে করে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন যেন গোনাহের কোন হিসাব তার খাতায় না থাকে। তাকে আযাব দেয়ার জন্য যেন জাহান্নামে পাঠাতে না হয়। এজন্য কোন মুসলমানের ঘাড়ে যদি কোন গোনাহ থেকে যায়, তখন আমি কষ্টের মাধ্যমে এবং অসুস্থতার মাধ্যমে তার গোনাহ শেষ করে দিই। এভাবে ঐ মুসলমানের অন্যসব গোনাহতো মাফ হয়েছিল। একটি মাত্র গোনাহ অবশিষ্ট ছিল। আমি চাইলাম, তার এই গোনাহও যেন অবশিষ্ট না থাকে। সে যখন আমার কাছে আসবে, তখন যেন পাক-সাফ হয়ে আমার কাছে আসে। এজন্য যখন তাঁর মনে যয়তুনের তেল খাওয়ার বাসনা জাগল, আমি তার যয়তুনের তেল নষ্ট করে দিলাম। তার মনে একটি আঘাত দিলাম। ফলে তার ঐ অবশিষ্ট গোনাহটিও শেষ হয়ে গেল। এখন সে আমার কাছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নির্মল-নিষ্কলুষ হয়ে আসবে। তাই মানুষ আল্লাহ তাআলার হিকমত, কতটুকুই আর বুঝতে পারে।

হযরত খাদিজা (রাযি.)কে সম্মানিত করার ধরন

আমি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)কে একথা বলতে শুনেছি। ঘটনাক্রমে কোন কিতাবে আমি এটি খুঁজে পাইনি। আপনারাও খুঁজে দেখবেন। কোথাও পেলে তার উদ্ধৃতি আমাকে জানাবেন। ঘটনাটি এই যে, হযরত খাদিজা (রাযি.) অসুস্থ ছিলেন। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। হযরত খাদিজা (রাযি.) নিজের কষ্টের কথা বলছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এই ব্যাধি মরণ ব্যাধি। তুমি আর বাঁচবে না। এ রোগেই তুমি মারা যাবে।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বেশি দয়া-মায়া এবং স্নেহ-মমতার অধিকারী ছিলেন। সাধারণ মানুষের জন্য হুকুম হল, কোন মানুষ কোন রোগী দেখতে গেলে তাকে সান্ত্বনা দিবে। এরূপ বলবে না যে, তুমি এ রোগেই মারা যাবে। তাহলে হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাযি.), যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি ছিলেন এবং এমন সহমর্মী ও সমবেদনশীল ছিলেন যে, তিনি সারা জীবন তাঁকে স্মরণ করতেন, এমন বিবিকে তিনি একথা কিভাবে বললেন যে, তুমি এই রোগে বাঁচবে না, মরে যাবে।

হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলেন যে, উলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে বলেন যে, মূলত: জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর নসীবে ছিল, কিন্তু আমলের মাধ্যমে তিনি তখনো ঐ পর্যায়ে উপনীত হতে পারেননি। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতে নিজের সঙ্গে রাখার জন্য তাঁর সামনে এমন কথা বলেন, যার কারণে তাঁর অন্তরে ব্যথা লাগবে, আর ঐ ব্যথার পরিণতিতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে আখেরাতে সে আমার সঙ্গে থাকবে।

দুঃখ-কষ্টে রাজী থাকা মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ

মোটকথা, দুনিয়াতে যে সমস্ত রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্ট হচ্ছে, তা তোমার জন্য উপকারী, না অপকারী তা তোমার কি জানা আছে? বাস্তবে আখেরাতে যে, সেগুলো উপকারী হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে শর্ত হল এর উপর তোমাকে রাজী থাকতে হবে। এজন্য এমন কথা বলা যে, এখন তো জীবন বেকার, এটি মারাত্মক ভুল ও বেয়াদবীপূর্ণ কথা। এজন্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমার তো জানা নেই যে, যে মৃত্যু তুমি চাচ্ছো, ঐ মৃত্যু যদি সাথে সাথে এসে যায় আর মরার পর সোজা আযাবের জায়গায় চলে যাও, তাহলে এই মৃত্যুর কি ফল হল? কবির ভাষায়–

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

'এখন তো ঘাবড়িয়ে বলি যে, মরে যাব। মরেও যদি শান্তি না পাই, তাহলে কোথায় যাব?'

মৃত্যু তো তখন ভালবাসার বস্তু, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হবে। তখন মৃত্যু নিঃসন্দেহে প্রিয় বস্তু হবে, কিন্তু তোমার কি জানা আছে, মৃত্যুর পর তুমি কোথায় যাবে? এজন্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করো না।

মৃত্যুর দু'আর পরিবর্তে এই দু'আ করবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এই দু'আ শিখিয়েছেন যে–

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاتَ خَيْرًا لِّيْ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনার ইলমে গায়েবের উসীলায় এবং মাখলুকের উপর আপনার ক্ষমতার উসীলায় আমি প্রার্থনা করছি যে, হে আল্লাহ! আপনার ইলমে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখুন, আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দিন।'

এই দু'আ করা উচিত। এরূপ বলা উচিত নয় যে, এখন যদি আমার মৃত্যু হত তবে ভাল হত। বেঁচে থাকতে আর মন চায় না। আল্লাহ্ এখন তুলে নিক। এসব বেয়াদবীর কথা। আল্লাহ্ তাআলার সামনে নিজের মত তুলে ধরা।

তিনটি শিক্ষা

যাইহোক, এই মালফূয দ্বারা তিনটি শিক্ষা লাভ হল। প্রথম শিক্ষা এই লাভ হল যে, সুস্থতার দু'আ করা সুন্নাত। দ্বিতীয় শিক্ষা এই লাভ হল যে, এমন আঙ্গিকে দু'আ করবে না, যার মধ্যে অভিযোগের আকার থাকে। তৃতীয় শিক্ষা এই লাভ হল যে, কষ্টের তীব্রতায় এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগের কারণে নিজের মৃত্যুর দু'আ করা ঠিক নয়। ঐ দু'আই করবে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন যে, হে আল্লাহ! যতক্ষণ জীবিত থাকা কল্যাণকর ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত রাখুন। আর যখন আমার জন্য মৃত্যুবরণ কল্যাণকর, তখন মৃত্যু দান করুন। অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রার্থিত এই দু'আটি করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ وَصَبْرًا عَلٰى بَلِيَّتِكَ وَخُرُوْجًا مِنَ الدُّنْيَا اِلٰى رَحْمَتِكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দ্রুত নিরাপত্তা, বিপদে ধৈর্য এবং দুনিয়া থেকে আপনার রহমতের দিকে বহির্গমন প্রার্থনা করছি।'

এরূপ দু'আ করা উচিত। সরাসরি মৃত্যুর দু'আ করা উচিত নয়।

নিজের থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না

যাইহোক, ঐ ব্যক্তি চিঠিতে লিখেছিল যে, দুঃখ এই যে, চোখ চলে গেছে। এখন তেলাওয়াত করতে পারি না, মাওয়ায়েয পড়তে পারি না, এজন্য মনে বড়

কষ্ট। এর উত্তরে হযরত থানবী (রহ.) লিখেন যে, তেলাওয়াত ও কিতাব পড়ার মধ্যে সওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টি সীমাবদ্ধ নয়। তুমি নিজের থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে, কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমেই আমার সওয়াব লাভ হবে। এখন যেহেতু চোখ নেই, তাই আমি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। এটা তো আল্লাহ তাআলার প্রতি বদগুমানী। এরূপ বদগুমানী করো না। আল্লাহ তাআলার এ ফয়সালার উপর রাজী থাক। এজন্য আল্লাহ প্রতিদান দিবেন।

হযরত কারী ফাতেহ মুহাম্মদ সাহেব (রহ.)

হযরত কারী ফাতেহ মুহাম্মদ সাহেব (রহ.) সারাটি জীবন তেলাওয়াতের প্রতিমূর্তি ছিলেন। লোম কূপের গোড়ায় গোড়ায় কুরআনে কারীম প্রবিষ্ট ছিল। তিনি এই দু'আর বাস্তব নমুনা ছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجِلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ

'হে আল্লাহ! কুরআনে আযীমকে আমার অন্তরের সজীবতা, আমার দৃষ্টির আলো এবং আমার দুঃখ-দুর্দশা দূরকারী বানিয়ে দিন।'

কারী সাহেবকে স্বচক্ষে দেখলে, একথা বিশ্বাস হতো না যে, এমন মানুষও দুনিয়ায় থাকতে পারে। কুরআনুল কারীম তাঁর জীবনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। শিরায় শিরায় বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর আপাদমস্তক সদা-সর্বদা তেলাওয়াতে পরিণত হয়েছিল। একটি মুহূর্তও তেলাওয়াত শূন্য থাকত না।

কিন্তু শেষ বয়সে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। জিহ্বা অচল হয়ে যায়। যে ব্যক্তির জিহ্বা প্রতিটি মুহূর্তে তেলাওয়াতে সিক্ত থাকত, তাঁর জিহ্বা অচল হয়ে যায়। আমি তাঁকে যখন এ অবস্থায় দেখতাম। তখন কখনো কখনো মনে খুব কষ্ট হতো। হে আল্লাহ! যিনি সারা জীবন তেলাওয়াতে কাটিয়ে দিলেন। এখন তাঁর জিহ্বা অচল হয়ে গেছে। শেষ সময়ে শুয়ে শুয়েই তেলাওয়াত করবে, এই শক্তিও নেই। যাইহোক, তাঁকে দেখে বড় আফসোস হত। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে অন্য চিন্তা আসল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে এটাই তো দেখাতে চাচ্ছেন যে, না তেলাওয়াত করার মধ্যে কিছু আছে, না তেলাওয়াত ছাড়ার মধ্যে কিছু আছে। আমি যে অবস্থায় রাখি, বান্দার জন্য তো তাতেই কল্যাণ রয়েছে। যখন তাঁর তেলাওয়াতের রস রুচি ছিল, সর্বদা মুখে তেলাওয়াত চালু ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এখন যখন তেলাওয়াত তাঁর জীবনের অঙ্গে পরিণত হল, তখন তাঁর জিহ্বা অচল করে দেয়া হল। এখন তাঁর এই নীরবতার কারণে এবং এই অচল জিহ্বার কারণে সেই সওয়াবই মিলছে, যা তেলাওয়াতের কারণে মিলছিল। বরং এখন হয়ত তার চেয়ে অধিক সওয়াব মিলছে। কারণ, তেলাওয়াতের মধ্যে তো তিনি স্বাদ

পাচ্ছিলেন। আর এখন তো জিহ্বা অচল করে দেয়া হয়েছে। এখন তেলাওয়াত করতে মন চায়। আফসোস হয়, কিন্তু জিহ্বা চলে না। তাই এখন তেলাওয়াতের সওয়াব তিনি আলাদা পাচ্ছেন এবং তেলাওয়াত না করার আক্ষেপের সওয়াব আলাদা পাচ্ছেন। এভাবে আমি তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির দ্বিগুণ উপকরণ দিয়েছি। এসব কাজ আল্লাহ তাআলার হিকমত অনুযায়ী হচ্ছে। কে তাতে নাক গলাতে পারে। মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন–

چوں کہ بر میخد ببند و بستہ باش

چوں کشاید چابک و برجستہ باش

যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে বেঁধে কোথাও ফেলে রাখেন, তখন বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাক। এটাই তোমার ইবাদত। কারণ, এই অবস্থা তিনি করেছেন।

আমার হুকুম এবং আমার ফয়সালাই সবকিছু

তোমার অন্তরে যে চিন্তা জাগছে যে, আমার দ্বারা তেলাওয়াত হচ্ছে না, এর অর্থ হল তোমার বাসনা পুরা হচ্ছে না। এজন্য দুঃখ হচ্ছে। অথচ আল্লাহর সন্তুষ্টি যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তেলাওয়াত বন্ধ অবস্থায়ও সেই সন্তুষ্টি লাভ হবে, তেলাওয়াত চলা অবস্থায় যে সন্তুষ্টি লাভ হচ্ছিল। এজন্য এটা দেখ যে, আল্লাহ তাআলা কোন কাজে খুশি। হযরত কারী ফাতেহ মুহাম্মদ সাহেবের (রহ.) ঘটনায় বিরাট শিক্ষা রয়েছে। আমি তাঁকে দেখে একথা চিন্তা করতাম যে, যে লোকটি কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াতে সারাটি জীবন কাটিয়ে দিল, আজ আল্লাহ তাআলা এই তাজাল্লী দেখাচ্ছেন যে, দেখ! যে ব্যক্তি কিনা আমার কালামের আশেক ছিল, আমি তার জিহ্বা বন্ধ করে দিয়েছি। যেন কুরআনের একটি শব্দও পড়তে না পারে। এসব এজন্য করেছি, যেন দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দেই যে, কোন কিছুর মধ্যে কিছু নেই। সবকিছু আমার হুকুম এবং আমার ফায়সালার মধ্যে রয়েছে। আমি যা ফায়সালা দিব এবং আমি যেই হুকুম দিব প্রকৃতপক্ষে তা-ই দ্বীন।

অসুস্থ অবস্থায় পূর্বের আমলের সওয়াব পেতে থাকে

এরপর হযরত থানবী (রহ.) বলেন,

> 'প্রথমত: সুস্থ অবস্থায় নিয়মিত আমলকারী ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় আমল করা ছাড়াই পূর্বের আমলের সওয়াব পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত: কতক সময় ধৈর্যের সওয়াব, আমলের সওয়াবের চেয়ে অধিক হয়ে থাকে।'

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় একটি নফল ইবাদতে অভ্যস্ত ছিল। যেমন, সে প্রতিদিন এক পারা করে কুরআন তেলাওয়াত করত। এখন অসুস্থ হয়েছে। অসুস্থতার কারণে তেলাওয়াত করতে পারছে না, তাহলে যত দিন অসুস্থতার কারণে তেলাওয়াত করবে না, ততদিন সে প্রাত্যহিক এক পারা করে তেলাওয়াতের সওয়াব পেতে থাকবে। দ্বিতীয়ত: কতক সময় সবরের প্রতিদান, আমলের প্রতিদানের চেয়ে বেড়ে যায়। যেমন, এক ব্যক্তি আমল করায় এত অভ্যস্ত হয়েছে যে, ঐ আমল তার জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তার শিরায় শিরায় তা ছড়িয়ে গেছে। এখন আল্লাহ তাআলা এমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করে দিলেন, যার কারণে এখন সে ঐ আমল করতে পারে না। এখন ঐ ব্যক্তি আমল না হওয়ায় যে সবর করছে, ঐ সবরের প্রতিদান, মূল আমলের প্রতিদানের চেয়ে অধিক হবে। সুতরাং তেলাওয়াতের দ্বারা সে এই পরিমাণ প্রতিদান পেত না, এই ধৈর্য ধরার কারণে যে প্রতিদান লাভ হচ্ছে।

দৃষ্টিশক্তির জন্য দু'আ করায় কোন ক্ষতি নেই

এরপর হযরত থানবী (রহ.) বলেন, 'তবে দৃষ্টিশক্তির জন্য দু'আ করার দ্বারা নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয় না।'

অর্থাৎ, এই দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন। এতে কোন ক্ষতি নেই। এর অনুমতি রয়েছে। এজন্য দু'আ করবে এবং অন্তর দিয়ে দু'আ করবে। সাথে একথা মনে করবে যে, এর বিপরীত হলে তাও কল্যাণকর। তার উপরও রাজী থাকব। অর্থাৎ, দু'আ করা সত্ত্বেও যদি দৃষ্টিশক্তি ফিরে না পাও, তখন মনে করবে যে, এর মধ্যে আমার কল্যাণ রয়েছে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর দ্বীনী বুঝ

আল্লাহ তাআলা হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)কে দ্বীনের যে বুঝ দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি দ্বীনের একেকটি বিষয়কে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। সত্য কথা হলো, এখন এমন বুঝের লোক আর চোখে পড়ে না। তিনি খুলে খুলে ছেনে ছেনে প্রত্যেকটি জিনিসকে পৃথক করে দিয়েছেন। দুধ আর পানি আলগ করে দিয়েছেন। বহু শতাব্দী পর পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এই মালফূযটিই লক্ষ্য করুন যে, ছোট্ট একটি কথা। কিন্তু এর মধ্যে কত সবক শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিতাবটি বুঝার এবং সে অনুপাতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আটচল্লিশতম মজলিস

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি আল্লাহর কাছে চাইবে

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি আল্লাহর কাছে চাইবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দু'আ না করা বেয়াদবী

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখে যে,

'দু'আ করুন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার উদ্দেশ্য পুরা করুন বা না করুন, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি যেন সব সময় দান করেন।'

উত্তরে হযরত লিখেন–

'এরূপ বলা বেয়াদবী। আমাদের দুনিয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। এরূপ দু'আ করা উচিত যে, উভয় জাহানের উদ্দেশ্য যাতে পুরা হয়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৭৮)

অর্থাৎ, এরূপ বলা যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার উদ্দেশ্য পুরা করুন বা না করুন আমি তার পরোয়া করি না। আল্লাহ তাআলা শুধু পরকালে সন্তুষ্টি দান করুন। একথা বলা বেয়াদবী। আরে, আমরা তো দুনিয়ার বিষয়েও মুহতাজ। এই দু'আ করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা উভয় জগতের উদ্দেশ্য যেন পুরা করেন। দুনিয়ার উদ্দেশ্যসমূহ চাওয়াও জরুরী। তিন দিন খাবার না মিললে সব অহংকার বের হয়ে যাবে। অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আমরা তো রুটির মুখাপেক্ষী। ভাতের মুখাপেক্ষী। পানির মুখাপেক্ষী। সুস্থতার মুখাপেক্ষী। সব কিছুর মুখাপেক্ষী। এজন্য নিজের সমস্ত অভাবের কথা আল্লাহর সামনে তুলে ধর। দুনিয়ার অভাবও তুলে ধর এবং আখেরাতের অভাবও তুলে ধর।

এক বুযুর্গের শিক্ষণীয় ঘটনা, আমি আমার ওয়ালিদ মাজিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.)-এর কাছে এ ঘটনা শুনেছি যে, এক বুযুর্গ ছিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার যিকির- ফিকরে এ পরিমাণ নিমজ্জিত হন এবং আল্লাহর যিকিরে এত বেশি স্বাদ পান যে, একবার ভাবোম্মত্ত অবস্থায়, তার মুখ দিয়ে একথা বের হয়ে যায় যে,

وَلَيْسَ لِيْ فِيْ سِوَاكَ حَظًّا - فَكَيْفَ مَاشِئْتَ فَاخْتَبِرْنِيْ

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হিফাযত করুন, বড় মারাত্মক কথা ছিল এটি। অর্থাৎ, তিনি বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া আর কোন কিছুর মধ্যে আমার স্বাদ নেই। ভোগ-উপভোগের আর কিছু নেই। শুধুই আপনার যিকির-ফিকিরেই স্বাদ পাই। এরপর বলেন যে, 'আপনার যেভাবে ইচ্ছা আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

আল্লাহ তাআলাকে পরীক্ষা করার আহ্বান! আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ! এর ফলে আল্লাহ তাআলা পেশাব বন্ধ করে দিলেন। মুত্রথলি পেশাবে ভরে গেছে। ব্যথা-বেদনা হচ্ছে, কিন্তু পেশাব বের হচ্ছে না।

মানুষ তো পেশাবেরও মুখাপেক্ষী

এর মাধ্যমে তাকে দেখানো হলো যে, তুমি এ কেমন দু'আ করছিলে যে, আপনি ছাড়া আর অন্য কিছুতে আমার ভোগ নেই। আরে! তোমার তো পেশাবের মধ্যেও ভোগ রয়েছে। তোমার তো পেশাবেরও প্রয়োজন রয়েছে। পেশাব বন্ধ হয়ে গেলে তো তোমার জীবন উজাড় হয়ে যাবে। তিনি বুঝতে পারলেন, আমার ভুল হয়েছে। তিনি তাওবা ও ইস্তিগফার করলেন। তার কাছে ছোট শিশুরা কুরআন পড়তে আসত। ঐ শিশুদের তিনি বলতেন যে–

اُدْعُوْا لِعَمِّكُمُ الْكَذَّابِ

'তোমাদের মিথ্যুক চাচার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ কর।'

কারণ, সে এই মিথ্যা দাবি করেছে যে, আপনি ছাড়া আর কোন কিছুতে আমার ভোগ-উপভোগ নেই।

প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে হবে

মোটকথা, সেই মহান সত্ত্বা এমন নন যে, তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া যায়। না দুনিয়ার বিষয়ে, না আখেরাতের বিষয়ে। আরে, আমরা তো তাঁর সামনে দুনিয়ার অভাবও তুলে ধরব এবং আখেরাতের অভাবও তুলে ধরব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখুন, তিনি আল্লাহর কাছে কোন জিনিস চান নি? সবকিছু তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়েছেন। দুনিয়ার রিযিকও চেয়েছেন, সুস্থতাও চেয়েছেন, দারিদ্র্য থেকে পানাহ চেয়েছেন, অলসতা থেকে পানাহ চেয়েছেন, ভীরুতা থেকে পানাহ চেয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার সামনে তুলে ধরেছেন। এজন্য একথা বলা যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার উদ্দেশ্যসমূহ পুরা করুন আর না করুন, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি যেন লাভ হয়, এটা বেয়াদবী।

ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ করা যথেষ্ট হওয়া উচিত

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে লিখেন যে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

> একটি ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ। এছাড়া আরো অনেক দু'আ রয়েছে। তাই আমি চিন্তা করি যে, যখন আমি একটি বাগান চেয়ে নিব, যার মধ্যে গোলাপ, লেবু, নারাঙ্গী সব রয়েছে। তখন লেবু, নারাঙ্গী পৃথক পৃথক চাওয়ার দরকার কি?"
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৭৮)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً الخ

এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ দু'আ যে, এর মধ্যে কোন জিনিসই বাদ নেই। হে আল্লাহ! দুনিয়াতেও আমাকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। এই দু'আর মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত প্রয়োজন একত্রিত হয়েছে। তাই এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে চিঠিতে লিখে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে যখন আমি একটি বাগান চেয়ে নিলাম, যার মধ্যে গোলাপও আছে, লেবুও আছে, নারাঙ্গীও আছে। তখন পৃথক পৃথকভাবে গোলাপ, লেবু, নারাঙ্গী চাওয়ার প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যখন পূর্ণাঙ্গ এ দু'আ রয়েছে, যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের সব প্রয়োজনের কথাই এসেছে, তখন সব সময় এ দু'আই করতে থাকি। অন্যান্য দু'আর কি দরকার। যেমন, এরূপ দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! রিযিক দান করুন, সুস্থতা দান করুন, পয়সা দান করুন, জীবিকা দান করুন, ঋণ পরিশোধ করিয়ে দিন। পৃথক পৃথকভাবে এসব জিনিস চাওয়ার কি দরকার?

পৃথক পৃথকভাবে দু'আ করার মধ্যে অধিক বিনম্রতা রয়েছে

উত্তরে হযরত থানবী (রহ.) লিখেন যে–

> 'আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয় ও নম্রতা বিরাট জিনিস। অভিজ্ঞতা এই যে, বিশেষ বিশেষ জিনিস চাওয়ার মধ্যে অধিক বিনম্রতা রয়েছে। হাদীস শরীফে ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে দু'আ এসেছে।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৭৮)

রাসূল (সা.) প্রত্যেক জিনিস পৃথক পৃথকও চেয়েছেন

যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ করেছেন যে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সমস্ত কল্যাণ কামনা করি এবং সমস্ত অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

দেখুন! এই এক দু'আর মধ্যে সবকিছু চেয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি এই দু'আ করছেন যে, হে আল্লাহ! সুস্থতা দান করুন। হে আল্লাহ! পবিত্রতা দান করুন। হে আল্লাহ! আমানতদারী দান করুন। হে আল্লাহ! উত্তম আখলাক দান করুন। হে আল্লাহ! ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি দান করুন। এ সমস্ত জিনিস পৃথক পৃথকভাবে চাচ্ছেন। কারণ, প্রত্যেক জিনিস চাওয়ার স্বাদ ও তৃপ্তি আলাদা। ছোট ছোট জিনিস চাওয়ার মধ্যে একটি ভাব থাকে। যখন মানুষ নিজের নির্দিষ্ট প্রয়োজন চায়, তখন তা মন লাগিয়ে চায়। অধিক কেঁদে-কেটে এবং অধিক বিনম্রতার সাথে চায়।

দু'আর সংখ্যায় আধিক্য

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, মানুষ প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যতবার দু'আ করবে ততই দু'আর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেমন–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এই দু'আকেই যদি বার বার করার ইচ্ছা করে, তাহলে দু'বার করবে, তিনবার করবে, চারবার করবে বা দশবার করবে। পক্ষান্তরে মানুষের যত প্রয়োজন দেখা দেয়, সেগুলোর প্রত্যেকটির কথা চিন্তা করে করে যখন আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করবে– হে আল্লাহ! রুটি দিন, হে আল্লাহ! রিযিক দিন, হে আল্লাহ! কামাই দিন, হে আল্লাহ! আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিন, হে আল্লাহ! আমাকে যিকির করার তাওফীক দিন, হে আল্লাহ! আমাকে তেলাওয়াত করার তাওফীক দিন। যখন এভাবে প্রত্যেক জিনিসের জন্য পৃথক পৃথকভাবে দু'আ করবে, তখন দু'আর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যেক দু'আ পৃথক নেক আমল

যত অধিক দু'আ করবে, তত অধিক সওয়াব লেখা হবে। কারণ, প্রত্যেকটি দু'আ একটি পৃথক নেক আমল। প্রত্যেকটি দু'আ একটি পৃথক নেক কাজ। এজন্য অধিকহারে দু'আ করা উচিত। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বলেন যে, যদি জুতার ফিতাও ছিঁড়ে যায়, তাও আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়ে নাও। হে আল্লাহ! আমার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে আরেকটি ফিতা দান করুন। যাতে উদ্দেশ্যও লাভ হয় এবং সওয়াবও পাওয়া যায়। এজন্য শুধু ব্যাপক অর্থবোধক দু'আর উপর ক্ষান্ত থাকা ঠিক নয়।

বরং একেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ কর। আল্লাহ তাআলার দরবারে সংক্ষেপ, কাঙ্ক্ষিত নয়। সেখানে তো যত বিস্তারিত হবে ততই উত্তম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবিরাম দু'আ করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করুন। যখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে আরম্ভ করতেন, তখন অনেকগুলো দু'আ এক সঙ্গে যোগ করতেন। যেমন, তিনি একটি দু'আ এই করেন–

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

এই দু'আর একেকটি বাক্য যথাস্থানে ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একই দু'আর মধ্যে কয়েকটি বাক্য সংযোজন করেছেন। বাক্যগুলোর অর্থ এই–

'হে আল্লাহ! অধিক দান করুন এবং হ্রাস করবেন না। ইজ্জত দান করুন এবং অবমাননা থেকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে দান করুন এবং বঞ্চিত করবেন না। আমাদেরকে প্রাধান্য দিন, আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দিবেন না। আমাদেরকে খুশি করুন এবং আমাদের উপর খুশি হোন।'

অন্য এক দু'আয় তিনি বলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدَرِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী, সদাচরণ এবং ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।'

এমন কোন দু'আ নেই, যার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো জিনিস জমা করেননি। কারণ, দু'আ বিস্তারিত হওয়া কাঙ্ক্ষিত, সংক্ষিপ্ত হওয়া নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্কের বহি:প্রকাশ, আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার মধ্যে এবং খুব করে চাওয়ার মধ্যে রয়েছে। মোটকথা, দু'আর মধ্যে সংক্ষেপ পসন্দনীয় নয়। বরং বিস্তারিত দু'আ পসন্দনীয়। এর সাথে সাথে ব্যাপক অর্থবোধক দু'আও করা উচিত।

সকাল বেলার দু'আসমূহ

যেমন সকাল বেলা উঠে এই দু'আ করা উচিত এবং এ দু'আকে নিজের নিয়মিত আমলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

'হে আল্লাহ! আপনার তাওফীকেই আমার সকাল নসীব হয়েছে এবং আপনার তাওফীকেই সন্ধ্যা লাভ হয়েছে। আপনার কুদরতেই আমরা বেঁচে থাকি এবং আপনার কুদরতেই মৃত্যুবরণ করব এবং আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

এ দু'আও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ

'হে আল্লাহ! আমি আজকের দিনের কল্যাণ এবং তারপরের কল্যাণ আপনার কাছে কামনা করছি এবং আজকের দিনের অকল্যাণ এবং তারপরের অকল্যাণ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আজকের দিনের কল্যাণ, এর বিজয় ও সফলতা, এর নূর, এর বরকত এবং এর হিদায়েত প্রার্থনা করছি।

এ দু'আও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَاَوْسَطَهٗ فَلَاحًا وَاٰخِرَهٗ نَجَاحًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيْئُ بِهِ الرِّيَاحُ

'হে আল্লাহ! এই দিনের প্রথম অংশকে নেক, মাঝের অংশকে সফলতা এবং শেষ অংশকে কামিয়াবী বানান। ইয়া আরহামার রাহিমীন! আমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি ঐসব জিনিসের কল্যাণ কামনা করছি, যেগুলো বাতাস বয়ে আনে।'

ফজর নামাযের পর এসব দু'আ পড়। এগুলো ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ। এসব দু'আর মধ্যে সবকিছু এসে গেছে। সারা দিনের কল্যাণ এতে লাভ হয়েছে এবং সারা দিনের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় এতে লাভ হয়েছে। কিন্তু একথা চিন্তা করো না যে, আমি তো এসব দু'আ করেছি, এখন অন্য কোন দু'আ করার প্রয়োজন নেই। বরং সারা দিনে যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দিবে, তখন আবার দু'আ করবে। হে আল্লাহ! এটা দাও। হে আল্লাহ! এ প্রয়োজনও পুরা কর। আল্লাহর কাছে চাইতে থাক। অধিক দু'আর ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত

হয়। সমস্ত তাসাওউফ ও সুলূকের প্রাণ হল, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়া। মানুষ আল্লাহর কাছে যত দু'আ করবে, আল্লাহকে যত বেশি ডাকবে, আল্লাহ তাআলার সাথে ততই সম্পর্ক মজবুত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

রমযানের ইবাদতের জন্য শোকর আদায় করুন

যাইহোক, পবিত্র রমযান মাস এখন শেষ হচ্ছে। এই মুবারক মাসে যে সমস্ত আমলের তাওফীক হয়েছে, এর জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। তাঁর দয়া যে, তিনি আমাদেরকে এ সমস্ত ইবাদত করার তাওফীক দান করেছেন। অন্যথায় আমরা তো অধম থেকে অধম, অধিকতর অধম। কিন্তু তিনি তাওফীক দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে রোযা রাখার তাওফীক দিয়েছেন, তারাবীহ পড়ার তাওফীক দিয়েছেন, কুরআনুল কারীম তেলাওয়াতের তাওফীক দিয়েছেন। যখন তিনিই এসব ইবাদত করার তাওফীক দিয়েছেন, তখন অবশ্যই তিনি এসব আমল কবুলও করবেন। হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কখনোই বদগুমানী কর না যে, এ ইবাদত কবুল হবে না। আরে যখন তিনি আমলের তাওফীক দিয়েছেন, তখন ইনশাআল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

নিজের ত্রুটির জন্য ইস্তিগফার কর

এসব ইবাদতের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি হয়েছে, আরে ভাই! কতক্ষণ পর্যন্ত এসব ত্রুটির কথা চিন্তা করবে। তাঁর রহমতের কথা চিন্তা কর। তাঁর রহমতের তুলনায় তোমার ত্রুটির কি গুরুত্ব রয়েছে? যে সমস্ত ত্রুটি হয়েছে, এর জন্য ইস্তিগফার কর। হে আল্লাহ! এই ইবাদতে যে ত্রুটি হয়েছে, আমি তার জন্য ইস্তিগফার করছি।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

ইস্তিগফারের ফলে ঐ ত্রুটি দূর হয়ে যাবে।

আমরা বড় সৌভাগ্যবান

ঈদের নামাযের পর আমরা যখন হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.)-এর খেদমতে যেতাম, তখন তিনি এ পরিমাণ প্রফুল্ল থাকতেন, যেমন গোলাপ ফুল প্রস্ফুটিত থাকে। তখন তিনি বলতেন যে, আমরা সবাই বড় সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাআলার কাছে পরিপূর্ণ আশা রাখো, আমাদের সবাইকে

আল্লাহ্ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। আমরা সবাই এখন এমন অবস্থায় আছি, যেমন মাত্র মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়েছি। বরং আল্লাহ্ তাআলা আমাদের গোনাহ্সমূহকেও নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

রমযানের পরের জীবনকেও ঠিক রাখো

মোটকথা, আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া তাওফীকের জন্য শোকর কর। নিজের ত্রুটির জন্য ইস্তিগফার কর। আল্লাহ্ তাআলার রহমতের আশা রাখ। ইনশাআল্লাহ্ ঘাঁটি পার হয়ে যাবে। বাকি আল্লাহ্র হক আদায় করার প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত কেউই হক আদায় করতে পারেনি এবং আগামীতেও পারবে না। রমযানের দিনগুলো আশার দিন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রহমত দ্বারা এসব আশাকে বাস্তবায়িত করুন। রমযানের পরের জীবনকে আল্লাহ্ তাআলা ঠিক করে দিন। আমীন। এমন যেন না হয় যে, রমযানে তো সব ইবাদতই হলো, রোযার ইবাদতও হলো, তারাবীর ইবাদতও হলো, ই'তিকাফের ইবাদতও হলো, তেলাওয়াতের ইবাদতও হলো, আর যেই না ঈদের চাঁদ দেখা গেল সব ইবাদত ছুটে গেল। আবার সেই গোনাহ্ আর নাফরমানী। সেই জীবন আবারো শুরু হলো, যা রমযানের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এর জন্যও দু'আ করা উচিত যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন ভবিষ্যত জীবনকে ঠিক করে দেন এবং বাকী জীবন তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক কাটানোর তাওফীক দেন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইসলাহী মাজালিস

চতুর্থ খণ্ড

উনপঞ্চাশতম মজলিস

অনাহূত ভাবনা ও তার প্রতিকার

অনাহূত ভাবনা ও তার প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

'আনফাসে ঈসা' কিতাবখানা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এতে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং প্রত্যেক পরিচ্ছেদে বহু মালফূয (বাণী) সংকলিত হয়েছে। এজন্য কিতাবটি ব্যাখ্যা ও আলোচনাসহ আদ্যোপান্ত পাঠ করা কঠিন। তাই আমি নির্বাচিত কিছু অংশ পড়ব এবং ব্যাখ্যা করব। এতে প্রয়োজনীয় কথাগুলো আলোচনায় এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। আজ কিতাবের নতুন একটি পরিচ্ছেদ শুরু করছি। এটি 'ওয়াসওয়াসা' প্রসঙ্গে।

অনাহূত চিন্তা-ভাবনার চিকিৎসা হল ভ্রূক্ষেপ না করা

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> অনাহূত ভাবনার চিকিৎসা হল ভ্রূক্ষেপহীনতা। তবে একে শুধু উপায় মনে করবে না; বরং এটাই হল মূল কাজ। চাই এর দ্বারা ভাবনা দূর হোক বা না হোক। তদ্রূপ প্রশান্তি অর্জনকেও লক্ষ্য বানাবে না; বরং এই মানসিকতা পোষণ করবে যে, যদি জীবনভর এর চেয়েও কষ্টকর অবস্থা সহ্য করতে হয় তবুও আপত্তি নেই। এটাই প্রিয়ের দান। কেননা এটা গোনাহও না এবং নিজের ইচ্ছাধীনও নয়। অতএব এটা আল্লাহর নেয়ামত। মাঝে মাঝে এই পংক্তি পড়ুন–

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم درکش
کہ آنچہ ساقی ما ریخت عین الطاف ست

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৯০)

অবাঞ্ছিত চিন্তা থেকে কেউ মুক্ত নয়

উপরোক্ত মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) একটি ব্যাপক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। মানুষের মনে বিভিন্ন মন্দ ভাবনা আসে। কখনো কখনো এমন সব চিন্তা তার মনে উদয় হয় যে, ঈমান সম্পর্কেই সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। সম্ভবত এমন কোনো মানুষ নেই যার মনে এই ধরনের চিন্তা কখনোই আসে না। সবার মনেই তা আসে এবং এর কারণে মানুষ পেরেশান হয়। বিশেষত যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলার ইচ্ছা করেছে এবং চলতে আরম্ভ করেছে তার মনে এ ধরনের চিন্তা খুব বেশি আসে।

দ্বীনদার মানুষের মনে অবাঞ্ছিত চিন্তা বেশি সৃষ্টি হয়

দ্বীনদারীর দিকে যার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, সারা দিন দুনিয়াবী কাজকর্মে মগ্ন, গোনাহের কাজে লিপ্ত, এমন লোকের মনে এইসব চিন্তা আসে না। এগুলো তাদের মনেই আসে যারা আল্লাহর রাস্তায় চলতে আরম্ভ করেছে। কোনো কোনো চিন্তাতো এতই ভয়াবহ যে, মানুষ তার ঈমানের ব্যাপারেও আশঙ্কায় পড়ে যায়। কখনো আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে প্রশ্ন-সংশয় আসে, কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে, কখনো কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ সম্পর্কে, কখনোবা শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে। এ সময় সঠিক নির্দেশনা না পেলে গোমরাহীতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

ওই দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এ সমস্যার সমাধান হল ভ্রূক্ষেপহীনতা। মন্দ চিন্তা যদি আসে তবে আসুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এই চিন্তাই করবেন না যে, কী চিন্তা আসছে আর কী যাচ্ছে।

এইসব চিন্তাও ঈমানের আলামত

এখানে মনে রাখতে হবে যে, এইসব অবাঞ্ছিত চিন্তাও ঈমানের আলামত। হাদীস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক সময় আমার মনে এমন সব কথা আসে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াও আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমি কী করতে পারি? দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী জওয়াব দিলেন। তিনি বললেন—

ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

এটা তো খাঁটি ঈমানের আলামত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিল ওয়াসওয়াসা ফিল ঈমান)

অর্থাৎ, এইসব অবাঞ্ছিত চিন্তা তো ঈমানের চিহ্ন। কেননা এসব চিন্তা শুধু মুমিনের মনেই আসে, পাপাচারীর মনে আসে না।

চোর ঐ ঘরেই সিঁধ কাটে যাতে সম্পদ আছে

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) এই হাদীসেরই ব্যাখ্যা করে বলেন, চোর ওই গেরস্তের বাড়িতেই যায়, যার কাছে মাল-দৌলত আছে। যে ঘরে কিছু নেই সেখানে চোর কেন যাবে? এই চোর (শয়তান) ওই অন্তরেই কুমন্ত্রণা দেয় যাতে ঈমানের দৌলত আছে। অন্তরে যদি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না থাকত তাহলে শয়তানের সেখানে যাওয়ার ও কুমন্ত্রণা দেওয়ার প্রয়োজনই হত না। এজন্য এইসব অনাহূত চিন্তা যখন মনে আসে তখন প্রথম কর্তব্য হল আল্লাহর শোকরগুজারী করা যে, আলহামদু লিল্লাহ! আমার অন্তরে ঈমান আছে। তা না হলে এইসব চিন্তা আমার মনে সৃষ্টি হত না।

মন্দ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হওয়া ঈমানের আলামত

যখন আপনার মনে এইসব কথা আসে তখন আপনি উদ্বিগ্ন হন। এগুলো আপনার কাছে খারাপ বোধ হয়। অথচ অন্তরে যদি ঈমান না থাকত তাহলে আপনি উদ্বিগ্নও হতেন না এবং একে মন্দ বলেও মনে করতেন না। বোঝা গেল যে, অন্তরে ঈমানের দৌলত রয়েছে।

মন্দ চিন্তা কেন আসে

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا

إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ (سورة المجادلة : ١٠)

অর্থাৎ, শয়তানের পক্ষ থেকে যেসব মন্দ ভাবনা সৃষ্টি হয় এগুলো প্রকৃতপক্ষে শয়তানের কুমন্ত্রণা। এভাবে সে মুমিনদেরকে পেরেশানীতে ফেলতে চায়। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, এই কুমন্ত্রণা মুমিনদের চুল পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া।

এজন্য এইসব অনাহূত ভাবনা যখন আপনাকে বিরক্ত করে তখন স্মরণ করুন যে, এটা ঈমানের আলামত। শয়তান নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করছে। তাকে বলে দিন, ঠিক আছে তুমি নিজের মতো চেষ্টা কর, আমিও আমার মতো চেষ্টা করছি। এরপর নিজ কাজে মগ্ন হয়ে যান। অন্যদিকে এইসব অবাঞ্ছিত চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়ে কীভাবে তা দূর করা যায় এ চিন্তায় পড়ে গেলে আপনি এখানেই আটকা পড়ে যাবেন। সামনে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব হবে না। এভাবে শয়তানের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে।

একটি দৃষ্টান্ত

হযরত থানবী (রহ.) একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, ধর; কারো কাছে বাদশাহের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এসেছে যে, অমুক সময় দরবারে উপস্থিত হবে। তোমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হবে এবং পুরস্কৃত করা হবে। আমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে দুটি কুকুর রাস্তার দুই পার্শ্বে দাড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। এখন তার কী করা উচিত? যথাসময়ে দরবারে পৌঁছার জন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দ্রুত পথ চলা উচিত, না ওই কুকুরগুলোর চিৎকার বন্ধ করার চেষ্টায় লেগে যাওয়া উচিত? বুদ্ধিমানের কাজ কী হবে? যদি সে কুকুর তাড়ানোর জন্য সেগুলোর পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে তাহলে তো সময়মতো দরবারে পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এজন্য বুদ্ধিমানের কাজ এটাই যে, কুকুরগুলো চিৎকার করতে থাকুক, তুমি যেখানে যেতে মনস্থ করেছ সেখানে কীভাবে দ্রুত পৌঁছা যায় সেই চিন্তা কর। তুমি যদি কুকুরের চিৎকার থামানোর চিন্তায় পড়ে যাও তাহলে দরবারে পৌঁছার সুযোগ তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

একইভাবে তোমরা যে ইবাদত করছ এটা হল আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি। এই সৌভাগ্যের মুহূর্তে যেসব বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনা তোমার অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো হল কুকুরের চিৎকার। যদি তোমরা সেদিকে মনোযোগ দাও এবং তা দূর করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড় তাহলে শয়তানের উদ্দেশ্য হাসিল হবে আর তোমরা সাক্ষাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

নিজ কাজে মশগুল থাকুন

এজন্য এইসব বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনার সমাধান হল, ভ্রুক্ষেপ না করা। অর্থাৎ, কী চিন্তা আসল, কী গেল, প্রশ্ন কী আসল, কী গেল– এইসব চিন্তায় না পড়ে নিজের কাজে মশগুল থাকুন। যেমন এখন আপনার নামায পড়ার সময় আপনার মনে যে ভাবনাই আসুক আপনি নামাযে মশগুল হয়ে যান। আপনার এখন

তেলাওয়াতের সময়, মনে যত চিন্তা আসুক আপনি তেলাওয়াতে মশগুল হয়ে যান। এভাবে অন্য কোনো কাজের সময় হয়ে থাকলে তাতে লেগে যান। মোটকথা, এইসব চিন্তা-ভাবনাকে আপনার নির্ধারিত কাজে প্রতিবন্ধক হওয়ার সুযোগ দিবেন না। এটাই সমাধান। তা না করে আপনি যদি চিন্তা দূর করার পেছনে লেগে যান তাহলে সমস্যার সমাধান হবে না।

আরেকটি পদ্ধতি

আমার ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) বলতেন, যদি কোথায়ও অন্ধকার হয়ে আসে তবে তার সমাধান এই নয় যে, তুমি লাঠি নিয়ে অন্ধকার তাড়াতে নেমে পড়বে। কেননা এভাবে অন্ধকার দূর হবে না। অন্ধকার দূর করার পন্থা এই যে, তুমি একটি বাতি জ্বালিয়ে দাও। বাতির আলো যেখানে পৌঁছবে সেখান থেকে অন্ধকার বিদায় নিবে। মানুষের মনে যেসব কুচিন্তা, প্রশ্ন-সংশয় সৃষ্টি হয় সেগুলোও এক ধরনের অন্ধকার। একে তাড়ানোর চেষ্টায় লেগে যাওয়া এর সমাধান নয়। বরং তোমার মনে আল্লাহর স্মরণের বাতি জ্বালিয়ে দাও। বন্দেগী ও আনুগত্যের চেরাগ জ্বালাও। দেখবে, আঁধার দূর হয়ে গেছে।

অন্য চিন্তায় মগ্ন হোন

এ ধরনের চিন্তা যদি বেশি আসে তাহলে এর সমাধান হযরত থানবী (রহ.) এভাবে দিয়েছেন যে, এক্ষেত্রেও তা দূর করার চিন্তা ঠিক নয়। কেননা যতই দূর করার চেষ্টা করবে ততই তা জোরালো হবে। এজন্য এ সময় অন্য কাজে মনোনিবেশ কর কিংবা ভিন্ন চিন্তায় মশগুল হও। দর্শনশাস্ত্রে আছে–

اَلنَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ اِلٰى شَيْئَيْنِ فِىْ آنٍ وَاحِدٍ

মানুষের চিন্তা একই মুহূর্তে দুই বিষয়ে নিবদ্ধ হয় না।

এজন্য তুমি যদি নিজেকে ভিন্ন কাজে বা ভিন্ন বিষয়ে মশগুল কর তাহলে প্রথম চিন্তা এমনিই দূর হয়ে যাবে।

চিন্তা দূর করার কোনো অযীফা নেই

উপরের আলোচনায় হযরত থানভী (রহ.) এই কথাটাই বলেছেন যে, 'অনাহূত চিন্তা-ভাবনার সমাধান ভ্রূক্ষেপহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।' অর্থাৎ, এর অন্য কোনো সমাধান নেই। লোকেরা আবেদন করে যে, নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা মনে আসে। কোনো অযিফা দিন, যাতে এগুলো দূর হয়। হযরত বলছেন যে, এর কোনো অযীফা নেই। এর একমাত্র সমাধান হল চিন্তা তাড়ানোর চিন্তা না করা।

এই সমাধান নিছক ঔষধ নয়

এরপর একটি সূক্ষ্ম কথা বলা হয়েছে। তা এই যে, 'ভ্রূক্ষেপহীনতাকে নিছক মাধ্যম মনে করবে না, একেই মূল কাজ বলে মনে করবে। ভ্রূক্ষেপহীনতার দ্বারা চিন্তা-খেয়াল দূর হোক বা না হোক।' অর্থাৎ উপরে যে বলা হয়েছে ভ্রূক্ষেপহীনতাই চিন্তা দূর করার উপায়, এর অর্থ এই নয় যে, ভ্রূক্ষেপহীনতা ঔষধের মতো নিছক উপায় মাত্র। দেখুন, মানুষ যখন কোনো রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করে তখন তার মূল উদ্দেশ্য থাকে আরোগ্য লাভ করা। যেহেতু ঔষধ সেবন আরোগ্য লাভের উপায় তাই এর গুরুত্ব রয়েছে তবে সেটা আরোগ্য লাভের উপায় হিসেবেই। ঔষধ সেবন মূল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য তো আরোগ্য লাভ করা। এজন্য ঔষধ সেবনের পর মানুষ সুস্থতার অপেক্ষায় থাকে। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন ঔষধ সেবনের পরও যদি সুফল না আসে তাহলে মানুষ অন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়।

চিন্তা দূর করার সমাধান নিছক ঔষধ না

হযরত থানভী (রহ.) বলছেন যে, অনাহূত ভাবনা দূর করার জন্য যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা– এটাকে নিছক ঔষধ মনে করবে না। অর্থাৎ, এই ব্যবস্থা প্রয়োগের পর চিন্তা দূর হল কি হল না– এই অপেক্ষায় না থেকে নিজ কাজে মশগুল থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, এটা নিছক মাধ্যম নয়। এটাই মূল কাজ। অতএব একদিন, দুই দিন, তিন দিন এই পন্থা অনুসরণের পরও যদি দেখা যায়, অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না তবুও তা পরিত্যাগ করা যাবে না। অতএব জীবনভর অবাঞ্ছিত চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি না পেলেও এই পন্থা পরিত্যাগ করা যাবে না। চিন্তা আসুক, আপনি অন্য দিকে মনোযোগ দিন। আবার আসুক, আবার অন্য চিন্তায়, অন্য কাজে ব্যস্ত হোন। এটাই সমাধান এবং এটাই করণীয়।

প্রশান্তি লাভ উদ্দেশ্য নয়

এরপর হযরত থানভী (রহ.) আরেকটি সূক্ষ্ম কথা বলেছেন। তা এই যে, 'মানসিক প্রশান্তি লাভকে মূল লক্ষ্য বানাবে না'। অর্থাৎ, অবাঞ্ছিত ভাবনা দূর হোক– এটা আপনি কেন কামনা করছেন? মানসিক প্রশান্তির জন্য? সর্বদা এইসব চিন্তা আপনার মন-মস্তিষ্ককে অস্থির করে রাখে, তাই স্থিরতা ও প্রশান্তির জন্য এই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দরকার? এ সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.)-এর বক্তব্য এই যে, প্রশান্তি লাভকে উদ্দেশ্য বানানো যাবে না; বরং উদ্দেশ্য এই হবে যে, ওইসব অবাঞ্ছিত চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত করে প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ করা। যদি প্রশান্তি লাভই কাম্য হয় তবে তো মনের চাহিদা পূরণই উদ্দেশ্য হল।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন

ভ্রূক্ষেপ না করা সত্ত্বেও যদি চিন্তার উৎপাত বন্ধ না হয় তাহলে এই কষ্টের উপরই সন্তুষ্ট থাকুন। ভাবুন যে, আমার সম্পর্কে এটাই আল্লাহর ফয়সালা। এটাই আমার তাকদীর। আল্লাহ যদি চান যে, আমি জীবনভর এই অবস্থায় থাকি তবে তো আমার অসন্তুষ্ট হওয়ার উপায় নেই। এটাই আল্লাহর মর্জি, তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

نہ تو ہے ہجر اچھا نہ وصال اچھا ہے
یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے

না মিলন উত্তম না বিচ্ছেদ বরং প্রিয় যাতে সন্তুষ্ট তাই উত্তম।

আল্লাহ যে হালতে আমাকে রাখেন তাই আমার জন্য ভালো। অতএব ভাবনায় জর্জরিত হয়েও আমি খুশি।

بدرد وصاف ترا حکم نیست دم درکش
کہ آنچہ ساقی ما ریخت عین الطاف ست

অর্থাৎ, তোমার এই এখতিয়ার নেই যে, পরিবেশিত শরবত সম্পর্কে মন্তব্য কর– তা স্বচ্ছ কি ঘোলা। বরং সাকী তোমার পেয়ালায় যা দিয়েছে তাই তার করুণা।

তাৎপর্য বুঝে আসুক বা না আসুক, কারণ পরিষ্কার হোক বা না হোক আল্লাহ তোমার জন্য যা নির্বাচন করেছেন এটাই তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর মেহেরবাণী।

তোমার জন্য এটাই মুনাসিব

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, অমুকেরতো এই সমস্যা নেই। সে কত শান্তিতে আছে। অমুক শায়খের সঙ্গে তার সম্পর্ক! আর আমি এইসব অনাহূত চিন্তায় জর্জরিত। এই হালতের জন্য কি আমিই উপযুক্ত ছিলাম? অস্থিরতার অনলে আমাকেই জ্বলতে হবে কেন?

মনে রাখতে হবে যে, এটা ধৈর্যহীনতা। ভাই, তোমার সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে এটাই তোমার জন্য উপযোগী আর তার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা তার জন্য উপযোগী। এটাও তাঁর দান, ওইটাও তাঁর দান। তুমি যদি এই কষ্টের

উপর ধৈর্য ধারণ করতে পার তবে আল্লাহর কাছে তোমার মর্তবা কত উঁচু হবে তা কি তুমি কল্পনাও করতে পার? অতএব অন্যের দিকে তাকাবে না। তুমি যা পেয়েছ তাই তোমার অনেক বড় প্রাপ্তি।

আমার পেয়ালায় রয়েছে পানশালার সারাৎসার

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই ছাহেব আরেফী (রহ.) একটা পংক্তি পড়তেন–

مجھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی مئے
میرے پیمانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

অর্থাৎ, কে কী পেল, কতটা পেল তাতে আমার কী আসে যায়। আমার পেয়ালায় আল্লাহ যা দিয়েছেন আমার জন্য তো এটাই পানশালার সারবস্তু।

সবরের আলাদা সওয়াব রয়েছে

মোটকথা! নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। আর যেসব ভাবনায় আপনার ইখতিয়ার নেই তাতে মনোযোগ দেয়া থেকে বিরত থাকুন। আর ভাবুন যে, এই কষ্টটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এটা তারই ফায়সালা। অতএব আমি এতে সন্তুষ্ট। তাহলে এইসব চিন্তা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং সবর করার কারণে সওয়াব পাবেন এবং আল্লাহর কাছে আপনার মর্তবা বুলন্দ হবে। অতএব সুফলই সুফল, ক্ষতি কিছুমাত্রও নেই।

আপনি যখন ভাববেন যে, আল্লাহ আমার জন্য যা ফায়সালা করেছেন তাতেই আমি রাজি তখন রেযা বিল কাযার (আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার) সওয়াব আপনার আমলনামায় যুক্ত হবে। এছাড়া সবরের সওয়াবতো আছেই।

দুনিয়াতেতো কষ্ট হয়েই থাকে

দুনিয়াতে মানুষ যতই সাধ্য-সাধনা করুক, সে যদি বাদশাহ-আমীরও হয়ে যায় তবুও পূর্ণ শান্তি কেউ পূর্ণরূপে পায় না। কেননা দুনিয়া এমন শান্তির স্থানই নয়।

আল্লাহ তাআলা তিনটি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এক জগৎ যেখানে শুধু শান্তি আর শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-পেরেশানী কিছুই নেই। এটা হল জান্নাত। দ্বিতীয় জগৎ যেখানে শুধু অশান্তি আর অশান্তি; চিন্তা আর পেরেশানী। শান্তির লেশমাত্রও নেই। এই জগৎ জাহান্নাম। আর তৃতীয় জগৎ হল দুনিয়া, যাতে

আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। এতে শান্তি যেমন আছে অশান্তিও আছে। সুখের সঙ্গে দুঃখ আছে। এখানে কোনো আনন্দই নিরঙ্কুশ নয়। শান্তির উপমা যদি হয় ফুল তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিপদের কাঁটা। অতএব কেউ যদি কামনা করে আমি শুধু শান্তিই পেতে চাই, দুঃখ-কষ্ট যেন আমাকে স্পর্শও না করে, তবে তা কখনো পূরণ হবে না। বড় বড় শাসক-প্রশাসক, বিত্তশালী-ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী-গুণী, আলেম-ফাযেল যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাকে কি কখনো কষ্টে ভুগতে হয়েছে, তার পক্ষে না বলা কখনো সম্ভব হবে না। অবশ্যই কোনো না কোনো কষ্ট তাকে ভোগ করতেই হয়েছে।

অতএব দুনিয়াতে কষ্ট ভোগ করাই যখন সবার ভাগ্যলিপি তখন মানুষ ইচ্ছা করলে এই অবস্থায় সবরও করতে পারে, আবার অধৈর্য ও অস্থিরও হতে পারে। তবে বান্দা যদি আল্লাহর ফয়সালায় এই বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে যে, যে কষ্ট তাঁর পক্ষ থেকে এসেছে আমি তাতে রাজি। তাহলে সে আল্লাহ তাআলার শুভ সংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورة النحل : ١٠)

নিশ্চয়ই সবরকারীদেরকে দেওয়া হবে অগণিত বিনিময়।

এজন্য ‘রেযা বিল কাযা’র দ্বারা যে শান্তি পাওয়া যায় তা অন্য কোনোভাবেই পাওয়া যায় না।

হযরত বাহলুল মাজযূব-এর ঘটনা

হযরত বাহলুল মাজযুব (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন? তিনি বললেন, খুব ভালো আছি। অত্যন্ত শান্তিতে আছি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, কেমন শান্তি? তিনি বললেন, আরে ভাই, ওই লোকের শান্তির পরিমাপ কে করতে পারে– যার ইচ্ছার বিপরীতে কিছুই পৃথিবীতে হয় না। জগতের সকল বিষয়তো আমার ইচ্ছামাফিক ঘটছে। লোকেরা বলল, জনাব, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এমন কেউ আসেনি যার ইচ্ছেমাফিক সবকিছু হয়। এমনকি নবীগণেরও ইচ্ছা-বিরোধী অনেক কিছু ঘটেছে। আপনার এমন কী মাকাম হাসিল হয়ে গেল যে, আপনার ইচ্ছে বিরোধী কোনো কিছুই ঘটে না? তিনি বললেন, প্রকৃত বিষয় এই যে, আমি নিজের ইচ্ছাটাকে বিলীন করে দিয়েছি মাওলার ইচ্ছার মধ্যে। তাঁর যা ইচ্ছা সেটাই আমার ইচ্ছা। তিনি যাতে খুশি তাতেই আমি খুশি। আর যেহেতু বিশ্বজগতের কোনো কিছুই তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে হয় না তাহলে আমারও ইচ্ছার বিরোধী কোনো কিছুই নেই। আল্লাহ নিজ করুণায় সমর্পণের এই শান্তি আমাকে দান করেছেন।

'রেযা বিল কাযা'তে রয়েছে প্রশান্তি

মোটকথা! রেযা বিল কাযার চেয়ে বড় শান্তির উপায় আর নেই। এখন বান্দা আল্লাহর ফয়সালায় সমর্পিত হয়ে শান্তি লাভ করতে পারে কিংবা শান্তির অন্বেষায় জীবনভর ছটফট করতে পারে।

হযরত থানভী (রহ.)-এর উপরোক্ত মালফূযের সারকথা এই যে, মনোযোগ না দেওয়ার পরও যদি এইসব অনাহূত ভাবনা দূর না হয়; বরং আগের মতোই তা আসতে থাকে তাহলেও ভীত ও পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। তখন এই ভেবে হালতের উপর সন্তুষ্ট থাকবে যে, আল্লাহ যখন আমার জন্য এটাই পছন্দ করেছেন তো আমি তাতেই খুশী। তবে ওইসব চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে সঠিক ভাবে বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পঞ্চাশতম মজলিস

চিন্তা আসা ও চিন্তা করা

চিন্তা আসা ও চিন্তা করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

চিন্তাশীল মানুষের একাগ্রতা লাভ হয় না

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'চিন্তাশীল, বিশেষত তীক্ষ্ণ ধী শক্তিসম্পন্ন মানুষ একাগ্রতা লাভ করতে পারে না। কেননা, তার চিন্তা সর্বদা বিচরণশীল থাকে। এজন্য বিভিন্ন 'হালত'ও তার হাসিল হয় না।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৯০)

সাধারণত মেধাবী মানুষ, যারা প্রখর চিন্তাশক্তির অধিকারী তাদের না কাশফ-ইলহাম হয়, না অন্য কোনো হালত হয়। কেননা, কাশফ-ইলহাম বা এ জাতীয় হালতগুলো একাগ্রতা দাবি করে। অর্থাৎ, মানুষ যখন তার সমগ্র চিন্তাশক্তি শুধু একটি বিষয়ে নিবিষ্ট করে তখন এই হালতগুলো সৃষ্টি হয়। অথচ যারা মেধাবী ও চিন্তাশীল তাদের চিন্তা সর্বদা বিচরণশীল থাকে। আলেম হলে কোনো ইলমী মাসআলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, অন্য বিষয়ের পণ্ডিত হলে সে বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা তার চিন্তায় আনাগোনা করতে থাকে। অন্তত ব্যক্তিগত ও সাংসারিক কত বিষয় যে তার চিন্তায় বিচরণ করে তার ইয়ত্তা নেই। এজন্য তার মধ্যে একাগ্রতা থাকে না এবং এই সব হালতও সৃষ্টি হয় না।

একাগ্রতা অর্জনের প্রথম ধাপ

কাশফ-ইলহাম ও তাসাররুফ-এর মতো বিষয়গুলো মূলত আল্লাহপ্রদত্ত। তবে একটা পর্যায় পর্যন্ত সাধনার দ্বারাও অর্জিত হয়। অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের কল্পনাশক্তিতে একটা বিশেষ ক্ষমতা, অর্থাৎ, কোনো কিছুতে ক্রিয়া করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। অনুশীলনের একটি পদ্ধতি এই যে, রাতের বেলায় আকাশের দিকে তাকান। অসংখ্য তারকার মধ্যে থেকে একটি তারকা নির্দিষ্ট করে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন। একসময় চারপাশের সকল তারকা আপনার দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত হয়ে যাবে। আকাশে শুধু একটি তারকাই দৃষ্টিগোচর হবে। পরীক্ষা

করে দেখুন। একাগ্রতা অর্জনের এটা হল প্রথম সবক। এভাবে কোনো এক বস্তুর দিকে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করার অভ্যাস তৈরি করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

দৃষ্টির পর কল্পনাশক্তিকে আবদ্ধ করার সাধনা। চিন্তাকে অন্য সকল বিষয় থেকে সরিয়ে শুধু এক বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করা। এই সাধনায় সফল হলে মানুষের কল্পনাশক্তি একটা বিশেষ শক্তি ও প্রভাব অর্জন করে। পরিভাষায় একে 'তাসাররুফ' বলে। 'তাসাররুফ' কখনো কখনো 'কাশফ' পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে থাকে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

আমার ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) বলতেন, আমরা যখন হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে থানাভবন যেতাম তখন হযরত থানভী (রহ.) কোনো লেখার কাজে লাগিয়ে দিতেন। কখনো কোনো প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিতেন, কখনো ফতোয়া। ফলে খানকাহ্র অন্য লোকেরা যে পরিমাণে যিকির-আযকার করার সুযোগ পেত আমার পক্ষে তা হয়ে উঠত না। তখন দুঃখ হত যে, খানকাহ্র অন্য ভাইয়েরা যিকির-আযকারে মশগুল আছেন আর আমি লেখালেখিতে। হযরত মাওলানা অসীউল্লাহ্ সাহেব ইলাহী আবাদী (রহ.) একজন যাকের-শাগেল বুযুর্গ ছিলেন, সর্বদা যিকির-শোগলে মগ্ন থাকতেন। তখন ওয়ালিদ ছাহেব হযরত থানবী (রহ.)কে আক্ষেপ করে বললেন, হযরত, এই যে মাওলানা অসীউল্লাহ্ সাহেব আমার সহপাঠী, তিনি অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমি এতই অকর্মণ্য যে, কোনো কিছুরই তাওফীক আমার হয় না। এরপর এই পংক্তি আবৃত্তি করলেন–

ما و مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق

او بصحرا رفت و ما در کوچہا رسوا شدیم

আমি ও মজনু সহপাঠী ছিলাম ইশকের পাঠশালায়। অতঃপর সে বিজন বনে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আর আমি ব্যর্থ হলাম বসতির পথে পথে।

হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে বললেন, 'মিয়াঁ তুমি এ কেমন চিন্তায় পড়ে গেলে। আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কারো 'ছহরা' (প্রান্তর) লাভ হয়। আর কাউকে 'ছাহরা' (সৌভাগ্য) দান করা হয়।'

এক রাতেই ভ্রমণ সম্পন্ন হল

হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) বলতেন, একবার হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে আরজ করলাম, হযরত, আপনার সোহবতের বরকতে এইসব কাশফ-কারামত, ইলহাম-কাইফিয়াতের স্বরূপ বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় যে, এই পথেরও কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে ভালো হত। হযরত থানভী (রহ.) বললেন, এতে এমন কী মহার্ঘ্য বস্তু রয়েছে যা দেখতে হবে। তবে তুমি যখন চাচ্ছতো ঠিক আছে একদিন একটুখানি ভ্রমণ করিয়ে দিব। এরপর একদিন আমাকে একটি আমল দিয়ে বললেন, রাতে তাহাজ্জুদের পর এই আমল করবে। আমি তা করলাম এবং অনেক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম। যেমন আমি দেখলাম যে, গান্ধীর কর্তিত মুণ্ডু মাটিতে পড়ে আছে! অথচ সে সময় গান্ধী জীবিত এবং তখনও পাকিস্তানের জন্ম হয়নি। পরের দিন হযরতের সঙ্গে সাক্ষাত হলে হযরত বললেন, হাঁ ভাই, কেমন বেড়ালে? আমি বললাম, হযরত! এই এই দৃশ্য চোখে পড়েছে। হযরত থানভী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আরো বেড়ানোর ইচ্ছা আছে না এতেই চলবে? আমি বললাম, হযরত! যথেষ্ট হয়েছে।

হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) বলতেন, হযরত থানবী (রহ.) এক রাতেই ওই পথ ভ্রমণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই সময়টা আল্লাহর যিকিরে ব্যয় কর

মোটকথা! এই কাশফ-কাইফিয়ত, তাসাররুফ যেমন আল্লাহপ্রদত্ত বিষয় তেমনি তা সাধনার দ্বারাও অর্জন করা যায়। কিন্তু হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, মিয়াঁ, তুমি যে সময়টা এইসব কাজের পিছনে ব্যয় করবে– যেমন, কোনো তারকার দিকে বা কোনো গরু-গাভী বা অন্য কোনো বস্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যয় করবে, তা আল্লাহর যিকিরে ব্যয় করো। ওগুলোতো অর্থহীন কাজ, আখেরাতে যার এক কণাও ফায়দা নেই। খুব বেশি হলে বলতে পার যে, এগুলো সাধারণ 'মুবাহ' কাজের অন্তর্ভুক্ত যাতে নিষেধ নেই কিন্তু কোনো সওয়াব বা ফযীলতও নেই। এজন্য যে সময়টা এই কাজে ব্যয় করতে তা আল্লাহর যিকিরে ব্যয় কর। তুমি যদি একবার 'সুবহানাল্লাহ' বল তাহলে মিযানের অর্ধেক পাল্লা পূর্ণ হয়ে যাবে। তাহলে এইসব অর্থহীন কাজে নিজের মূল্যবান সময় কেন ব্যয় করবে?

যিকির মাকসূদ, একাগ্রতা মাকসূদ নয়

মোটকথা, এইসব হালত সাধনার দ্বারা অর্জন করা যায়। তবে তার জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। আর তীক্ষ্ণধী মানুষের চিন্তা যেহেতু এক বিষয়ে নিবদ্ধ

থাকে না তাই তাদের এইসব হালতও হয় না। হযরত থানবী (রহ.)কে কেউ যদি পত্র লিখত যে, হযরত! যিকির করি কিন্তু 'একসূয়ী' (একাগ্রতা) আসে না, তাহলে হযরত উত্তরে লিখতেন–

ذکر کرتے رہو، چاہے یکسوئی بقدر یک سوئی حاصل نہ ہو

একসূয়ী (একাগ্রতা) যদি এক সুঁই পরিমাণও হাসিল না হয় তবুও যিকির করতে থাক।

অর্থাৎ, একসূঁচ পরিমাণ একাগ্রতাও যদি না আসে তবুও যিকির অব্যাহত রাখবে। কেননা আল্লাহর যিকিরই মূল কাজ। এইসব হালত মূল উদ্দেশ্য নয়।

নামাযে বাহিনী বিন্যাস

হযরত ফারূকে আযম (রাযি.) বলেন–

إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

(بخاری : كتاب العمل في الصلاة، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة)

অর্থাৎ, নামাযের হালতে আমি বাহিনী প্রস্তুত করি। আমি নামাযে দাড়িয়েছি এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন তখন নামাযের হালতেই পরিকল্পনা করি– কীভাবে তা বিন্যস্ত হবে, কোন কাতার আগে থাকবে, কোন কাতার পিছনে, কে কাতারের কোন জায়গায় দণ্ডায়মান হবে ইত্যাদি।

এটা আমার-আপনার নামায নয়, ফারূকে আযম (রাযি.)-এর নামায। যাই হোক, যদি একাগ্রতা না থাকে তাহলে অধিক পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। ভাই, যেভাবেই সম্ভব হয় নামায পড়তে থাকুন। আমলে ত্রুটি করা থেকে এবং আমল পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো আমলকে ব্যর্থ ও অর্থহীন মনে করবেন না। যে আমলের তাওফীক হয় তাকে তুচ্ছ মনে করবেন না; বরং আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করুন যে, এই আমলের তাওফীক আল্লাহ দান করেছেন। যত শোকর করবেন তত বেশিই আমলের তাওফীক হবে।

আল্লাহর তাওফীকের দিকে দৃষ্টি রাখুন

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন যে, নিজের দিকে তাকিয়ো না; বরং আল্লাহ যে তাওফীক দিয়েছেন সেদিকে তাকাও। কত মানুষের এই আমলের তাওফীক হয়নি। এজন্য প্রথমে তাঁর শোকরগোজারী কর যে, আল্লাহ, আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে এই আমলের তাওফীক

দিয়েছেন। তোমরা যদি আমলের বেকদরী করতে থাক, যেমন নামায সম্পর্কে বললে, আমাদের নামায আর কী এটা তো ভূমিতে ঠোকর মারা ছাড়া আর কিছুই নয়! তাহলে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হবে। ভাই, এই কথাটা ভাব যে, আল্লাহ তোমাকে এই নিয়ামত দান করেছেন, অথচ তুমি তাকে তুচ্ছ মনে করছ, তাকে ঠোকর মারা বলে তাচ্ছিল্য করছ! আল্লাহ তাআলার দরবারে যে কপাল ঝুকানোর সুযোগ হয়েছে তা কি তোমার আমলের কারণে হয়েছে না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এটুকু করার তাওফীক দিয়েছেন? অতএব তাঁর শোকর আদায় কর, না-শোকরী করো না। তবে আমলে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

আমল কাম্য

বিভিন্ন হালত সৃষ্টি হওয়া, অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া, একাগ্রতা অর্জিত হওয়া, স্বাদ ও লয্যত অনুভূত হওয়া– এগুলো মাকসূদ নয়; বরং আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে পারা এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মোতাবেক কাজ করতে পারাই মাকসূদ ও পরম লক্ষ্য। সে আমলে মন বসুক বা না বসুক। সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকুন যেন আমলের মাঝে খুশু পয়দা হয়। বান্দার জন্য চেষ্টা করা ফরয, তবে চেষ্টায় সফল হওয়া ও খুশু হাসিল হওয়া ফরয নয়। অতএব চেষ্টা অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও যদি খুশূ-খুযু হাসিল না হয় তাহলে আপনি অপরাধী নন।

অনাহূত ভাবনা বিদ্যুতের তারের মতো

এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> শয়তান হল বিদ্যুতের তারের মতো। এতে কোনোভাবেই হাত লাগানো যাবে না। না ধরার উদ্দেশ্যে, না সরানোর উদ্দেশ্যে। অন্যথায় তা তোমাকে ধরে ফেলবে। বরং ওই দিকে মুখই ফেরাবে না। ভ্রূক্ষেপই করবে না। এটাই হল ওইসব চিন্তা-ভাবনার সমাধান, যা শয়তানের পক্ষ থেকে এসে থাকে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৯০)

দেখুন, রাস্তায় একটি বিদ্যুতের তার পড়ে আছে, যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। কোনো পথিক যদি মনে করে, এই তারটা আমার পথরোধ করে আছে, এটাকে সরিয়ে দেই। এই ভেবে সে তা স্পর্শ করে তবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়বে। অতএব সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেও বিদ্যুতের তার ছোঁয়া যাবে না; বরং পথের অন্য পাশ দিয়ে হেটে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমান পথিকের কাজ। শয়তানের পক্ষ

থেকে যেসব ভাবনা মানুষের মনে সৃষ্টি হয় তার অবস্থাও এই। এগুলোকে মনে স্থান দেওয়ারও চিন্তা করবেন না, তাড়ানোরও চেষ্টা করবেন না। বরং এগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজ কাজে মগ্ন থাকুন কিংবা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। এভাবে পাশ কাটিয়ে নিজ গন্তব্যের দিকে চলতে থাকুন। এটাই সমাধান। এছাড়া আর কোনো সমাধান নেই।

ভাবনা এলো না আনা হল

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (রহ.)কে পত্র লিখলেন–

> 'কখনো কখনো এমন হয় যে, ভাবনা নিজে আসছে না আমি আনছি তা স্থির করতে পারি না। কীভাবে এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য করব সে মানদণ্ডটা জানতে চাই।'

উত্তরে হযরত লিখলেন–

> 'মানদণ্ডের প্রয়োজন নেই। যখন আসা ও আনার মধ্যে সন্দেহ হচ্ছে তখন প্রথম পর্যায়টি (অর্থাৎ আসা) নিশ্চিত। (আর পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ ইচ্ছা করে চিন্তা-ভাবনা করা সন্দেহযুক্ত।) তো "اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ" সংশয়ের কারণে ইয়াকীন বাতিল হয় না– এই নীতি অনুযায়ী একে 'আসা'ই ধরে নিতে হবে।' (আনফাসে ঈসা. পৃষ্ঠা ৯০)

ইচ্ছা করে চিন্তা-ভাবনা করা নিষেধ

এখানে মূল কথা এই যে, অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা নিজে নিজে আসলে তা দোষের নয়। কিন্তু ইচ্ছা করে ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন হওয়া দোষের। যেমন আপনি নামায পড়ছেন, নামাযের বাইরের কোনো চিন্তা ইচ্ছা করে শুরু করেননি, অনিচ্ছাকৃত-ভাবেই এগুলো আপনার মনে উদয় হচ্ছে, কিন্তু আপনি নামাযের সূরা-কেরাতের দিকে ধ্যান রেখেছেন তাহলে এটা দোষণীয় নয়। নামাযের হালতে ইচ্ছা করে অন্য চিন্তা করা নিষেধ। এই মাসআলা হযরত থানভী (রহ.) অনেক স্থানে বয়ান করেছেন যে, চিন্তা আসা নিষেধ নয়, চিন্তা করা নিষেধ। কেউ যদি তাঁকে বলত, হযরত, নামাযে মন বসে না। তাহলে তিনি জওয়াব দিতেন যে, 'নামাযে মন বসানো ফরয, মন বসা ফরয নয়।' অর্থাৎ মনোযোগের সঙ্গে নামায পড়ার চেষ্টা করা বান্দার উপর ফরয। কিন্তু এই চেষ্টায় সফল হওয়া এবং মনোযোগ সৃষ্টি হওয়া ফরয নয়। অতএব নিবিষ্ট মনে নামায আদায়ের চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি চিন্তা-ভাবনা আসতে থাকে তাহলে তা অপরাধ নয়।

এইসব ভাবনা নিজে নিজে এসেছে

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো কোনো ভাবনার ক্ষেত্রে সংশয় জাগে যে, এটা কি নিজে নিজে এসেছে না আমি ইচ্ছা করে এনেছি। এ বিষয়টা কীভাবে বুঝব? মানদণ্ড কী হবে? উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) বললেন, মানদণ্ডের প্রয়োজন নেই। যখন নিজে নিজে চিন্তা আসা এবং ইচ্ছা করে চিন্তা আনা– এ দুটোর মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হল তখন জানা কথা যে, উভয় অবস্থায় চিন্তা আসাটা নিশ্চিত– নিজে নিজে আসুক বা ব্যক্তি ইচ্ছা করে আনুক। অতএব "اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ" 'সংশয় দ্বারা প্রত্যয় বাতিল হয় না।' নীতি অনুযায়ী একে আসাই ধরে নিতে হবে।

সারকথা হল যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আমি ইচ্ছা করে ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন হয়েছি তাহলে তা পরিহার করুন এবং ইস্তিগফার করুন। আর যদি জানা যায় যে, এটা নিজে নিজে এসেছে তবে এর জন্য বেশি দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। ইনশাআল্লাহ এর কারণে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আর যেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় যে, এই চিন্তা নিজে এসেছে না এটা আমার অন্যমনস্কতা সেক্ষেত্রে তা নিজে এসেছে বলেই ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ, এই কারণে বেশি পেরেশান হওয়া উচিত নয়।

নিজের কাজে মগ্ন থাকুন

আমরা প্রায়ই চিন্তা করি যে, নামাযের হালতে আমাদের মনে কত রকম ভাবনা আসে, আমাদের নামায কি কবুল হবে? এই চিন্তাটা ভালো তবে এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, যে কাজ আমাদের সাধ্যের ভিতরে তা করা আমাদের জন্য অপরিহার্য এবং কীভাবে তা করা যায় এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও কর্তব্য। এ বিষয়ে উদাসীন থাকা উচিত নয়। কুরআন মাজীদে যেমন নামায পড়ার বিধান এসেছে তেমনি নামাযে খুশূ সৃষ্টিরও আদেশ এসেছে। ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (سورة المؤمنون :١-٢)

নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ সফল হয়েছে। যারা তাদের নামাযে বিনয়-নম্র (অর্থাৎ, খুশূ অবলম্বন করে)।

এই আয়াতগুলোতে ফালাহ ও সফলতাকে শুধু সালাতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। সালাতের সঙ্গে 'খুশূ'রও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অতএব 'খুশূ' গুরুত্বহীন বিষয় নয়। সাধ্যমতো 'খুশূ' অর্জনের চেষ্টা করা অপরিহার্য। নামাযে

কিয়াম যেমন ফরয, রুকূ-সিজদা যেমন ফরয তেমনি খুশূও ফরয। আর তা অর্জনের চেষ্টা করাও জরুরি।

কোন পর্যায়ের খুশূ কাম্য

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই চেষ্টা কীভাবে করা হবে? এ বিষয়ে লোকেরা প্রান্তিকতার শিকার। 'খুশূ' শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)কে মনে পড়ে, খাজা মুঈনুদ্দীন আজমীরী (রহ.)কে মনে পড়ে। আমরা ভাবতে থাকি, তাদের মতো 'খুশূ' অর্জন করা চাই। তারা যখন নামাযে দাড়াতেন, মনে হত একটি কাষ্ঠখণ্ড। সমগ্র হৃদয় আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট। ভিন্ন কোনো চিন্তাই মনে আসে না। আরে ভাই, এত সুদূরে উড্ডয়নের চিন্তা পরিহার করে নিজ সাধ্যের (সীমার) ভিতরেই থাকুন এবং এর মধ্যে থেকেই খুশূ অর্জনের চিন্তা করুন।

কখনো আমরা হযরত আবু তালহা (রাযি.)-এর কথা ভাবি। নামাযের মধ্যে একটি পাখির দিকে তার মনোযোগ চলে গিয়েছিল। ঘন বাগানে এমনভাবে পাখিটি আটকা পড়ে গিয়েছিল যে, বের হওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না। নামাযের পরে তার খুব দুঃখ হল এবং গোটা বাগান আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলেন।

নিজের সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করুন

আরে ভাই! কোথায় হযরত আবু তালহা (রাযি.) আর কোথায় আমরা। এখন লোকেরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে আরো নিরাশ হয়ে যায়। তারা ভাবে, আমরা কি ওই মাকামে পৌঁছতে পারব। আমরা কি খুশূ-খুযু অর্জন করতে পারব? ফলে যে পরিমাণ খুশূ অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল তা-ও আর অর্জন করার চেষ্টা করে না।

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, বড় বড় বুযুর্গানে দ্বীনের এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই পড়বে যাতে তোমাদের হিম্মত বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তবে এটা ভেবো না যে, ওই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছা তোমাদের জন্য ফরয। তোমরা নিজেদের সামর্থ্যের দিকে তাকাও এবং যতটুকু সম্ভব করতে থাক।

ইবরাহীম ইবনে আদহামের মতো যাহিদ হওয়ার চিন্তা

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর জীবনীতে আছে যে, তিনি তার গোটা রাজত্ব ছেড়ে পথে বের হয়ে গেলেন। শুধু একটি বালিশ ও একটি পেয়ালা তার সঙ্গে ছিল। কিছু দূর গিয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি হাতের অঞ্জলি দিয়ে পানি পান করছে তখন তিনি পেয়ালাটি অপ্রয়োজনীয় মনে করে দূরে নিক্ষেপ করলেন। আরো কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলেন, এক লোক মাথায় ইট দিয়ে ঘুমোচ্ছে তখন

তিনি বালিশটিও দূরে ছুড়ে ফেললেন। এখন আমরা যদি এই ঘটনা শুনে চিন্তা করি যে, এটাই নাজাতের পথ, তাহলে আমাদের বারোটা বেজে যাবে। হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই পড়বে তবে উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার অসারতা অনুধাবন করা এবং উপদেশ গ্রহণ করা। এটা ভেবো না যে, তোমাদের জন্যও সেটাই করণীয় এবং ওই পথ অবলম্বন করা ছাড়া তোমরা নাজাত পাবে না। তোমাদের মুক্তির উপায় তা-ই যা তোমাদের সাধ্যের ভিতরে।

ঐ পর্যায়ের 'খুশূ'র কথা চিন্তা করো না

মোটকথা, যে পর্যায়ের খুশূ হযরত আবু তালহা (রাযি.)-এর ছিল, যে পর্যায়ের 'খুশূ' সাহাবায়ে কেরামের ছিল, সীনায় তীর বিদ্ধ হচ্ছে কিন্তু নামায জারি রয়েছে, তদ্রূপ যে পর্যায়ের খুশূ ওলী-আল্লাহ ও বুযুর্গানে দ্বীনের ছিল, যদি তা আমাদের না থাকে তাহলেও নিরাশ হওয়া উচিত নয় বরং নিজ করণীয়টুকু করতে থাকা উচিত।

পঠিত বাক্যগুলোর দিকে মনোযোগ দিন

প্রশ্ন এই যে, যে কাজ আমাদের প্রত্যেকের সামর্থ্যের ভিতরে রয়েছে তা কী? তা এই যে, নামাযে যে বাক্যগুলো পড়া হচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দিন। যেমন যখন পড়া হল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তো সেদিকেই ধ্যান রাখুন। আপনি যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলছেন তা আপনার জানা থাকা উচিত। এটুকু যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী 'খুশূ' হাসিল হল। এমন যেন না হয় যে, নামাযের নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর যেন একটি সুইচ অন হয়ে গেল এবং একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিন চলতে থাকল- কখন কী করা হল, কোথায় কী পড়া হল কিছুই জানা নেই, এভাবেই সম্পূর্ণ অমনোযোগিতার সঙ্গে নামায শেষ হয়ে গেল। নামায শেষ হওয়ার পর মনেও আসছে না যে, প্রথম রাকাতে কোন সূরা পড়া হয়েছিল, দ্বিতীয় রাকাতে কোন সূরা। এই অবস্থাটা খুশূর পরিপন্থী। খুশূ হল যে বাক্যগুলো নামাযে পড়া হচ্ছে তার দিকে চিন্তাকে নিবদ্ধ রাখা। এটুকু সম্ভব হলে খুশূ হাসিল হল।

চিন্তাকে ফিরিয়ে আনুন

আপনি মনোযোগ সহকারে নামায আরম্ভ করলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পড়া পর্যন্ত মনোযোগ কেরাতের দিকে ছিল। এরপর অন্য কোনো চিন্তার উদয় হল। এ অবস্থায় مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ পড়া হয়ে গেল। এটা 'খুশূ'র পরিপন্থী নয়। এই অনিচ্ছাকৃত চিন্তার কারণে ধ্যান ছুটে যাওয়ায় আপনাকে অপরাধী করা হবে না। তবে শর্ত এই যে, খেয়াল হওয়ামাত্রই কেরাতের দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে হবে। অতএব اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ পড়ার সময় যদি খেয়াল হয় যে, আমি অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম তাহলে এখন পুনরায় মনোযোগ দিন। এভাবে যদি নামায সমাপ্ত করা হয় তাহলে খুশূর সঙ্গে নামায আদায় হল। তবে মনে রাখতে হবে যে, ইচ্ছা করে ভিন্ন চিন্তায় মগ্ন হওয়া যাবে না।

ইচ্ছা করে চিন্তা করার অর্থ

ইচ্ছা করে চিন্তা করার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরুন ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার হাতে সময় নেই, তাই ভাবলেন, নামাযের মধ্যেই এটা সেরে নিব। নামাযে দাড়ানোর পর আপনি ওই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এটা নাজায়েয ও হারাম। কেননা, আপনি ইচ্ছা করে অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়েছেন, যা জায়েয নয়।

দ্বীনী বিষয়ে চিন্তা করা জায়েয

তবে এখানে একটি প্রয়োজনীয় কথা পেশ করছি। আগেই বলা হয়েছে যে, নামাযে এমন চিন্তা-ভাবনা করা জায়েয নয়, যা সম্পূর্ণ দুনিয়াবী। তবে দ্বীনী বিষয়ে চিন্তা করা জায়েয। যেমন কোনো আলেম নামাযে কোনো মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করলেন। ইচ্ছা করেই তিনি ওই চিন্তা আরম্ভ করেছেন। হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, এটা নাজায়েয নয়। কেননা, নামাযে আল্লাহ ভিন্ন অন্য চিন্তা নিষেধ। তাই আল্লাহর জন্যই যেসব চিন্তা তা ওই নিষিদ্ধ চিন্তার অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-এর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন–

إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

(بخارى. كتاب العمل في الصلاة، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة)

আমি নামাযে সৈন্যবাহিনীর পরিকল্পনা তৈরি করি।

তাঁর এই কাজও উপরোক্ত মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এটা জিহাদের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের অংশ, যার উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। এজন্য এটা গায়রুল্লাহর চিন্তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

নামাযে মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করা

এই নীতি অনুযায়ী আলেমের জন্য নামাযে মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা জায়েয। তবে না করাই ভালো। কেননা, প্রত্যেক কাজেরই একটা সময় আছে। তাই চেষ্টা করা উচিত, নামাযে অন্য কোনো চিন্তা না করার। যে ইবাদত শুরু করেছি তাতেই মনোযোগী হওয়া কাম্য কিন্তু কখনও যদি সময় স্বল্পতা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজন হয়ে যায় তাহলে গোনাহ হবে না।

ইমাম গাযালী (রহ.) ও তাঁর ভাইয়ের ঘটনা

ইমাম গাযালী (রহ.) অনেক বড় সুফী ছিলেন। একই সঙ্গে বড় আলেম ও ফকীহও ছিলেন। তাঁর ভাই ছিলেন আহমদ গাযালী। ইমাম গাযালী (রহ.)-এর মূল নাম মুহাম্মাদ। তাঁর পূর্ববর্তী দশ পুরুষ পর্যন্ত সকলের নামই ছিল মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-গাযালী। ইমাম গাযালী (রহ.) শরীয়ত-তরীকত দু' বিষয়েরই পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাই ছিলেন সুফী। শরীয়তের ইলমের দিকে মনোযোগ কম ছিল। ইমাম গাযালী (রহ.) নামায পড়াতেন কিন্তু ভাই তার পিছনে নামায পড়তেন না। একদিন মা বললেন, তুমি কেন ভাইয়ের পিছনে নামায পড় না? আহমদ গাযালী বললেন, এই আর কি, আমি আলাদাই পড়ি। মা সহজে ছাড়লেন না। বললেন, না, তুমি তার পিছনেই নামায পড়বে। তখন বাধ্য হয়ে আহমদ গাযালী ইমাম গাযালীর পিছনে ইকতেদা করে নামাযে শামিল হলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর নামায ছেড়ে চলে গেলেন। মা জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কেমন কাজ হল? তিনি বললেন, আমি তাঁর পিছনে নামায পড়তে পারি না। সে নামাযের মধ্যেও হায়েয-নেফাসের মাসআলা চিন্তা করে। মা-ও সাধারণ মহিলা ছিলেন না, ইমাম গাযালীর মা ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা! সে যদি নামাযে হায়েয-নেফাসের মাসআলা চিন্তা করে তবে শরীয়তের মাসআলা নিয়ে চিন্তা করছে। এটাও তো আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে তুমি নামাযে দাঁড়িয়ে অন্যের দোষ তালাশ করছো। তুমি তো হারাম কাজে লিপ্ত হলে। এবার বল, কার চিন্তা ভালো আর কার চিন্তা মন্দ। আহমদ গাযালী নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

সারকথা

কেউ যদি নামাযে দাড়িয়ে দ্বীনী বিষয়ে চিন্তা করে তবে এটা জায়েয। যদি দ্বীনী বিষয় না হয় তাহলে ইচ্ছা করে চিন্তা করা নাজায়েয। অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে এসে গেলে অপরাধ নয়। নামাযীর কর্তব্য হল আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করার পর যবানে উচ্চারিত বাক্যগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া। মাঝে মনোযোগ ছুটে গেলে পুনরায় মনোযোগী হওয়া। আবার ছুটে গেলে আবার মনোযোগ ফিরিয়ে আনা। এভাবে বারবার করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ অভ্যাস হয়ে যাবে। এরপর অনিচ্ছাকৃত চিন্তাও কম আসবে। আর এলেও তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে অবাঞ্ছিত চিন্তা-ভাবনা থেকে হেফাযত করুন এবং এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

একান্নতম মজলিস

উজব ও তার চিকিৎসা

উজব ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

বিগত কয়েক দিন 'তাকাববুর' সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আলহামদু লিল্লাহ! এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে 'তাকাব্বুর' থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন। সামনে হযরত মাওলানা ঈসা (রহ.) যে শিরোনাম দিয়েছেন তা হচ্ছে 'উজব'। এই শিরোনামের অধীনেও হযরত থানবী (রহ.)-এর মালফূযাত উল্লেখ করেছেন।

তাসাওউফ ও তরীকত-এর পরিভাষায় তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে : ১. উজব। ২. কিব্র। ৩. তাকাববুর। বাহ্যত এক মনে হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

উজব-এর সংজ্ঞা

সবার আগে মানুষের মধ্যে 'উজব' পয়দা হয়। আর তা শেষ হয় 'তাকাববুরে'। 'উজব' অর্থ নিজের কোনো বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভালো মনে করতে থাকা এবং এটা যে আল্লাহর দান তা ভুলে যাওয়া। যেমন একজন আলেমের মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি হল যে, আমি তো আলেম আর এ কারণে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভালো মনে করতে লাগল। এই ইলম যে আল্লাহর দান তা তার মনে রইল না। এই অনুভূতির সঙ্গে অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যুক্ত হোক বা না হোক এটা উজবের মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ, নিজের কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্য আল্লাহর অনুগ্রহ না ভেবে স্মরণ করাকেই উজব বলে। অতএব, 'উজব'-এর মধ্যে অন্য ব্যক্তির প্রসঙ্গ নেই। নিজের গুণপনা চিন্তার মধ্যেই বিষয়টা সীমাবদ্ধ।

'উজব', 'কিব্র' ও 'তাকাববুর'-এর মধ্যে পার্থক্য

উজবের কারণে মানুষের মনে 'কিব্র' পয়দা হয়। কিবর অর্থ নিজেকে বড় মনে করা। উজবের ক্ষেত্রে নিজের গুণপনার দিকে নজর থাকে আর 'কিব্র'-এ

বড়ত্বের দিকে। এখানে তুলনার প্রসঙ্গ এসে যায়। অতএব অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করা 'কিব্‌র'। অতঃপর এই অনুভূতির কারণে অন্যের উপর বড়ত্ব ফলানো 'তাকাব্বুর'। যেমন কথায় বা কাজে অহংকার প্রকাশ করা, অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং অন্যের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের আচরণ করা। এইগুলো 'তাকাব্বুর' এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ বিষয় 'ইস্তিকবার'

এরপর চতুর্থ পর্যায়, যা কুরআন মজীদের ভাষায় 'ইস্তিকবার'। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষ 'তাকাব্বুর' এর কারণে অন্যকে তাচ্ছিল্য করতে থাকে তখন এক পর্যায়ে তার অবস্থা এই হয় যে, সে কাউকে কিছুই মনে করে না এবং বেপরোয়া ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। এমনকি অন্যায়-অবিচারের ব্যাপারেও দ্বিধাবোধ করে না। এটা 'ইস্তিকবার'। কুরআন মজীদ এই শব্দটা ব্যবহার করেছে ফিরাউন ও এ জাতীয় জালেমদের জন্য। ইস্তিকবারের কারণে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি বিমুখতা ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

উজব এর চিকিৎসা

উপরের আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, সর্বপ্রথম মানুষের মনে উজব সৃষ্টি হয়। এরপর তা বৃদ্ধি পেয়ে কিব্‌র, তাকাব্বুর ও ইস্তিকবারে পরিণত হয়। এজন্য প্রাথমিক অবস্থাতেই এর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে হযরত (রহ.) বলেন :

> 'আমলে দুইটি দিক রয়েছে : এক. আমলকারীর যোগ্যতা। আমলকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত নয়। দুই. আল্লাহ তাআলার দান। এই কথা ভেবে আনন্দিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–
>
> "قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا"
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬২)

ইলমকে আল্লাহর দান মনে করুন

কেউ যদি তার কোনো আমলকে নিজের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য মনে করে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ মনে না করে তবে এটা উজব ও গোনাহ। আর যদি একে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে এবং এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, আমার

আল্লাহ আমাকে এই কাজের তাওফীক দান করেছেন তো এই আনন্দ প্রশংসনীয়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا (سورة يونس : ٥٨)

'বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার দয়ায়। অতএব তারা যেন এতে আনন্দিত হয়।'

বান্দার চিন্তা করার বিষয় এই যে, আমার তো কোনো যোগ্যতা ছিল না, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ করে সে আনন্দিত হচ্ছে। এই আনন্দ তো উজব-কিবর নয়ই; বরং তা প্রশংসনীয় ও কর্তব্য। কেননা, উপরোক্ত আয়াতে এই আদেশ করা হয়েছে।

নেক আমলে আনন্দিত হওয়া ঈমানের আলামত

এক হাদীসে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ

'নেক আমলের দ্বারা যদি তোমার মনে আনন্দ হয় এবং বদ আমলের কারণে দুঃখ হয় তাহলে এটা মুমিন হওয়ার আলামত।'

অতএব নামায আদায় করার পর যদি নামাযীর মন আনন্দিত হয় এবং সে বলে, ইয়া আল্লাহ! আপনার শোকর, আপনি আমাকে নামায পড়ার তাওফীক দিয়েছেন তাহলে এতে কোনো দোষ নেই; এটা ঈমানের আলামত। তদ্রূপ রোযা রাখার পর যদি রোযাদারের মন আনন্দিত হয় যে, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা রোযা রাখার তাওফীক দিয়েছেন! ইতিকাফ করার সুযোগ হল এবং আনন্দচিত্তে ভাবল যে, আল্লাহ তাআলা ইতিকাফ করার তাওফীক দিয়েছেন তাহলে এতে দোষের কিছু নেই। এই আনন্দ প্রশংসনীয়।

এই আনন্দ হল নগদ সুসংবাদ

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখন আমি কোনো ভালো কাজ করি তখন আমার আনন্দ হয়। (আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এটা কি উজব (আত্মশ্লাঘার) অন্তর্ভুক্ত কিনা) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ذٰلِكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

'এই আনন্দ মুমিনের জন্য উপস্থিত সুসংবাদ।'

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এটা সে উপস্থিত পুরস্কার পেল। তাকে আল্লাহ তাআলা আনন্দ দান করলেন। এটা 'উজব' বা 'তাকাববুর' নয়। যে পর্যন্ত এই আমলকে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করবে সে পর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই। যেমন এক সাহাবী বলেছেন–

لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا - وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'যদি আল্লাহ তাআলার দেয়া তাওফীক না হত তাহলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না– না আমরা হেদায়েত পেতাম, না সদকা-নামায আদায় করতাম।' অতএব এই নেক আমলকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ মনে করুন। এতে যদি মনে আনন্দ আসে দোষ নেই। অন্যদিকে একে যদি নিজের কৃতিত্ব মনে করা হয় এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া হয় আর অন্যের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকানো হয় তাহলে এটা এমন এক গর্বিত উল্লাস যাকে কুরআন মজীদ "لَاتَفْرَحْ" (উল্লসিত হইও না) বলে নিষিদ্ধ করেছে।

নির্দোষ আনন্দ ও নিষিদ্ধ উল্লাস

ইতিপূর্বে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

"فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا"

এই আয়াতে আনন্দিত হওয়ার আদেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে لَا تَفْرَحْ ও বলা হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, এক ধরনের খুশি অনুমোদিত ও কাম্য এবং আরেক ধরনের খুশি নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়। ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আল্লাহর তাওফীক ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে আনন্দিত হওয়া প্রশংসনীয় আর একে নিজের যোগ্যতা মনে করে উল্লসিত হওয়া নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়। এটা হল অহংকার। ইসলামের দৃষ্টিতে যা হারাম।

পার্থক্য বোঝার জন্য শায়খের প্রয়োজন

কিন্তু মানুষ সকল ক্ষেত্রে এই দুই খুশির মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এর জন্য শায়খ ও চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। তিনি বলে দেন এটা নির্দোষ, অতএব চিন্তার কারণ নেই। যেমন ওই সাহাবীর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমি কি আত্মগর্বের শিকার হয়ে পড়েছি? আমার মনে যে আনন্দ হচ্ছে তা নির্দোষ আনন্দ

না নিষিদ্ধ আনন্দ? তিনি তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিলেন যে, ""ذٰلِكَ عَاجِلُ بُشْرٰى الْمُؤْمِنِ" অর্থাৎ এটা নির্দোষ আনন্দ। অতএব ভয়ের কিছু নেই। সাহাবী আশ্বস্ত হলেন যে, আলহামদু লিল্লাহ! এই আনন্দ অপরাধ নয়। যদি এটা আত্মিক কোনো রোগ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চিকিৎসা করতেন।

একটি ভুল ধারণা

শায়খের শরণাপন্ন হওয়ার মূল প্রয়োজনটা এখানেই। কিন্তু আজকাল লোকেরা মনে করে যে, শায়খ ধরার উদ্দেশ্য হল অযীফা চাওয়া, স্বপ্ন দেখলে তার তাবীর জিজ্ঞাসা করা, ঋণ আদায়ের দুআ, রুজি-রোজগারে উন্নতির দুআ, রিযিক বৃদ্ধির দুআ ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা। তারা এগুলোকেই শায়খের কাজ মনে করে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এইসব তাদবীর নিয়ে মগ্ন থাকে। একেই তারা মনে করে 'পীর-মুরীদী'।

মনে রাখবেন, পীর-মুরীদীর সঙ্গে এইসব বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। তাবীজ-তুমার, দুআ-কালাম, অযীফা-তাবীর এগুলো শায়খের কাজ নয়। শায়খের কাছ থেকে জানার বিষয় এই যে, আমল করার দ্বারা আমার অন্তরে যে আনন্দ জেগেছে এটা কোন ধরনের আনন্দ– নির্দোষ না নিষিদ্ধ? এটা কি উজব ও গোনাহের অন্তর্ভুক্ত? অর্ন্তজগতের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে শায়খের কাছ থেকে জেনে তার নির্দেশনা মোতাবেক আমল করবে। পীর-মুরীদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই। অথচ আজকাল এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানতে চাওয়া হয় না, অযীফা ও যিকির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

আল্লাহর তাওফীকের উপর শোকর করা উচিত

সামনে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'আমলকারীর করণীয় এই যে, কৃত আমলকে নিজের যোগ্যতা মনে করবে না; বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ মনে করে শোকরগোজারী করবে। এভাবে চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার দ্বারা কাজ করিয়েছেন, নতুবা আমার কী শক্তি ছিল।

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی

منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

বাদশাহের কাজ করছ বলে মনে করো না তুমি বাদশাহর
প্রতি অনুগ্রহ করেছ; বরং তারই অনুগ্রহ যে, তোমাকে কাজে
নিযুক্ত করা হয়েছে। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬২)

এজন্য যে কাজেরই সুযোগ হচ্ছে যেমন ইবাদত-বন্দেগী, জনসেবা, কোনো ইলমী কাজ, ওয়ায-তাবলীগ-ফতোয়া, রচনা বা অধ্যাপনা, মোটকথা! যে খেদমতেই নিয়োজিত থাকার সুযোগ হয়েছে একে নিজের যোগ্যতা মনে করবে না; বরং আল্লাহ তাআলার তাওফীক ও অনুগ্রহ মনে করে শোকর আদায় করবে। নতুবা এমন কত মানুষ রয়েছে, কাজের খোঁজে যাদের জুতার সুখতলা ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমার এমন কী বিশেষত্ব ছিল, যার দ্বারা আমি এই কাজের সুযোগ লাভ করি? মানুষ যখন এভাবে চিন্তা করে তখন তার মনে 'উজব', 'তাকাব্বুর' পয়দা হতে পারে না।

منت منه که خدمت سلطان همی کنی
منت شناس ازو که بخدمت بداشتت

তুমি কীভাবে অবদান ফলাও যে, অমুক খেদমত আঞ্জাম দিয়েছি, এমন তাকরীর করেছি, অমুক ফতোয়া লিখেছি, অমুক কিতাব রচনা করেছি, এটাতো আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমার দ্বারা এই কাজগুলো করিয়েছেন। কত লোক আছে যাদের তাওফীক হয় না এমন কাজ করার অথচ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। এটা কি অহংকারের বিষয়? অন্যের উপর বড়ত্ব ফলানোর বিষয়? এটা তো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অনুগ্রহ। এজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় কর।

তদ্রূপ কোনো ইবাদত আদায় করেছ– নামায পড়েছ, রোযা রেখেছ, ইতিকাফ করেছ, তারাবীহ পড়েছ, তেলাওয়াত করেছ, যিকির করেছ, এইসব ইবাদতের কারণে গর্ব কেন কর? অনুগ্রহ কেন ফলাও? এটা তো তাঁরই অনুগ্রহ যিনি ইবাদতের তাওফীক দিয়েছেন। এজন্য গর্ব নয়, বিনম্র চিত্তে শোকরগুজারী কর।

শোকরগুজারীর কারণে আরো তাওফীক হবে

শোকরগুজারীর আরেকটি দিক এই যে, যে ইবাদতের সুযোগ হয়েছে তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। এটা অকৃতজ্ঞতা। বরং আল্লাহ তাআলার শোকরগুজারী করবে। আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করে বিনম্র চিত্তে শোকরগুজারী করবে। আল্লাহ যদি তাওফীক না দিতেন তাহলে না জানি আমার অবস্থা কী হত। এভাবে কৃতার্থ চিত্তে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করলে না উজব পয়দা হবে, না 'তাকাব্বুর'।

উপরন্তু শোকরগুজারীর কারণে আল্লাহ তাআলা আরো ইবাদতের, আরো বেশি ভালো কাজের তাওফীক দান করবেন।

শোকরগুজারী কলন্দরী কর্ম

তবে এর জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। এজন্য যখনই কোনো নেক আমলের সুযোগ হয় আল্লাহর শোকরগুজারী করুন। আমাদের শায়খ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, কিছু আমল এমন রয়েছে যেগুলো কলন্দরী আমল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে শোকরগুজারী। অর্থাৎ, এটা এমন এক আমল যা দেখতে বড় কিছু নয়। আপনি মনে মনে বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! কে জানল আপনি কী করলেন? কিংবা বললেন, اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ কেউ তো জানতেও পারল না আপনি কী করলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কত কী ঘটে গেল। আপনার মর্তবা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেল! অথচ চারপাশের লোকেরা কিছুই টের পেল না।

میان عاشق و معشوق رمزیست - کراما کاتبین را ہم خبر نیست

আশেক-মাশুকের মধ্যে হয় ইঙ্গিত বিনিময়
কিরামান কাতিবীনও যা অবগত নয়।

শোকর আদায়ের অনুশীলন করুন

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, 'সর্বদা শোকরগুজারীর মাধ্যমে যবানকে তাজা রাখবে। যেমন গরম লাগছিল, হঠাৎ একটুখানি শীতল বাতাসের পরশ লাগল, বল, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ ওয়া লাকাশ শোকর। ঘরে প্রবেশ করেছ, শিশু সন্তানকে খেলতে দেখে মনে আনন্দ হল, বল, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ ওয়া লাকাশ শোকর। ক্ষুধা পেয়েছিল, খাবার সামনে এসেছে, বল, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ ওয়া লাকাশ শোকর। মনে মনে বলতে থাক। এভাবে অভ্যাস কর, যেন সর্বদা আল্লাহ তাআলা কোনো না কোনো নেয়ামতের উপর শোকরগুজারী হতে থাকে। বারবার অনুশীলন কর। অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন এমন হবে যে, তুমি যখন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত তখনও অন্তর আল্লাহর শোকরগুজারীতে মশগুল। আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) এই পংক্তি বলতেন–

جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکشی میں
کوئی آساں ہے کیا خوگر آزار ہو جانا

অর্থাৎ, বছরের পর বছর মশক করেছি যেন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কোনো না কোনো নেয়ামতের শোকরগুজারীতে মশগুল থাকি। লোকের অগোচরে খালেক ও মালেকের সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক সর্বদা বহাল থাকে।

শোকর মন্দ প্রবণতার শিকড় কেটে দেয়

শোকর এমনই মহৌষধ, যা অসংখ্য দোষের মূলোৎপাটন করে এবং অসংখ্য গুণের বীজ বপন করে। এজন্য শোকরগুজারীতে অভ্যস্ত হোন। এটা কলন্দরী আমল। এর জন্য অনেক রিয়াযত-মুজাহাদার প্রয়োজন হয় না। খুবই সহজ ও সংক্ষিপ্ত আমল। সারা দিনের সকল কাজে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করুন। যেমন মসজিদ থেকে বের হয়েছেন, দরজায় জুতাটা পেয়ে গেলেন বলুন, 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ ওয়া লাকাশ শোকর'। কারো সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন, সাক্ষাত হয়ে গেল তো মনে মনে বলুন, 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদ ওয়া লাকাশ শোকর। এভাবে যে কোনো উদ্দেশ্য সফল হল, তা যতই ছোট হোক, আল্লাহ তাআলার শোকরগুজারীর অভ্যাস করুন।

লোকেরা এই আমলের মূল্য বোঝে না। মনে করে, খুব সামান্য আমল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা এক মহৌষধ। আমল করে দেখুন। মানুষ যখন এর উপর আমল করবে তখন 'উজব' ও 'তাকাব্বুর' কাছেও আসবে না। শয়তানও জানত যে, যে বান্দা শোকরগুজারী করে সে কখনো আমার কব্জায় আসবে না। এজন্যই সে বলেছিল–

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ (سورة الاعراف : ١٧)

'তাদের অধিকাংশকেই আপনার শোকরগুজার পাবেন না।'

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাকে এবং আপনাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বায়ান্নতম মজলিস

ক্রোধ ও তার চিকিৎসা

ক্রোধ ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

ক্রোধ সকল রোগের উৎস

রমযানুল মুবারকে কয়েক বছর ধরে যোহরের নামাযের পরে হযরত থানবী (রহ.)-এর কিতাব 'আনফাসে ঈসা' পড়ার নিয়ম চলে আসছে। বর্তমানে তার রাযাইল অর্থাৎ, রিপু ও মন্দ প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা চলছে। এখানে ক্রোধের আলোচনা শুরু হয়েছে। ক্রোধ মানব স্বভাবের একটি মন্দ প্রবণতা। অনেক সুফী একে বলেছেন সকল মন্দের মূল। অর্থাৎ, ক্রোধ একটি মন্দ প্রবণতাই নয় তা অসংখ্য মন্দের জনক। অসংখ্য গোনাহের মধ্যে মানুষকে লিপ্ত করে। যেমন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মানুষ গালি-গালাজ শুরু করে, অশালীন বাক্য ব্যবহার করে। কখনো মারপিট করে এবং সীমা অতিক্রম করে যায়।

ক্রোধের সঙ্গী অন্যান্য মন্দ প্রবণতা

মানুষ অন্যের উপর কখন ক্রুদ্ধ হয়? যখন সে নিজেকে বড় মনে করে। কেননা নিজেকে ছোট মনে করলে কেউ কখনো ক্রুদ্ধ হয় না। এজন্য ক্রোধের সঙ্গে 'কিবর' ও 'উজব'ও বিদ্যমান থাকে। কখনো এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'বিদ্বেষ'। মোটকথা! ক্রোধ এমন এক উৎস যেখান থেকে অসংখ্য আত্মিক ব্যাধি জন্মলাভ করে। আমাদের পূর্বসূরী সুফিয়ায়ে কেরামের কাছে কেউ তার অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য গেলে তাঁরা সর্বপ্রথম ক্রোধের চিকিৎসা করতেন।

দু'টি স্বভাবগত বিষয়

মানুষের স্বভাবের দু'টি মৌলিক প্রবণতা রয়েছে : এক. ক্রোধ। দুই. ক্ষুধা। ক্ষুধা দুই ধরনের : খাদ্যের ক্ষুধা এবং যৌনক্ষুধা। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই দুইটি প্রবণতাই সকল পাপের মূল। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম সবার আগে ক্রোধের চিকিৎসা করতেন। কেননা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মানুষ যে কত গোনাহ ও নাফরমানীতে পতিত হবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

সংক্ষিপ্ত নসীহত প্রার্থনা

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন [illegible]লেন– "وَاوجِز [illegible]" আমাকে সংক্ষেপে কিছু নসীহত করুন। লক্ষ্য করুন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে বিরক্ত হননি। একথা বলেননি যে, প্রার্থনা করছ আবার শর্তও আরোপ করে দিচ্ছ। এ থেকে বোঝা যায় নসীহত প্রার্থনাকারী যদি বলে, আমাকে সংক্ষিপ্ত নসীহত করুন, তবে নারাজ হওয়ার কিছু নেই। এটা তার হক। কেননা হতে পারে যে আপনার কাছে নসীহত চেয়েছে, এখন তার হাতে লম্বা সময় নেই। তাকে সফরে যেতে হবে কিংবা তার অন্য কোনো তাড়া আছে। কিন্তু আপনি আড়াই ঘণ্টার বয়ান করে দিলেন। এটা কি উচিত হবে? অবস্থা এই দাড়াবে যে, আগ্রহ নিয়ে নসীহত প্রার্থনা করে শেষে মুসীবতে পড়ে গেল। সে আপনার নসীহত কতটুকুই বা শুনবে, আর কতটুকুই বা বুঝবে আর কতটুকুই বা আমল করবে। এজন্য নসীহতকারীর কর্তব্য হল, শ্রোতার অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা। উপরোক্ত হাদীসেতো শ্রোতা বলেই দিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সংক্ষিপ্ত নসীহত করুন।

রাগান্বিত হয়ো না

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নসীহত করলেন– "لَا تَغْضَبْ" 'রাগান্বিত হয়ো না।' এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ক্রোধ অসংখ্য মন্দের উৎস। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকেই নির্বাচন করেছেন। অথচ তিনি বলতে পারতেন, মিথ্যা বলো না, গীবত করো না, যিনা করো না, চুরি করো না, কিন্তু এই সকল বিষয় ছেড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়ো না। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা অত্যন্ত মন্দ বিষয় এবং আরো অনেক মন্দের এটা উৎস। একে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অনেক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

ক্রোধের প্রয়োজনও আছে

কখনো কখনো ক্রোধের প্রয়োজনও হয়। ক্রোধ যদি একেবারেই না থাকে তাহলে মানুষের বেঁচে থাকাই দায় হয়ে যাবে। যেমন কোনো শত্রু, কোনো হিংস্র প্রাণী আপনার উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হল। এখন যদি আপনার মধ্যে ক্রোধ না আসে; বরং পড়ে পড়ে মার খেতে থাকেন তাহলে আপনাকে মরেই যেতে হবে।

এক সাহেবের গল্প

আমার ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) একটা গল্প বলতেন। এক সাহেব ছিলেন বড় পদমর্যাদার অধিকারী। সব কাজ চাকর-বাকর দিয়ে করাতেন। নিজে কোনো কাজ করতেন না। একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতে পেলেন যে, তার ঘরে কীভাবে যেন কতগুলো বাঁদর ঢুকেছে। এক বাঁদর তার সুট নিয়ে চলে গেল, আরেক বাঁদর পাতলুন নিয়ে রওয়ানা হল। তৃতীয়টা হ্যাট নিয়ে গেলো। সাহেব বিছানায় শুয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, আরে ভাই, কোনো মানুষ আছে, যে এই বাঁদরগুলোকে তাড়াবে! ইতিমধ্যে তার এক বন্ধু ঘরে ঢুকে চেঁচামেচি শুনে বলল, আরে মানুষ মানুষ করে চেঁচাচ্ছ, তুমি কি মানুষ নও? সাহেব বললেন, তাই তো, কথাটা তো মনেই ছিল না। সাহেব তখন বিছানা থেকে নেমে বাঁদরের পিছনে ছুটলেন। কিন্তু ততক্ষণে সুট-হ্যাট-পাতলুন নিয়ে বাঁদরগুলো সব হাওয়া।

বুঝা গেলো এভাবে পড়ে পড়ে নিজের ক্ষতি দেখতে থাকাও স্বাভাবিক নয়। মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য এই যে, কেউ তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সে মোকাবেলা করবে এবং ক্রুদ্ধ হবে। অতএব সব ক্ষেত্রে ক্রোধ মন্দ নয়।

ক্রোধ ইবাদতও বটে

সঠিক ও উপযোগী ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তা ইবাদত বলেও গণ্য হয়ে যায়। যেমন কোনো কুলাঙ্গার যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করে– নাউযুবিল্লাহ– আর মুসলমান এ সময়ও ক্রুদ্ধ না হয় তবে এর চেয়ে বড় হীনতা আর কী হতে পারে? এ অবস্থায় ক্রোধই ইবাদত। তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে ক্রুদ্ধ হওয়া সঠিক ও উত্তম; বরং ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আবার ক্ষেত্র বিশেষে অনুত্তম ও অনুচিত; বরং নিষিদ্ধ ও হারাম।

সাধক প্রথমত ক্রোধ বর্জন করবে

কেউ যখন তারবিয়াতের জন্য কোনো শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করে তখন শায়েখ তাকে বলে থাকেন, আপাতত তুমি একদম ক্রুদ্ধ হবে না। কেননা তুমি পার্থক্য করতে পারবে না যে, কোথায় ক্রুদ্ধ হওয়া সঠিক আর কোথায় সঠিক নয়। অতএব, তুমি এখন ক্রুদ্ধ না হওয়ার অভ্যাস করতে থাক। একেই 'মুজাহাদা' বলে। অর্থাৎ, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য বৈধ বিষয়ও পরিত্যাগ করা। একেই মুজাহাদা বলে।

নফ্ছকে বিপরীত দিকে ভাঁজ কর

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী (রহ.) দৃষ্টান্ত দিতেন যে, একটি ভাঁজ করা কাগজকে সোজা করতে চাইলে তাকে বিপরীত দিকে আরেকটি ভাঁজ দিতে হবে। বিপরীত দিকে ভাঁজ না করে সোজা করার চেষ্টা করলে তা সোজা হবে না। তদ্রূপ আমাদের নফ্সও গোনাহর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাকে সাধারণভাবে সোজা করতে চাইলে সে সোজা হয় না। এজন্য তাকে বিপরীত দিকে ভাজ করতে হয়। অর্থাৎ, কিছু বৈধ কাজও তার জন্য নিষিদ্ধ করে দাও। তখন এর মধ্যে ভারসাম্য আসবে। একেই মুজাহাদা বলে। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, প্রথম দিকে পুরোপুরি ক্রোধ বর্জন কর। তাহলে ধীরে ধীরে তা তোমার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। এরপর যখন তা প্রয়োগ করবে তখন তা যথার্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে, ভুল কিংবা অপাত্রে প্রয়োগ হবে না।

এরপর হযরত থানভী (রহ.) ক্রোধের কিছু চিকিৎসা বলেছেন। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ তা আলোচনা করছি।

প্রথম চিকিৎসা : নিজের দোষ-ত্রুটি স্মরণ করুন

হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'কষ্ট করে হলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো ভাবতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস পাবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭০)

কেউ হযরত থানভী (রহ.)কে পত্র লিখেছিলেন যে, আমার মধ্যে ক্রোধ খুব বেশি। সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। হযরত থানভী (রহ.) সমাধান দেন যে, যখন ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন কষ্ট করে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করে নিজের দোষ-ত্রুটি ভাবতে থাকুন। কেননা মানুষের উত্তেজিত হওয়ার পিছনে কিছুটা হলেও 'উজব' অর্থাৎ, আত্মগরিমা কার্যকর থাকে। যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে তাকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করে বলেই ক্রোধ জাগছে। এর চিকিৎসা হল, নিজের দোষ-ত্রুটি ভাবতে থাকা। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) নির্দেশনা দিলেন, এ সময় নিজের দোষ-ত্রুটি ভাবতে থাকুন। এ কথাটাও ভাবতে ভুলবেন না যে, রাগান্বিত হওয়াও আমার একটা দোষ। আমি ভালো মানুষ হলে এত তীব্র ক্রোধ আমার মধ্যে থাকত না। এভাবে নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করলে রাগ কমে যাবে। তবে এর জন্য নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কেননা, যার এই বোধই নেই যে, কী পরিমাণ রাগান্বিত হচ্ছি, কী ধরনের কথাবার্তা আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে এবং কী ধরনের আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে তার এই ব্যাধি তো জটিল ও দূরারোগ্য।

মোটকথা, চিকিৎসার প্রথম পদ্ধতি হল, নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ইসলাহের ফিকির করা। যখন মানুষের মনে ইসলাহ ও সংশোধনের চিন্তা আসে তখন চিকিৎসা ফলদায়ক হয়। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, যখন ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন নিজের দোষ-ত্রুটি ভাবতে থাক। ইনশাআল্লাহ রাগ কমে যাবে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা : যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাকে দূরে সরিয়ে দিন

দ্বিতীয় চিকিৎসা বলেছেন যে,

> 'যার ওপর রাগ হয়, তৎক্ষণাৎ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে কিংবা তাকে দূরে সরিয়ে দিবে, যেমন সুযোগ হয়।' (প্রাগুক্ত)

ক্রোধের বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ যার উপর ক্রুদ্ধ হয় তার কাছে যেতে চায়। এতে ক্রোধ আরো তীব্র হয়। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছ তার কাছ থেকে হয়তো নিজে সরে যাও কিংবা তাকে সামনে থেকে সরিয়ে দাও। কেননা তার উপস্থিতি ক্রোধকে তীব্র করবে।

হুযূর (সা.) নিজেও এই চিকিৎসা করেছেন

স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে চিকিৎসা করেছেন। হযরত ওয়াহশী (রাযি.), যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রাযি.)কে হত্যা করেছিলেন, পরে আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সামনে বসবে না। কেননা, তুমি সামনে থাকলে হযরত হামযা (রাযি.)-এর স্মৃতি আমার মনে জেগে ওঠে। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, যার প্রতি রাগ আসে তাকে সামনে থেকে সরিয়ে দাও।

ক্রুদ্ধ অবস্থায় শাস্তি দিবে না

অধীন কারো প্রতি যদি যুক্তিসঙ্গত কারণেও রাগ আসে তাহলে রাগান্বিত অবস্থায় তাকে তিরস্কার করা ও শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, এ অবস্থায় নিজেকে সীমার ভিতরে রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য বিচারের বিষয়টা আপাতত স্থগিত করুন এবং ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর তাকে ডেকে তার ভুল ধরিয়ে দিন। তিরস্কারের প্রয়োজন হলে এখন তিরস্কারও করতে পারেন। যেহেতু ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে তাই এখন তিরস্কার নিয়মের ভেতরে থাকবে।

অন্য দিকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় শাস্তি-তিরস্কার দিতে গেলে নিয়মের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয় চিকিৎসা : আল্লাহর আযাবকে স্মরণ করুন

ক্রোধের তৃতীয় চিকিৎসা হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, 'আল্লাহর আযাবকে স্মরণ করুন।' এই চিকিৎসাও হাদীস শরীফে এসেছে। একবার হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) নিজের গোলামকে ভর্ৎসনা করছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দেখে বললেন–

"لَلّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"

অর্থাৎ, এই গোলামের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তোমার উপর আল্লাহর রয়েছে। তুমি এই গোলামকে শাস্তি দিচ্ছ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তোমার অবস্থা কী হবে?

আল্লাহ তাআলার আযাবকে স্মরণ করলে রাগ প্রশমিত হয়, ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস পায়। এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'নিজের গোনাহ স্মরণ করে অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করতে থাকুন।' এটা প্রথম চিকিৎসারই অংশ। অর্থাৎ, নিজের ভুল-ত্রুটি স্মরণ করা ও ইস্তিগফার করা।

মোটকথা! হযরত থানভী (রহ.) এখানে ক্রোধের তিনটি চিকিৎসা বয়ান করেছেন। কেউ যদি তা অনুসরণ করে তবে ইনশাআল্লাহ ক্রোধ তার ক্ষতি করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তেপ্পান্নতম মজলিস

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করো না

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাজ করো না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

একজন লোক হযরত থানবী (রহ.)কে চিঠি লিখলেন যে,

'কেউ যদি আপনার সমালোচনা করে তাহলে আমার সারা শরীরে আগুন ধরে যায়।'

জওয়াবে হযরত থানভী (রহ.) লিখলেন,

'তথাপি প্রতিশোধের দিকে অগ্রসর হবেন না, এমনকি মৌখিকভাবেও না।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭০)

অর্থাৎ, ক্রোধ আসুক, কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবেন না। এমনকি মৌখিকভাবেও প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করবেন না।

ক্ষমা করা উত্তম

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাগান্বিত হওয়ার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হওয়া জায়েয ও মুবাহ। যেমন ন্যায়সঙ্গতভাবে বদলা নেওয়া। (তবে তারবিয়াতের জন্য এবং মাত্রাজ্ঞান ঠিক না থাকার আশঙ্কা হলে জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই মুজাহাদা করানো হয় যে, বৈধ মাত্রার বদলাও নিবে না। অর্থাৎ, কোনো অবস্থাতেই ক্রোধ চরিতার্থ করবে না, যদিও ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয।) তবে সর্বাবস্থায় ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ (سورة آل عمران : ٣٤)

'তারা এমন যে, নেক কাজে সম্পদ ব্যয় করে সকল অবস্থায়— সচ্ছলতার সময়ও, অস্বচ্ছলতার সময়েও এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে।'

তাই ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে খুবই পছন্দনীয়। এর ফযীলত অনেক। এজন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সাধকদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা

প্রতিশোধ নিও না; বরং সবর কর এবং কেউ যদি তোমাদের উপর অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা কর। তাহলে তোমরা সবরেরও সওয়াব পাবে, ক্ষমা করারও সওয়াব পাবে।

চিন্তা ও স্বভাবের বিচিত্রতা

হযরত থানবী (রহ.) 'আরওয়াহে ছালাছা'তে একটি ঘটনা লিখেছেন। এক লোক তার শায়খকে বলল, হযরত! আমি শুনেছি যে, সুফী-ওলীদের নীতি ও স্বভাব বিভিন্ন ধরনের হয়। আমি এটা একটু দেখতে চাই। শায়খ প্রথমে বললেন, এইসব চিন্তা বাদ দাও। এগুলো কি কোনো কাজের কথা? নিজের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাক। কিন্তু সে বারবার আবদার করতে লাগল, আমি একটু দেখতে চাই। শায়খ বললেন, দিল্লীতে কুতুব সাহেবের মাযার আছে। তার কাছেই একটি ছোট মসজিদ। সেখানে গেলে দেখবে তিনজন মানুষ আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছেন। তুমি তাদের প্রত্যেকের কোমরে একটি করে ঘুষি মারবে। এরপর যা কিছু ঘটে আমাকে এসে জানাবে।

সে ওই মসজিদে গেল। সেখানে তিনজন মানুষ আল্লাহর যিকিরে মশগুল রয়েছেন। সে প্রথমে একজনের কোমরে একটা ঘুষি দিল। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপই করলেন না। পূর্বের মতোই যিকিরে মশগুল থাকলেন। এবার দ্বিতীয় ব্যক্তির কোমরে ঘুষি দিল। তিনি যিকির বন্ধ করে উঠে এসে তাকেও একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন এবং পুনরায় যিকিরে মশগুল হয়ে গেলেন। তৃতীয় ব্যক্তিকে ঘুষি দিলে তিনি উঠে এসে তার হাত ধরে বলতে লাগলেন, হাতে ব্যথা পাওনি তো ভাই!

প্রতিশোধের চিন্তায় সময় নষ্ট করব কেন

মুরীদ শায়খের কাছে ফিরে এসে বলল, বড় আশ্চর্য বিষয় দেখলাম। প্রথম ব্যক্তিকে ঘুষি দেওয়ার পর তিনি আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। শায়খ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কী করছিলেন? সে বলল, যিকির করছিলেন। শায়খ বললেন, তিনি ভেবেছেন যে, যে আমাকে ঘুষি মেরেছে সে তো মেরেই দিয়েছে। ব্যথা যা পাওয়ার তা তো পেয়েছিই। এখন প্রতিশোধ নিয়ে এবং তাকে কষ্ট দিয়ে নিজের সময় কেন নষ্ট করব। যে সময়টা প্রতিশোধ নিতে ব্যয় হবে তা যদি আল্লাহর যিকিরে লাগাই তাহলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। এজন্য তিনি তোমার দিকে ভ্রূক্ষেপই করেননি। পূর্বের মতোই যিকিরে মগ্ন ছিলেন।

সমান বদলা নিয়েছেন

দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি তোমাকেও ঘুষি দিয়েছেন, বল দেখি, তিনি কি অত জোরেই মেরেছেন যত জোরে তুমি তাকে মেরেছ নাকি বেশি জোরে মেরেছেন?

মুরীদ বলল, যত জোরে আমি মেরেছি তিনিও তত জোরেই মেরেছেন। শায়খ বললেন, তিনি শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিশোধ নিয়েছেন। কুরআন মজীদে এসেছে–

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (سورة النحل : ١٢٦)

যদি প্রতিশোধ নাও তবে অতটুকুই যতটুকু তোমাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

এতেই তোমার জন্য কল্যাণ ছিল

আর তিনি যে বদলা নিয়েছেন তা-ও তোমারই কল্যাণের জন্য। নিজের ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য নয়। কেননা কখনো কখনো এমন হয় যে, যদি কোনো আল্লাহর বান্দাকে কষ্ট দেওয়া হয় এবং সে প্রতিশোধ না নিয়ে সবর করে তখন কষ্টদাতার উপর আল্লাহ্ তাআলার আযাব এসে যায়। উর্দূ ভাষায় একে বলে 'সবর পড়না'। এটা খুবই ভয়াবহ। এজন্য ওই বুযুর্গ ভেবেছেন, আমার সবরের কারণে তার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। তাই তিনি ন্যায়সঙ্গত বদলা নিয়েছেন।

একটি প্রশ্ন

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তবে কি বুযুর্গরা আল্লাহর চেয়েও অধিক দয়াশীল হয়ে গেলেন? কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন–

مَنْ آذٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থাৎ, যে আমার কোনো প্রিয় বান্দাকে কষ্ট দেয় তার সঙ্গে আমার যুদ্ধের ঘোষণা। অথচ বুযুর্গরা অধিক দয়ার পরিচয় দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন।

উত্তর

হযরত থানবী (রহ.) এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, 'দেখ, বাঘিনীকে যদি কেউ বিরক্ত করে তবে অনেক সময় সে ভ্রূক্ষেপও করে না, কিন্তু যদি তার শাবককে বিরক্ত করা হয় তাহলে সে বরদাশত করে না। এভাবেই চিন্তা কর যে, অনেক সময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সঙ্গে কৃত অপরাধকে ক্ষমা করে দেন কিন্তু তার খাঁটি বান্দাদের সঙ্গে বেয়াদবী ক্ষমা করেন না। এজন্য বলেছেন–

مَنْ آذٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা

এই হাদীস ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে এনেছেন। সহীহ বুখারীর আর কোনো হাদীস এমন নেই যার সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ এত আপত্তি করেছেন। এমনকি কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন যে, এই হাদীস সহীহ বুখারীতে সংকলন করা ইমাম বুখারীর ভুল হয়েছে। কেননা এটা তার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। তথাপি তিনি তা তাঁর কিতাবে স্থান দিয়েছেন। এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন যে, এমন নয় যে, হাদীসটি অত্যন্ত জয়ীফ ও মওজু তবে তা ইমাম বুখারীর নির্ধারিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহ.) কখনো কখনো তার নির্ধারিত মানদণ্ড ওইসব ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে থাকেন যেখানে অন্যান্য আলামত দ্বারা বর্ণনাটি হাদীস হওয়ার প্রত্যয় জন্মে।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর বক্তব্য

দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), যিনি তার বয়ান ও লেখনীর দ্বারা সুন্নাত-বিদআতের পার্থক্য পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, একবার কোনো একস্থানে ওয়াজ করছিলেন। কাওয়ালীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত জ্বালাময়ী ওয়াজ হচ্ছিল। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে প্রশ্ন করল যে, আপনি কাওয়ালীকে নাজায়েয ও হারাম বলছেন, কিন্তু হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়াতো কাওয়ালী শুনতেন। উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বললেন, হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া হয়তো দলীল জেনে থাকবেন আমাদের জানা নেই। আমরা যা জানি আমাদেরকে সে অনুযায়ীই কাজ করতে হবে। দেখুন, একদিকে তো এই জ্বালাময়ী বক্তৃতা, অন্যদিকে যখন একজন বড় বুযুর্গের নাম এসে গেল তো এভাবে জওয়াব দিলেন।

বুযুর্গদের সম্পর্কে বাক্য-সংযম অপরিহার্য

আমরা বুযুর্গদের সঙ্গে দ্বিমত করতে পারি, কোনো বিষয়ে মতভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের তো জানা নেই, আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা কেমন। এজন্য যার সম্পর্কে সামান্যতমও সম্ভাবনা দেখা যাবে যে, ইনি আল্লাহর কোনো খাছ বান্দা হতে পারেন তার সম্পর্কেও সতর্ক থাকা উচিত। কোনো কঠিন বাক্য তার শানে ব্যবহার করা উচিত নয়।

যাইহোক! রাগ ও ক্রোধ প্রকাশেরও ক্ষেত্র রয়েছে। সেটা হল বৈধ প্রতিশোধ গ্রহণ। এ পর্যন্তই মানুষ ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু তারপরও ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। বিশেষত প্রথম দিকে তারবিয়াতের জন্য ন্যায়সঙ্গত বদলা নেওয়াও পরিহার করবে।

ক্রোধ আসাটা স্বাভাবিক

হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

'ক্রোধ একটা স্বভাবগত বিষয়। এটা সৃষ্টি হওয়া মানুষের ইখতিয়ারের বিষয় নয়। এজন্য শুধু ক্রোধ সৃষ্টি হওয়াতে দোষ নেই। তবে ক্রুদ্ধ হওয়ার পর যে কাজগুলো করতে ইচ্ছা হয়, তা করে ফেলা, যদি তা বৈধ মাত্রা অতিক্রম করে, নিন্দনীয়।

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭০)

অর্থাৎ, মনে রাগ সৃষ্টি হওয়া বা না-হওয়ার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ চলে না। এটা সৃষ্টি হয় স্বভাবগতভাবে। তাই শুধু রাগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অপরাধ হবে না। এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। কেননা যেসব বিষয় মানুষের ইচ্ছাধীন নয় সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ওইসব বিষয়ে যা সে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে সংঘটিত করে। অতএব স্বভাবগতভাবে মনে যে রাগ সৃষ্টি হল এটুকুর কারণে বান্দা আল্লাহর কাছে অপরাধী হবে না। কিন্তু এই রাগের কারণে আপনি যদি কারো সঙ্গে মন্দ আচরণ করেন, মুখে বা হাতে তাকে কষ্ট দেন তাহলে এটা অপরাধ হবে। এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে না।

সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয়

কিন্তু ক্রোধের সময় সাধারণত যা হয়ে থাকে তা এই যে, মানুষ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। তখন সে এমন আচরণও করে বসে যা অন্যায়। এ দিকেই ইঙ্গিত করে হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, 'ক্রোধ একটি স্বভাবগত বিষয়। এটা মানুষের ইচ্ছার অধীন নয় বলে তা অপরাধও নয়। তবে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাজ করা, যখন তা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে, নিন্দনীয়।'

ক্রোধের চিকিৎসা : ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা

এরপর হযরত থানভী (রহ.) ক্রোধের চিকিৎসা আলোচনা করে বলেন,

'এর চিকিৎসা হিম্মত ও সংকল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।' (প্রাগুক্ত)

যেমন কারো মনে ক্রোধ সৃষ্টি হল, ইচ্ছা হচ্ছে, প্রতিপক্ষের চেহারায় থাবা মেরে গোশত তুলে আনি। এই যে একটা হিংস্রতা সৃষ্টি হল এর বশবর্তী হওয়া যাবে না। তখন নিজের উপর বল প্রয়োগ করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সংকল্প করতে হবে যে, আমি ওই ইচ্ছামতো কাজ করব না। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ

করতে হবে যে, ওই পাশবিক প্রেরণা যতই শক্তিশালী হোক, আমি তার বশবর্তী হব না। হব না। এবং ওই কাজ করব না। করব না। হাদীস শরীফে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থাৎ, বাহাদুরের পরিচয় এই নয় যে, সে প্রতিপক্ষকে আছাড় দিতে পারে; বরং প্রকৃত বাহাদুর ওই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।

ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায়

মোটকথা, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের মূল শক্তি হচ্ছে হিম্মত ও সংকল্প। তবে এক্ষেত্রে কিছু সহায়ক বিষয় আছে, যেগুলো ক্রোধ প্রশমিত হতে সাহায্য করে। হযরত থানভী (রহ.)-এর ভাষায় :

> 'যার প্রতি ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, আউযুবিল্লাহ পড়া, নিজের ভুল-ত্রুটি ও আল্লাহ তাআলার গযবের কথা স্মরণ করা– এগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়।' (প্রাগুক্ত)

প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ

উপরোক্ত মালফূযে কয়েকটি বিষয় বলা হয়েছে। প্রথমটি এই যে, যার উপর ক্রোধ আসছে তার থেকে সরে যাবে কিংবা তাকে সরিয়ে দিবে। এতে ক্রোধের তীব্রতা হ্রাস পায়। দ্বিতীয় পন্থা বলা হয়েছে "أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" পাঠ করা। এটা কুরআন মাজীদের নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (سورة الاعراف : ٢٠٠)

অর্থাৎ, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে আক্রমণ আসে তো আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

ক্রোধের আরেকটি সমাধান : দরূদ শরীফ পড়া

আরবদের মধ্যে একটি ভালো রীতি ছিল, যা এখন ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। তা এই যে, কখনো তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে কেউ যদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয়জন তাকে বলে "صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ" অর্থাৎ নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে দরূদ শরীফ পড়ে– "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ" এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যায়। এরপর দু'পক্ষের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যায়।

আরব বেদুঈন সমাজে এ ধরনের ভালো ভালো রেওয়াজ ছিল কিন্তু আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসনের সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসগুলো বিদায় হয়ে যাচ্ছে। যাইহোক! এটা ছিল ক্রোধ দূর করার একটি ভালো উপায়।

তৃতীয় পদ্ধতি : আল্লাহর গযবের কথা চিন্তা করা

তৃতীয় পন্থা বলা হয়েছে যে, নিজের ভুলত্রুটি এবং আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও শাস্তির কথা স্মরণ করবে। ভাববে যে, আমি এর উপর যতটা ক্রুদ্ধ হচ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি ক্রুদ্ধ হতে পারেন আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি। কেননা আমার গোনাহ ও ভুল-ক্রটি অনেক। আর সত্যিই যদি আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন তাহলে আমার কী পরিণাম হবে? এই পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

বিনয় ও নম্রতার অনুশীলন করুন

এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

> 'কিছুদিন কষ্ট করে হলেও নম্র ব্যবহারের অনুশীলন করা চাই। একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে। তবে শর্ত এই যে, হাল ছাড়া যাবে না।' (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে নম্র ভাষায় কথা বলবে এবং নম্র ব্যবহারের চেষ্টা করবে। কষ্ট করে হলেও তা অব্যাহত রাখবে। এমন যেন না হয় যে, একদিন করলাম, দুই দিন করলাম, এরপর বাদ দিলাম; বরং আজীবন এই চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। এ জন্য সর্বদা সজাগ-সচেতন থাকা কর্তব্য। কোনো অবস্থাতেই হাল ছাড়বে না। কিছুদিন এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর যোগ্যতা তৈরি হবে এবং ক্রোধ-প্রবণতা দূর হয়ে যাবে। ক্রোধের পরিস্থিতিতেও দেখা যাবে, সে শান্ত থাকতে পারছে।

ক্রোধের সময়ের সাত তদবীর

পরবর্তী এক মালফূযে হযরত (রহ.) বলেন,

> যখন ক্রোধ জাগ্রত হয় তখন নিচের কাজগুলো করবে :
>
> ১. চিন্তা করবে যে, আমিও তো আল্লাহ তাআলার কাছে অপরাধী। তিনি যদি আমার উপর ক্রুদ্ধ হন তাহলে আমার কী উপায় হবে?

২. আমি যদি আল্লাহর বান্দাকে ক্ষমা করি তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন।

৩. কোনো কাজে, বিশেষত পড়াশোনায় মশগুল হয়ে যাবে। এ সময় কাজ ছাড়া থাকা উচিত নয়।

৪. ঐ স্থান ত্যাগ করবে।

৫. বেশি বেশি أَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়বে।

৬. পানি পান করবে।

৭. অযু করবে। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭১)

এই মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) ক্রোধ দূর করার কয়েকটি পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন।

আমিও তো অপরাধী

প্রথম পদ্ধতি একথা চিন্তা করা যে, আমিও তো আল্লাহর কাছে অপরাধী। তাহলে আমি যেভাবে এই ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হচ্ছি, আল্লাহ তাআলাও যদি আমার উপর রাগান্বিত হন তাহলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? এভাবে চিন্তা করলে ক্রোধ প্রশমিত হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করবেন

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল এই কথা স্মরণ করা যে, আমি যার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছি, তাকে যদি ক্ষমা করে দেই তাহলে আল্লাহ তাআলাও আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি প্রতিশোধ নেই তাহলে আমার ক্রোধ চরিতার্থ হবে কিন্তু এতে তো আমার কোনো প্রাপ্তি নেই। অন্যদিকে ক্ষমা করার দ্বারা যদি আখেরাতে আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাই তাহলে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?

এক সাহাবীর ক্ষমা করার ঘটনা

একবার এক সাহাবী হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর কাছে এলেন, অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় এবং বললেন, অমুক আমার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি কিসাস নিব এবং তার দাঁতও ভেঙ্গে দিব। হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) তাকে বুঝালেন, ঐ লোকের দাত ভেঙ্গে তোমার কী লাভ হবে? তার চেয়ে বরং অর্থদণ্ড আরোপ করি এবং এর মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট হয়ে যাক। কিন্তু তিনি অনড়– না আমি আপোষ করব না, আমি তার দাঁতই ভেঙ্গে দিব। হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে, তোমার এই অধিকার আছে। ঐ সাহাবী যখন এই উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন তখন সম্ভবত হযরত আবু দারদা (রাযি.) তাকে বললেন, তুমি

তার দাঁত ভাঙ্গতে চলেছ কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। তিনি বললেন, কী কথা? হযরত আবু দারদা (রাযি.) বললেন, এখনও পর্যন্ত তুমি মযলুম, কেননা সে তোমার দাঁত ভেঙ্গেছে কিন্তু তুমি যদি তার দাঁত ভাঙ্গতে গিয়ে তার চেয়ে বেশি জোরে আঘাত কর তখন তুমি হবে জালেম এবং আল্লাহ্র দরবারে অপরাধী। আর যদি তুমি তাকে মাফ করে দাও তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো অত্যাচার ক্ষমা করে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করবেন, যেদিন তাঁর ক্ষমার সবচে বেশি প্রয়োজন হবে। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিজে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন? হযরত আবু দারদা (রাযি.) বললেন, জ্বী হাঁ। আমি নিজে এই কথা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। সাহাবী বললেন, 'আমি তাকে মাফ করে দিলাম।'

দেখুন, প্রথমে তার অবস্থা কী ছিল? রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। অর্থদণ্ড গ্রহণ করতেও রাজি নয়, আপোষ করতেও রাজি নয়, প্রতিশোধই নেবেন কিন্তু যেইমাত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনলেন সঙ্গে সঙ্গে সকল রাগ দূর হয়ে গেল। বলাবাহুল্য যে, এটাই হল মুমিনের শান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সহজ রাস্তা বাতলে দিয়েছেন যে, তুমি যদি মাফ কর তাহলে তোমাকেও মাফ করা হবে। আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে মাফ করবেন।

কোনো কাজে লেগে যাওয়া

তৃতীয় পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, ওই সময় কাজ ছাড়া থাকবে না। অর্থাৎ, যখন কেউ রাগান্বিত হয় তখন তার কোনো কাজে লেগে যাওয়া উচিত, বিশেষত পড়াশোনায় মগ্ন হওয়া অধিক উপকারী।

চতুর্থ পদ্ধতি, ঐ স্থান ত্যাগ করা।

পঞ্চম পদ্ধতি, অধিক পরিমাণে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া।

ষষ্ঠ পদ্ধতি, পানি পান করা।

সপ্তম পদ্ধতি, অযু করা।

রাগ কমানোর আরেকটি পদ্ধতি, নিচের দিকে অবতরণ করা

রাগ কমানোর আরেকটি পদ্ধতি হল নিম্নগামী হওয়া। অর্থাৎ, দাড়ানো থাকলে বসে পড়বে আর বসা থাকলে শুয়ে পড়বে। কেননা ক্রোধ যাত্রা করে মস্তিষ্কের দিকে। এর প্রবণতাই হল উর্ধ্বগামী। এজন্য দেখা যায় ক্রুদ্ধ ব্যক্তি

শায়িত অবস্থায় থাকলে উঠে বসে এবং বসা অবস্থায় থাকলে উঠে দাড়ায় আর দাড়ানো অবস্থায় থাকলে সামনে অগ্রসর হয়। এটা ক্রোধের বৈশিষ্ট্য। এজন্য এর চিকিৎসা হল উল্টো আচরণ করা। অর্থাৎ, দাড়ানো থাকলে বসে পড়ুন, বসা থাকলে শুয়ে পড়ুন।

এগুলো বিভিন্ন পদ্ধতি, যা অনুসরণ করলে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে মূল বিষয় হল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো সহায়কমাত্র। তাই এইসব পদ্ধতি অবলম্বন করার পাশাপাশি যদি ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করা না হয় তবে সুফল পাওয়া যাবে না।

মোটকথা, দৃঢ় সংকল্প করুন যে, পরিস্থিতি যাইহোক, আমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো কথা বলব না, কোনো কাজ করব না। এটাই মূল বিষয়। এরপর উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো আপনার সংকল্প অটুট রাখতে সহায়তা করবে।

আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চুয়ান্নতম মজলিস
ক্রোধ দমনের পদ্ধতি

ক্রোধ দমনের পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

হযরত থানভী (রহ.) এক মালফূযে ক্রোধ সম্পর্কে একটি মৌলিক কথা বলেছেন। তা এই যে,

> 'হঠাৎ ক্রোধ জেগে ওঠা মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজ নয়। এজন্য এতে দোষ নেই। কিন্তু পরে তা ধরে রাখা এবং তার বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করাটা ইচ্ছাকৃত। অতএব তা পরিত্যাগ করাও ইচ্ছা ও সংকল্পের অধীন। আর বারবার ক্রোধ সংবরণ করার দ্বারা, অর্থাৎ, ক্রোধের চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকার দ্বারা ক্রোধ প্রবণতাও ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭১)

গতকাল আরয করেছিলাম যে, রাগ আসাটা স্বাভাবিক। এটা অপরাধ নয়। কিন্তু রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করা যেমন ধমক দেওয়া, ভর্ৎসনা করা, মারপিট করা ইত্যাদি অপরাধ। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, ক্রোধ সংবরণ কর এবং ক্রোধের চাহিদা পূরণ করো না। ক্রোধ যতই প্রবল হোক, এর কারণে কোনো কথা মুখ থেকে বের করবে না এবং এক কদমও সামনে অগ্রসর হবে না। এভাবে বারবার সংবরণ করার দ্বারা এই প্রবণতা দুর্বল হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মৌলিক কথা এই যে, ক্রোধ যত সংবরণ করবে ততই তা দুর্বল হবে। অন্যদিকে যতই তা চরিতার্থ করবে ততই তা শক্তিশালী ও প্রবল হবে।

আল্লাহ ক্রোধ সংবরণকারীকে ভালোবাসেন

ইমাম গাযালী (রহ.) 'এহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বান্দা যখন ক্রোধের পেয়ালা পান করে তখন সকল পেয়ালার চেয়ে এটাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে।' দেখুন, মানুষ পানি পান করে, দুধ পান করে ইত্যাদি সবই বৈধ, কিন্তু ক্রোধকে গলাধঃকরণ করা শুধু বৈধ নয় তা আল্লাহর

কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কেননা মানুষ আল্লাহর ভয়ে, তাঁর বড়ত্ব ও প্রতাপ স্মরণ করে ক্রোধ সংবরণ করে এবং ক্রোধের কারণে যেসব পাশবিক প্রেরণা তার মনে জাগছিল তা সে দমন করে। এটা আল্লাহ্ তাআলার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত কর

এই মুজাহাদাটাই প্রয়োজন। যখন মনের চাহিদাগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষত-বিক্ষত হবে তখন এই মন আল্লাহর নূরে নূরান্বিত হবে।

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

তুমি একে কেন আগলে আগলে রাখছ? এটা তো এমন আয়না যে, একে যতই চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে কারিগরের কাছে ততই তা প্রিয় হয়ে ওঠবে।

এই অন্তর যত আহত হবে, ততই তা আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে। এই অন্তরে যত আঘাত লাগবে, ততই তাতে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তাআলা মানব-মনের চাহিদাগুলো এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, বান্দা তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ করবে। হাদীস শরীফে হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ

অর্থাৎ, জান্নাতকে অনেক কষ্টের বিষয় দিয়ে আবৃত করা হয়েছে।

ঐ কাজগুলো করতে মন চায় না তবুও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনের বিরোধিতা করে যখন তা করা হয় তখন অন্তর আল্লাহর নূরে নূরান্বিত হয়ে ওঠে। যেমন ক্রোধ সৃষ্টি হল কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা সংবরণ করা হল। মনে কুদৃষ্টির প্রেরণা জাগ্রত হল, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দৃষ্টিকে অবনত করা হল। এভাবে যখন মনের চাহিদাগুলোকে দমন করা হবে তখন আল্লাহ্ তাআলা ওই অন্তরকে নূরানী বানিয়ে দিবেন।

স্বভাবের চাহিদাগুলো দমন কর

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলতেন, একবার কেউ এই সংকল্প করুক না–

آرزوئیں خوں ہوں یا حسرتیں برباد ہوں
اب تو اس دل کو بنانا ہے ترے قابل مجھے

অর্থাৎ, আল্লাহর মর্জি-বিরুদ্ধ মনের যত ইচ্ছা আছে সবগুলোকে আমি হত্যা করব এবং লাঞ্ছিত ও পদদলিত করব। এভাবে এই শত্রুগুলোকে আমি অনুগত করব। বান্দা যখন একবার এই কাজ করে, মনের অবৈধ ইচ্ছাগুলোকে শক্ত হাতে দমন করে তখন সেগুলো দুর্বল হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, এসব প্রবণতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে না; দুর্বল হয়ে পড়ে থাকবে। তবে এদেরকে দুর্বল করতে পারাটাই বড় সাফল্যের বিষয়।

ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যাবে

মনের উপর বারবার চাবুক মেরে মেরে বান্দা যখন তার মন্দ প্রবণতাগুলোকে দুর্বল করতে সক্ষম হবে তো আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমানী মিষ্টতা দান করবেন। আল্লাহর মারেফাত দান করবেন। এই ঈমান ও মারেফাতের যে পবিত্র স্বাদ তার তো কোনো তুলনা হতে পারে না ওই সব অপবিত্র খাহেশের সঙ্গে। আল্লাহ তাআলা আপন ফযল ও করমে আমাদের সবাইকে ঈমান ও মারেফাতের অনাবিল মিষ্টতা দান করুন। আমীন।

এই মিষ্টতা বিনা সাধনায় পাওয়া যায় না

ঈমান ও মারেফাতের এই মিষ্টতা ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া পাওয়া যায় না। মনের চাহিদাগুলোর উপর হাতুড়ি চালাতে থাকুন। দমন করতে থাকুন। প্রথম দিকে বড় কষ্ট হবে, কিন্তু তা সহ্য করে আঘাত করতেই থাকুন। এক সময় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আল্লাহর নূরে নূরান্বিত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের হযরত শায়খ ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) অত্যন্ত সুন্দর একটি পংক্তি আবৃত্তি করতেন–

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا
اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

অর্থাৎ, পেয়ালার কারিগর, যিনি এই পেয়ালা বানিয়েছেন খুব সুন্দর করে, তিনি বললেন, এটা ভেঙ্গে অন্য কিছু গড়ব নতুন করে।

এই যে মনের উপর আঘাত দেওয়া হল, হাতুড়ি চালানো হল, কেন তা করা হল? এইজন্য যে, এটা দিয়ে নতুন কিছু গড়া হবে।

ভগ্ন হৃদয়ে আল্লাহর নূরের প্রকাশ

এক কবি বড় সুন্দর একটি পংক্তি বলেছেন–

بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں
جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں

বিরান ঘরে বসবাস করে। যাকে সে ধ্বংস করে তারই হৃদয়ে বসবাস করে।

এজন্য মনের ইচ্ছাগুলোকে দমন করে মনকে যখন বিরান করে ফেলবে তখন তাতে আল্লাহর নূর বর্ষিত হবে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে।

দিলের উপর করাত চালান

সুফী-ওলী, সাহাবায়ে কেরাম, এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের মনোজগতের যে শুভ্রতা, ঔজ্জ্বল্য তা-ও এভাবেই হাসিল হয়েছে। তাঁরাও মনের ইচ্ছাগুলোকে দমন ও সংবরণ করেছেন। তাই এটা অপরিহার্য। মনের ইচ্ছাগুলোকে নিষ্পেষিত করার পরই আল্লাহ তাতে পবিত্রতা ও ঔজ্জ্বল্য দান করেন। ওই অন্তরে আল্লাহর মারেফাতের নূর আসে। এরপর গোনাহের প্রবণতাও দুর্বল ও স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্য প্রথমে ঐ প্রবণতাগুলোর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। এ প্রসঙ্গে আমিও একটি পংক্তি ছন্দবদ্ধ করেছিলাম–

کتنے غنچے مضطرب ہیں دل میں کھلنے کیلئے
اپنے ہاتھوں سے ذرا نشتر لگا کر دیکھئے

অর্থাৎ, হৃদয়ের শাখায় যতই করাত চালানো হবে ততই তাতে কচি শাখা-প্রশাখা জন্ম নিবে। হৃদয়ে যে গুণাবলী সুপ্ত রয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে বিকশিত হবে এবং সমগ্র অন্তর্জগত নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে

এই ‘মালফূযে’ হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, ক্রোধের চিকিৎসা এই যে, ক্রোধ যদি আসে তবে আসতে দিন কিন্তু ক্রোধের কারণে অন্তরে যে

চাহিদাগুলো সৃষ্টি হয়, যেমন ইচ্ছা হয় উঠে গিয়ে এক থাপ্পড় মারি, কিংবা একটা গালি দেই অথবা কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেই এগুলোকে সংবরণ করুন এবং চিন্তা করুন যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই নিজেকে নিবৃত্ত করছি। তখন সেই চাহিদা পূরণ না হওয়ার মাঝেও একটি স্বাদ অনুভূত হবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে যত অনুশীলন অব্যাহত রাখবে ততই ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে আসতে থাকবে।

মানুষের প্রবৃত্তি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো

আল্লামা বূসীরী (রহ.) কসীদায়ে বুরদাতে বলেন–

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَىٰ

حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمْ

অর্থাৎ, মানুষের প্রবৃত্তি হল দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো। সে কি কখনো চায়, তাকে দুধ ছাড়ানো হোক? চায় না। কেননা, সে দুধ পানেই অভ্যস্ত। মায়ের দুধ পরিত্যাগ করতে সে রাজি নয়। কিন্তু শিশুর দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি মা-বাবা চিন্তা করেন, দুধ ছাড়াতে গেলে বাচ্চার কষ্ট হবে, কান্নাকাটি করবে, তার চেয়ে দুধ খেতে চায়, খেতে দাও। তাহলে ওই শিশু জোয়ান হয়েও দুধের নেশা ছাড়তে পারবে না। অন্যদিকে মা-বাবা যদি সময় মতো দুধ ছাড়ানোর চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই সে দুধ ছেড়ে দিবে। একদিন, দুই দিন, তিন দিন কাঁদবে, জ্বালাবে, চেঁচামেচি করবে কিন্তু এক সময় দুধ ছেড়ে দিবে। দুধ ছাড়ানোর বিষয়টা সব সময় এভাবেই হয়ে থাকে।

নফসকে লাগামহীন ছেড়ে রেখো না

আল্লামা বুসীরী (রহ.) বলেন, মানুষের নফস বা প্রবৃত্তিও শিশুর মতো, যদি তোমরা তাকে লাগামহীন ছেড়ে রাখ, অর্থাৎ, যখন যা ইচ্ছা হয় পূরণ করতে থাক তাহলে সে তোমাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত করবে। তোমরা কখনো গোনাহ থেকে মুক্তি পাবে না। কিন্তু তোমরা যদি মনকে নিয়ন্ত্রণ কর এবং গোনাহ ছাড়তে বাধ্য কর তাহলে সে অবশ্যই গোনাহ ছেড়ে দিবে। তবে এর জন্য চেষ্টা করতে হবে, জ্বালাতন সইতে হবে। একই কথা ক্রোধ সম্পর্কেও। বারবার সংবরণ করার দ্বারা ধীরে ধীরে তা দুর্বল ও স্তিমিত হয়ে যাবে।

ক্রোধের সর্বোত্তম চিকিৎসা

কখনো কখনো ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে অন্য একটি পন্থাও ফলপ্রসূ হয় তবে তা খুব কঠিন। হযরত থানভী (রহ.) নিম্নোক্ত মালফূযে তা বর্ণনা করেছেন–

'যদি স্বভাবগতভাবেই কারো রাগ খুব বেশি হয় এবং সামান্য বিষয়েই এত বেশি রাগ এসে যায় যে, তখন আর হুশ থাকে না তাহলে এর সর্বোত্তম চিকিৎসা এই যে, যার উপর রাগ করা হয়েছে, মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার পর সবার সামনে তার কাছে হাতজোড় করে, পায়ে ধরে ক্ষমা চাবে; বরং তার জুতা মাথায় নিবে। এক দুইবার এমন করা হলেই নফসের শিক্ষা হয়ে যাবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭১)

এভাবে সবার সামনে ক্ষমা চাওয়ার দ্বারা নফস সতর্ক হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কখনো রাগারাগির পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে ভাববে যে, রাগ করা যাবে না, রাগ করলে বড় বিপদ। সবার সামনে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে ক্রোধ সংবরণ করা বরং অনেক সহজ। এভাবে ক্রোধের প্রবণতা দুর্বল হয়ে যাবে।

মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাও

আমার এক বন্ধু আছেন যার রাগ খুব বেশি। রাগ উঠলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এমনকি মা-ও যদি কিছু বলেন তাহলে তাঁর সঙ্গেও রাগারাগি আরম্ভ করেন। তিনি আমার কাছে বিভিন্ন অযীফা ও যিকির-আযকার জানতে চান, ফজরের সময় কী পড়ব, জোহরের সময় কী পড়ব ইত্যাদি। আমি তাকে বললাম, আপনার কোনো অযীফা-যিকিরের প্রয়োজন নেই, আপনার প্রথম কাজ এই যে, মায়ের কাছে গিয়ে তার পা ধরে মাফ চাবেন এবং বলবেন যে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে মাফ করে দিন।' একথা শুনে তিনি বললেন, আমাকে মাফ চাইতে হবে? এ তো বড় বিপদ দেখছি। আমি বললাম, এটা আপনাকে করতেই হবে। মায়ের পা ধরে মাফ চান এবং ভাই-বোনদের সামনে। তিনি আবার বললেন, এটা তো অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমি বললাম, যত কষ্টই হোক, কাজটা করুন। তার কাছে এটা অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছিল যে, ভাই-বোনদের সামনে কীভাবে মার কাছে মাফ চাব। কিন্তু তিনি কাজটা করলেন। পরে সাক্ষাতে বললেন, কী বলব, সে সময় তো আমার অন্তর জবাই হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আমারও এটাই উদ্দেশ্য ছিল। দু চার বার তাকে দিয়ে এই কাজ করানোর পর মেজাজ একদম ঠিক হয়ে গেছে।

শায়খের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করুন

কিন্তু এই কাজও শায়খের তত্ত্বাবধানে করা উচিত। নিজের মনমতো করা উচিত নয়। কেননা, এতে অনেক সময় ক্ষতি হয়ে যায় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। শায়েখ জানেন যে, ওষুধের মাত্রা ও পরিমাণ কতটুকু হবে। প্রয়োজনের চেয়ে

বেশি হয়ে গেলে ওষুধের উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে. আর কম হলে ওষুধে কাজ হবে না। এজন্য শায়খের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

রাগের আরেকটি ঔষধ

হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে.

> 'ক্রোধ দমনে একটা কথা চিন্তা করা খুবই উপকারী হয়ে থাকে। তা এই যে. বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ক্রোধ দমন সর্বদা সুফল দান করেছে অন্যদিকে ক্রোধ চরিতার্থ করার ফল হয়েছে মন্দ। পরে এর জন্য অনুতাপও করতে হয়েছে।' (আনফাসে ঈসা. পৃষ্ঠা ১৭২)

অর্থাৎ. পিছনের কথা ভেবে দেখুন. যতবার ক্রোধ দমন করেছেন এর ফল ভালো হয়েছে। ক্রোধ সংবরণের কারণে কোনো ক্ষতির শিকার হতে হয়নি। অন্যদিকে যখন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুতাপের কারণ হয়েছে এবং লজ্জিত হতে হয়েছে। কারো মধ্যে যদি কিছুমাত্রও প্রজ্ঞা থাকে তাহলে রাগান্বিত হওয়ার পর অন্তরে জুলমাত ও অন্ধকার অনুভব করবে এবং এক ধরনের গ্লানি ও অনুতাপ বোধ করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযি.)কে কত সুন্দর কথা বলেছেন–

مَا دَخَلَ الرِّفْقُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

অর্থাৎ. যেখানেই কোমলতা থাকবে তা সুন্দর হবে এবং যা কিছু কোমলতা থেকে শূন্য হবে তা কুৎসিত ও দোষযুক্ত হবে।

তাহলে রাগ করার দ্বারা মানুষ যেহেতু সর্বদা ক্ষতি ও অনুতাপের মুখোমুখি হয় অন্যদিকে ক্রোধ পরিহার করলে দুটো থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহলে ক্রোধ পরিহারের পথ অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রাগান্বিত অবস্থায় শিশুকে প্রহার করা উচিত নয়

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'রাগান্বিত অবস্থায় কখনো শিশুকে প্রহার করবে না (পিতা ও উস্তাদ উভয়ের জন্যই এই কথা) রাগ প্রশমিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দিবে। উত্তম শাস্তি হল ছুটি মওকূফ করে দেওয়া। শিশুর উপর এর খুব প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। মিয়াজী (মক্তবের শিক্ষক) প্রহারের বেলায় এজন্য স্বাধীন

হয়ে যান যে, তাকে প্রশ্ন করার কেউ থাকে না। শিশুর তো প্রশ্ন করার যোগ্যতাই নেই আর অভিভাবক মিয়াজীকে পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছেন যে, 'হাড্ডি আমাদের, আর চামড়া মিয়াজীর'!

'মনে রাখবে, যার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করার কেউ থাকে না তার সম্পর্কে প্রশ্নকারী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এমনকি কোনো যিম্মী (মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক যার নিরাপত্তা মুসলিম শাসকের যিম্মায়) কাফিরের উপর যদি কোনো শাসক জুলুম করে তাহলে হাদীস শরীফে এসেছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৩)

শিশুদেরকে প্রহার করা অত্যন্ত ভয়াবহ

শিশুদেরকে প্রহার করা খুবই ভয়াবহ। আমার পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলতেন, অন্যান্য গোনাহতো তাওবার মাধ্যমে মাফ হতে পারে, কিন্তু শিশুদের উপর জুলুম করা হলে এর ক্ষমা পাওয়া খুবই জটিল। কেননা, এটা হচ্ছে বান্দার হক। আর বান্দার হক শুধু তাওবার দ্বারা মাফ হয় না যে পর্যন্ত না যার হক নষ্ট করা হয়েছে সে মাফ করে। এদিকে যার উপর জুলুম করা হয়েছে সে হচ্ছে নাবালেগ। নাবালেগের ক্ষমা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি শিশু যদি মুখে বলেও যে, আমি মাফ করলাম তবুও তা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য এই অপরাধের মাফ পাওয়া খুব জটিল। আর তাই শিশুদেরকে প্রহার করা এবং তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করার ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত।

মাদরাসায় শিশুদের প্রহার করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ

মাদরাসার কারী সাহেবরা এ অন্যায় করে ফেলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ষা করুন। আমীন। হযরত থানবী (রহ.) নিয়ম করেছিলেন যে, মকতবে কোনো কারী সাহেব শিশুদেরকে প্রহার করতে পারবে না। কেউ প্রহার করলে তাকে হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে জবাবদিহি করতে হত এবং কখনো কখনো শাস্তিও পেতে হত। একবার হযরত থানভী (রহ.) একথাও বলেছিলেন যে, এখন থেকে যদি জানতে পারি, কোনো কারী সাহেব কোনো শিশুকে মেরেছে তাহলে ঐ কারী সাহেবকে মসজিদের বারান্দায় দাড় করিয়ে ওই শিশুর দ্বারা বেত্রাঘাত করাবো। বিষয়টা খুবই নাযুক ও মারাত্মক। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর বুঝে শুনে শাস্তি দিন

এটা ঠিক যে, শিশুদেরকে পড়ানো খুবই কঠিন কাজ। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ নয় এবং কখনো কখনো প্রহারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েই যায়। কখনো এমন পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয় এবং অন্য কোনো চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হয় এবং বাস্তবিকই প্রহারের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এ ক্ষেত্রেও রাগান্বিত অবস্থায় মারবে না। এ সময় চুপ থাক। যখন ক্রোধ দূর হবে তখন ভেবে চিন্তে শাস্তি দিবে। এতে শাস্তির মাত্রা ঠিক থাকবে। যে পরিমাণ প্রয়োজন সে পরিমাণ শাস্তিই দেওয়া হবে। সীমালংঘন হবে না। কিন্তু যদি রাগান্বিত অবস্থায় মারতে আরম্ভ কর তাহলে এক থাপ্পড়ের জায়গায় দশ থাপ্পড় দিয়ে ফেলবে। এতে একেতো গোনাহ হল। কেননা প্রয়োজনের অধিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত এতে শিশুর ক্ষতি হবে। কেননা মাত্রাতিরিক্ত কোনো কিছুই সুফল দেয় না; বরং ক্ষতি করে। তৃতীয়ত এর জন্য পরে অনুতাপ করতে হবে।

এজন্য হযরত থানভী (রহ.) একেবারে মৌলিক কথাটা বলে দিয়েছেন যে, ক্রুদ্ধ অবস্থায় শাস্তি দিবে না। ক্রোধ ঠাণ্ডা হওয়ার পর শাস্তি দিবে।

উপসংহার

ক্রোধ সম্পর্কে এই মৌলিক নীতিগুলো হযরত থানভী (রহ.) এখানে উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ কোন বিষয়টা ক্ষতিকর আর কোনটা ক্ষতিকর নয় এবং কীভাবে ক্রোধের অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এটাও হযরত থানভী (রহ.) চিহ্নিত করেছেন। এখন প্রত্যেকের নিজ নিজ হালত অনুযায়ী এর উপর আমল করা কর্তব্য। আমলের সর্বোত্তম পন্থা এই যে, কোনো শায়খের সঙ্গে এই নিয়তে সম্পর্ক রাখবে যে, আমাকে এইসব মন্দ প্রবৃত্তির চিকিৎসা করতে হবে। এরপর তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে থাকবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা এই মন্দ প্রবণতাগুলো দূর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সকল মন্দ প্রবণতা দূর করে দিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পঞ্চান্নতম মজলিস

হাসাদ ও তার চিকিৎসা (১)

হাসাদ ও তার চিকিৎসা (১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

গত তিন দিন ক্রোধ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখানে হযরত থানবী (রহ.) 'হাসাদ' (হিংসা) সম্পর্কে বলেছেন। হাসাদ অত্যন্ত মন্দ ব্যাধি। আবার তা অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ, লোকেরা ব্যাপকভাবে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বিশেষত আমাদের মধ্যে অর্থাৎ, তালিবে ইলমদের মধ্যে এর প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। এজন্য গুরুত্বের সঙ্গে এর চিকিৎসা করা কর্তব্য।

তিনটি বিষয় এবং সেগুলোর বিধান

'হাসাদ' সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.)-এর 'মালফূযাত' (বাণীগুলো) এক এক করে পড়ব। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

> 'একতো হল স্বভাবের প্রবণতা। এতে মানুষ معذور (মাজূর) (অপারগ)। দ্বিতীয় বিষয় ওই প্রবণতার বশবর্তী হয়ে কাজ করা। এক্ষেত্রে মানুষ مازور 'মাযূর' (গোনাহগার)। আর তৃতীয়টি হল ওই প্রেরণার বিপরীত কাজ করা। এক্ষেত্রে মানুষ ماجور মাজূর (সওয়াবপ্রাপ্ত)। অর্থাৎ হিংসা-হাসাদের কারণে কারো নিন্দা করতে ইচ্ছা হলে তার প্রশংসা করবে। মুখ ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছে হলে মেলামেশা করবে এবং তাজীম-সম্মান করবে। তাকে সালাম দিবে এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করবে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৩)

হাসাদ কাকে বলে

হযরত থানভী (রহ.) হাসাদ বিষয়ক সকল কথা উপরের সংক্ষিপ্ত 'মালফূযে' বলে দিয়েছেন। প্রথমে জানুন, হাসাদ কাকে বলে। হাসাদ হল, কারো উন্নতি

দেখে অন্তর্জ্বালায় ভুগতে থাকা এবং তার ঐ বিষয়টা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কামনা করা।

হাসাদের উদাহরণ

এর দৃষ্টান্ত এই যে, আমার একজন সহপাঠী আছে। সে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এতে আমার মনটা জ্বলতে লাগল এবং আমি ভাবতে লাগলাম যে, সে কেন বেশি নম্বর পেল? কেন সে আমার চেয়ে অগ্রসর হয়ে গেল? এরপর কামনা করতে লাগলাম, তার পরীক্ষা খারাপ হোক! নম্বর কম পাক! আগামী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার না করুক! আমি প্রথম হতে পারি কি না পারি, সে যেন প্রথম না হয়। এই যে অকল্যাণ কামনা এটাই হাসাদ।

কিংবা এক ব্যক্তি খুব সম্পদশালী। তার উন্নতি দেখে আপনার অর্ন্তজ্বালা সৃষ্টি হল এবং আপনি কামনা করতে লাগলেন, তার সম্পদ শেষ হয়ে যাক। উপার্জন কমে যাক। মনের এই মন্দ আকাঙ্ক্ষাই হাসাদ।

কিংবা ধরুন, সমাজে কারো সুনাম রয়েছে। লোকেরা তাকে সম্মান করে এবং পরামর্শ সহযোগিতা ইত্যাদির জন্য তার শরণাপন্ন হয়। এখন কারো অন্তরে মর্মজ্বালা উপস্থিত হল যে, কেন লোকেরা তার কাছে যায়! কেন তাকে ভালোবাসে! এরপর এই আকাঙ্ক্ষাও জাগতে লাগল যে, তার মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যাক। এটা হাসাদ।

গিবৃতা অবৈধ নয়

আরবীতে একটি শব্দ আছে 'গিবৃতা'। এর অর্থ হল, কারো উন্নতি দেখে এই কামনা করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহ আমাকেও দান করুন। এখানে উন্নতির আগ্রহ আছে তবে অন্যের অকল্যাণ কামনা নেই। যেমন অমুকের স্বাস্থ্য ভালো। আল্লাহ আমাকেও ভালো স্বাস্থ্য দান করুন। অমুকের কাছে সম্পদ আছে। আল্লাহ তাআলা আমাকেও সম্পদ দান করুন। কিংবা অমুক আলেম গভীর ইলমের অধিকারী, আল্লাহ তাআলা আমাকেও এমন ইলম দান করুন। একে বলে 'গিবতা' বা ঈর্ষা। এটা নিষিদ্ধ নয়, বৈধ। অন্যদিকে 'হাসাদ' নিষিদ্ধ, যার অর্থ হল, আমি ওই নেয়ামত পাই বা না পাই তারটা যেন নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু অন্তর্জ্বালায় গোনাহ নেই

'হাসাদ' মানব-মনের অত্যন্ত দুষ্ট প্রবণতা। যদি মনের এই দুঃখটা মনের মধ্যেই চেপে রাখা যায়, কথায় বা কাজে এর প্রভাব না পড়ে তাহলে মনের

দুঃখের কারণে এ ব্যক্তি অপরাধী হবে না। কেননা, এটা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়। এ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন যে, এটা মানব-স্বভাবের একটা প্রবণতা। মানুষ এক্ষেত্রে অপারগ বলে গণ্য। তবে শর্ত এই যে, বিষয়টা মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কথায় বা কাজে তা প্রকাশিত হতে দেবে না আর মনে যে ইচ্ছাগুলো জাগ্রত হচ্ছে তা পূরণ করবে না। এমন হলে– কারো উন্নতিতে মনে কষ্ট জাগার দ্বারা– গোনাহ হবে না।

অন্তরের প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করা গোনাহ

হ্যাঁ! গোনাহ তখনই হবে যখন এই অন্তর্জ্বালার কারণে তার কোনো ক্ষতি করবে। যেমন সমালোচনার মাধ্যমে তার মর্যাদা নষ্ট করা এবং অপমান করার চেষ্টা করা, দেখা-সাক্ষাত হলে বিমুখতা প্রদর্শন করা, কিংবা এমন কোনো কৌশল করা, যার দ্বারা তার উপার্জন হ্রাস পায়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, ইলম কমে যায়, মানুষের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয় ইত্যাদি। কিংবা তার জন্য বদদুআ করা, ইয়া আল্লাহ! তার ওই গুণটা নষ্ট করে দিন। এভাবে হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যখন এই কাজগুলো করা হবে তখন তা গোনাহ ও পাপাচারে পরিণত হবে। এর আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ, শুধু মনের জ্বালা মনেই চেপে রাখা হলে তা গোনাহ নয়। কেননা এটা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ অপারগ।

তবে মনের ইচ্ছাও ভয়াবহ

‘এহইয়াউল উলূম’ গ্রন্থে ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, অন্যের ভালো দেখে মনোকষ্ট হলে তা বিনা ইখতেয়ারে হওয়ার কারণে যদিও সে অপরাধী হবে না কিন্তু মনের এই অবস্থাটাও অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা, এটা বিদ্যমান থাকলে এক সময় তা মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে দিবে। ঐ ব্যক্তির কোনো না কোনো ক্ষতির চেষ্টা সে করেই বসবে। এজন্য বিনা ইচ্ছায় সৃষ্টি হলেও তা পুষে রাখা মোটেই উচিত নয়। এটা খুবই ভয়াবহ।

চিকিৎসার জন্য তিনটি কাজ করুন

এ অবস্থায় তিনটি কাজ করুন : ১. ভাবুন যে, এই চিন্তাটা খুবই মন্দ। কোনো মুসলিমের ব্যাপারে এমন মানসিকতা পোষণ করা ভালো নয়। এভাবে চিন্তাটা যে মন্দ তা স্মরণ করুন।

দ্বিতীয় কাজ এই যে, যার প্রতি হিংসা হচ্ছে তার গুণাবলী স্মরণ করুন। বিশেষত যে বিষয়গুলো আপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন তার মাধ্যমে যদি কখনো আপনার কোনো উপকার হয়ে থাকে তাহলে তা স্মরণ করুন। ভাবুন যে, আমার তো তার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মানসিকতা থাকা উচিত।

তৃতীয় কাজ এই যে, যদিও তার প্রতি আপনার হিংসা হচ্ছে, যার কারণে ইচ্ছে হচ্ছে তাকে কষ্ট দেই, অপমান করি কিংবা অন্য কোনোভাবে তার ক্ষতি করি কিন্তু মনের ইচ্ছার বিপরীতে কষ্ট করে হলেও তার জন্য এই'দুআ করুন যে, ইয়া আল্লাহ! তাকে আরও উন্নতি দিন। এটা অত্যন্ত তিক্ত ওষুধ। মন তার ক্ষতির জন্য লালায়িত, সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোক, তার গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যাক, তার উন্নতি ও সাফল্য থেমে যাক, কিন্তু মনের সকল অশুভ ইচ্ছার বিপরীতে আপনি দুআ করছেন, ইয়া আল্লাহ! তাকে আরও উন্নতি দান করুন। তার ইলম বাড়িয়ে দিন, সহায়-সম্পদে বরকত দিন, সুস্থতা দান করুন। এতে আপনার মনের চিকিৎসা হবে। যখন তার সঙ্গে সাক্ষাত হবে ইচ্ছার বিপরীতে হলেও আগে সালাম দিন। তাকে সম্মান করুন এবং মানুষের সামনে তার প্রশংসা করুন। বলাবাহুল্য যে, এই কাজগুলো করতে গিয়ে আপনার অন্তর কষ্টে নীল হয়ে যাবে, তবুও করুন। এটাই 'হাসাদে'র চিকিৎসা।

অন্যথায় ঐ দুষ্ট মানসিকতাই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে

উপরের এই কাজ তিনটি করুন। মনের মধ্যে যখন হাসাদের ভাব সৃষ্টি হয়েছে তখন যদি উপরোক্ত পন্থায় তা নির্মূল না করা হয় তাহলে একপর্যায়ে তা গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এবং আপনাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। কিন্তু যদি ওই কাজগুলো করেন তাহলে স্বভাবগতভাবে যে হাসাদের ভাব মনে সৃষ্টি হয়েছিল তা মাফ হয়ে যাবে। এবার পুনরায় হযরত থানভী (রহ.)-এর 'মালফূয'টি পড়ুন।

মালফূযের ব্যাখ্যা

হযরত থানভী বলেছেন যে, 'একটি হল মানুষের মনের স্বাভাবিক ভাব'। স্বাভাবিক ভাব বলতে মনের ওই অবস্থাটুকু বোঝানো হয়েছে যা বিনা ইখতিয়ারে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন কেউ আপনার চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে– এটা লক্ষ্য করে আপনার মনে কষ্ট লাগল। এই কষ্ট লাগাটা স্বাভাবিক। এখানে মানুষ অক্ষম ও অপারগ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে এ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মনের ওই জ্বালা কোনো কাজের মাধ্যমে চরিতার্থ করা। যেমন তাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করা, তার সম্পর্কে চোগলখোরী করা, গীবত-শেকায়েত করা, তাকে অপমান করার উপায় খুঁজতে থাকা। এই পর্যায়ে মানুষ অপরাধী ও গোনাহগার।

তৃতীয় অবস্থা এই যে, মনের ইচ্ছার উল্টো কাজ করা। যেমন ইচ্ছা হচ্ছে তাকে লাঞ্ছিত করি কিন্তু উল্টো তার প্রশংসা করলাম তার জন্য দুআ করলাম। এটা সওয়াবের কাজ। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব পায়।

মনের ইচ্ছার বিরোধিতা করার সুফল

দেখুন, শয়তান আপনার মনে হাসাদ সৃষ্টি করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল সে আপনাকে গোনাহে লিপ্ত করবে এবং জাহান্নামে পৌঁছে দিবে। আপনি যদি হাসাদের বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করতেন তাহলে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হত, কিন্তু আপনি কী করলেন? আপনি মনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন। যে মানসিক অবস্থাটা আপনাকে গোনাহতে লিপ্ত করার জন্য এসেছিল তার বিরোধিতা করার কারণে আপনি অসংখ্য সওয়াব লাভ করলেন। এটা হল ওই ইচ্ছার বিরোধিতার সুফল।

গোনাহ কি ভালো জিনিস

আমাদের এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত বাবা নাজম আহসান ছাহেব (রহ.)। হযরত থানবী (রহ.)-এর 'মুজাযে সোহবত' ছিলেন। তিনি অনেক আশ্চর্য কথা বলতেন। একবার বললেন, 'গোনাহ খুব ভালো জিনিস।' আমরা বললাম, হযরত গোনাহ আবার ভালো হয় কীভাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। গোনাহ অত্যন্ত ভালো জিনিস। কেননা অন্তরে যখন গোনাহের ইচ্ছা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ কষ্ট করে নিজেকে রক্ষা করে তখন সে কত উচ্চ মাকাম লাভ করে। যদি গোনাহ না থাকত তাহলে কি এই মর্তবা-মাকাম হাসিল হত? এটা তো এজন্যই হল যে, গোনাহের ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়ার পর সে তা দমন করেছে।

দুই ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করুন

দেখুন, এক ব্যক্তি যার মনে গোনাহের চিন্তাই আসেনি এবং গোনাহের কোনো সুযোগও সৃষ্টি হয়নি, এভাবে গোনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায় মনযিলে মকসূদে পৌঁছে গেল, সে অবশ্যই সফল এবং আখেরাতের আযাব থেকে সে নাজাত পাবে ইনশাআল্লাহ। অপর ব্যক্তি পদে পদে গোনাহের মুখোমুখি হচ্ছে, গোনাহের বিভিন্ন সুযোগ তার সামনে আসছে, কিন্তু সে বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ করেছে এবং একটি একটি করে সকল গোনাহের মোকাবেলা করে শেষ মনযিলে উপনীত হয়েছে, তিনি বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মর্তবা প্রথম জনের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু কীভাবে সে এই মর্তবা লাভ করল? গোনাহ সুযোগ ও প্ররোচনা ছিল বলেই তো। এজন্য হযরত বাবা নাজম আহসান ছাহেব (রহ.) বলতেন, গোনাহ খুব ভালো জিনিস। কেননা, গোনাহের প্রবণতাকে দমন করতে পারলে মর্তবা অনেক বুলন্দ হয়ে যায়।

ইংরেজদের কাবাব খুব সুস্বাদু হবে

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.), যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, হিন্দুস্তানের আযাদীর জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাঁর অন্তরে ইংরেজদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। তাদের সকল বিষয়কে তিনি ঘৃণা করতেন। এটা তার স্বভাবের অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। একবার কেউ তাকে বলল, হযরত আপনি সর্বদা ইংরেজদের নিন্দা করেন, তাদের মধ্যে কি কোনো ভালো দিক নেই? পৃথিবীতে যত মন্দ বস্তু আছে সবগুলোতেই কোনো না কোনো ভালো দিকও আছে। তাহলে ইংরেজদের মধ্যেও এটা থাকবে। আপনি মাঝে মাঝে তাদের ঐ ভালো দিকগুলোও একটু আলোচনা করবেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বললেন, হ্যা ভাই, ওই ইংরেজগুলোকে কাবাব বানিয়ে খাওয়া গেলে তা খুব সুস্বাদু খাবার হবে। এই একটা ভালো দিক ওদের মধ্যে আছে।

সারকথা

মোটকথা, গোনাহের ভালো দিক এই যে, যদি ওই প্রবণতাগুলো দমন করা যায় তবে এর দ্বারা মানুষের মর্তবা বুলন্দ হয়। তদ্রূপ হাসাদের যে প্রবণতা আপনার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে তা এসেছিল আপনাকে গোনাহতে পতিত করার জন্য কিন্তু আপনি যখন এর বিরোধিতা করলেন তখন এটাই আপনার দরজা বুলন্দীর কারণ হয়ে গেল। এভাবে যদি স্বভাবের মন্দ প্রবণতাকে দরজা বুলন্দীর মাধ্যম বানানো যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ এটা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ছাপ্পান্নতম মজলিস

হাসাদ ও তার চিকিৎসা (২)

হাসাদ ও তার চিকিৎসা (২)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

হিংসুক নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলে

গতকাল 'হাসাদ' সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমি আরজ করেছিলাম যে, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাধি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

সুফিয়ায়ে কেরাম 'হাসাদ'কে তুলনা করেছেন আগুনের সঙ্গে। কেননা হাসাদের কারণে মানুষের অন্তরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হয়। কারো কোনো উন্নতি চোখে পড়ল, কাউকে অগ্রগামী হয়ে যেতে দেখল তো অন্তরে জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। এক আরব কবি বলেন–

اَلنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ

অর্থাৎ 'হাসাদের' প্রকৃতি হল আগুনের মতো। আগুন যেমন জ্বালানোর মতো কিছু পেলে তা তো জ্বালাবেই যেমন শুকনা কাঠে আগুন লাগল তো আগুন তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কিন্তু জ্বালানোর মতো কিছু না পেলে সে নিজেকেই গ্রাস করতে থাকে এবং একসময় সে নিঃশেষ হয়ে যায়। তদ্রূপ হিংসুক প্রথমে অন্যের ক্ষতির চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু এতে সফল না হলে নিজেই ঐ আগুনে জ্বলতে থাকে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। এভাবে কত মানুষ হিংসার আগুনে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

হিংসুক আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্ট

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, হিংসা অনেক বড় গোনাহ। কেননা, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হিংসুক আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট নয়। কারো উন্নতি দেখলে তার মনে আপত্তি জাগে যে, কেন সে আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেল? অমুককে আল্লাহ্ কেন এই নেয়ামত দান করলেন? অথচ আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন এবং যে পরিমাণ দিয়েছেন সবই তার হেকমত ও কুদরতের ফলাফল। অতএব এতে আপত্তি করার অর্থ হল আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালায় আপত্তি করা। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ (النساء : ٣٢)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের একের উপর অন্যকে যেসব বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন তা কামনা করো না। কেননা এগুলো অর্জনের বিষয় নয়। অতএব এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করো না যে, এই বৈশিষ্ট্য তাকে কেন দেওয়া হল, আমাকে কেন দেওয়া হল না?

এটা আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থা

এটাতো আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থা। কাউকে সুস্থতা দিয়েছেন, কিন্তু বিত্ত দেননি। কাউকে অর্থ-বিত্ত দিয়েছেন কিন্তু সুস্থতা দেননি। কাউকে ইলম দিয়েছেন কিন্তু মাল-দৌলত দেননি। কাউকে মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি দিয়েছেন কিন্তু সন্তান-সন্ততি দেননি। এগুলো আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। এখানে বান্দার আপত্তি করার অধিকার নেই।

নিজ নেয়ামতের দিকে তাকাও

হিংসুক তার প্রতি আল্লাহর যে নেয়ামত রয়েছে তা লক্ষ করে না। অন্যের নেয়ামতগুলো বিনষ্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। সে যদি এভাবে চিন্তা করে যে, অমুককে আল্লাহ ওই নেয়ামত দান করেছেন, কিন্তু আমাকেও তো এই এই নেয়ামত দান করেছেন তাহলে তার অন্তর থেকে হাসাদ দূর হয়ে যাবে। যেমন অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ অর্থ-বিত্তের নেয়ামত দান করেছেন আর আমাকে ইলম দান করেছেন। জনৈক কবি বলেন,

رَضِيْنَا بِقِسْمَةِ الْجَبَّارِ فِيْنَا - لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَّالِ مَالٌ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্যে যেভাবে বণ্টন করেছেন আমরা তাতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ মূর্খদেরকে সম্পদ দিয়েছেন আর আমাদেরকে ইলম দান করেছেন।

তাহলে মানুষ কেন দুঃখিত হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকাই মানুষের কর্তব্য।

মোটকথা হাসাদের সবচেয়ে গুরুতর দিক এই যে, এতে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা সম্পর্কে আপত্তি ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান রয়েছে। এজন্য এটা পরিহার করা উচিত।

এই চিন্তাকে খারাপ মনে করুন

গতকাল আরজ করেছি যে, অনেক ক্ষেত্রেই হাসাদ একটি স্বভাবজাত প্রবণতা। এটা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে মানুষের ইচ্ছার প্রভাব থাকে না। এ ধরনের

ক্ষেত্রে মানুষ একটা পর্যায় পর্যন্ত অপারগ এবং এতে গোনাহও হয় না। কিন্তু এই মনোবৃত্তিটাও অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা, কোনো সময় এটা মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে দিতে পারে। এজন্য এর চিকিৎসা করা জরুরি। প্রথমে সচেতন হতে হবে যে, এই মনোবৃত্তিটা ভালো নয় এরপর সতর্ক থাকতে হবে যেন একে কাজে পরিণত না করা হয়। হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

> 'যে কাজটা মানুষের ইচ্ছাধীন তার বিপরীতটাও ইচ্ছাধীন। তাই হাসাদের কারণে যে সব কাজের প্রেরণা জাগছে তার বিপরীত কাজগুলো কর। যেমন গীবত-শেকায়েতের স্থলে প্রশংসা কর, যদিও কাজটা মনের ইচ্ছার বিরোধী কিন্তু মুখ তো তোমার ইচ্ছার অধীন। তার সঙ্গে নম্রভাবে সাক্ষাত কর ও কথাবার্তা বল। তার ক্ষতিতে মৌখিকভাবে সহানুভূতি প্রকাশ কর। তার সামনেও এবং অন্যদের সামনেও। তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে তার সম্মান কর। মাঝে মাঝে হাদিয়া প্রদান কর। একটা উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত এই কাজগুলো করতে থাকলে হাসাদ দূর হয়ে যাবে। অন্তত বিশ বার এই কাজগুলো করা উচিত।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৪)

অর্থাৎ, যে কাজ করা মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ভিতরে তা না করাও ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ভিতরে। এজন্য হাসাদের কারণে মানুষের মনে যে ইচ্ছাগুলো জাগ্রত হয়, যেমন ইচ্ছা হয় যে, তাকে মারব, গালমন্দ করব, অপমান করব, লোকের সামনে তাকে লাঞ্ছিত করব ইত্যাদি। এগুলো মানুষের ইচ্ছাধীন কর্ম ও হারাম। অর্থাৎ, এই অবৈধ কাজগুলো মানুষ নিজ ইচ্ছায় করতে পারে। তাহলে তার বিপরীত কাজগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন।

যার প্রতি হিংসা হয়েছে তার প্রশংসা করুন

ইচ্ছা হচ্ছে তার সমালোচনা করি, কিন্তু প্রশংসা করুন। এই কাজটা আপনার সাধ্যের ভিতরে। অতএব তা করুন। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, 'হিংসা-হাসাদের কারণে যে ইচ্ছাগুলো মনে জাগে তার বিপরীত কাজগুলো কর, যেমন গীবত-শেকায়েতের পরিবর্তে প্রশংসা কর।'

যদিও তা করতে ইচ্ছা হবে না তবু জোর করে তা করুন। আর প্রশংসা করার অর্থ অবাস্তব প্রশংসা করা নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তার যে বিষয়টি প্রশংসনীয় তাই উল্লেখ করুন। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যাতে প্রশংসনীয় কোনো দিক নেই। অতএব তার ভালো গুণ খুঁজে বের করে তা আলোচনা করুন।

চোরের পা চুম্বন

হযরত থানভী (রহ.) লিখেছেন যে, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) একবার কোথায়ও যাচ্ছিলেন। দেখলেন যে, এক লোককে শূলে চড়ানো হয়েছে। তার ডান হাত ও বাম পা কর্তিত। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই অবস্থা কেন? লোকেরা বলল, সে যখন প্রথমবার চুরি করেছে তখন তার ডান হাত কেটে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার চুরির পর বাম পা কেটে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও সে চুরি পরিত্যাগ করেনি। পুনরায় চুরি করার কারণে তাকে শূলে চড়ানো হয়েছে। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) তার কাছে গেলেন এবং তার ঝুলন্ত পায়ে চুম্বন দিলেন।

লোকেরা অবাক হয়ে বলল, হযরত আপনার মতো মানুষ এত বড় চোর ও ডাকাতের পায়ে চুম্বন করলেন? এটাতো বুঝে আসল না, কেন এ কাজটা আপনি করলেন? হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বললেন, এর মধ্যে একটা মূল্যবান গুণ আছে। তা হচ্ছে ইস্তিকামাত-অবিচলতা। আমি তার ওই গুণটাকে চুম্বন করেছি। যদিও সে এই গুণটা মন্দ কাজে ব্যবহার করেছে এটা তার ভুল। কিন্তু এই গুণটা বড় মূল্যবান। যদি সে এটা ভালো কাজে লাগাত তাহলে তার মর্তবা কোথায় পৌঁছে।

প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো না কোনো গুণ রয়েছে

প্রত্যেক মানুষের মাঝেই কোনো না কোনো গুণ রয়েছে। ইকবাল কখনো কখনো অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেন। শিশুদের কবিতায় অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন–

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

যমানার কোনো কিছুই নির্গুণ নয়। কুদরতের সৃষ্টি কোনোটাই মন্দ নয়।

অতএব পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ নিজ হিকমত অনুযায়ী পয়দা করেছেন।

অতএব যার প্রতি আপনার মনে হিংসা সৃষ্টি হয়েছে তার ভালো গুণ তালাশ করুন এবং মানুষের কাছে তা আলোচনা করুন। এতে আপনার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকবে। কিন্তু হতে দিন। এই ব্যাধির চিকিৎসাই হল অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করা। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, ‘গীবত-শেকায়েতের পরিবর্তে তার প্রশংসা করতে থাকুন। যদিও তা মনের জন্য কষ্টকর কিন্তু আপনার যবানের উপর তো আপনার কর্তৃত্ব রয়েছে।’ এটা হল এক কাজ।

বিনয়ের সঙ্গে মেলামেশা করুন

দ্বিতীয় কাজ, 'তার সাথে বিনয়ের সঙ্গে কথা বলুন ও মেলামেশা করুন।' যেমন যদিও ইচ্ছে হচ্ছে যে, তার চেহারা থেকে গোশত তুলে আনি কিন্তু যখন তার সঙ্গে সাক্ষাত হয় তখন তার সাথে বিনয়ী আচরণ করুন এবং নম্রস্বরে কথা বলুন।

তার দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করুন

তৃতীয় কাজ 'তার কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করুন।' অর্থাৎ, তার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে সহানুভূতি প্রকাশ করুন। তার সামনেও করুন এবং অন্যদের সামনেও করুন।

হাদিয়া দিন

পঞ্চম কাজ এই যে, 'মাঝে মাঝে তাকে হাদিয়া দিন।' তাহলে তার অন্তরেও আপনার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং আপনার অন্তরেও তার প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। কিছু মানুষ এমন আছে যাদের পক্ষে সব কাজ করা সহজ, কিন্তু পয়সা খরচ করা অত্যন্ত কঠিন। যেন 'প্রাণ চাইলে তা-ও হাজির কিন্তু অর্থ চাইলে কথা আছে।' অতএব পকেট থেকে পয়সা বের করা খুব কঠিন। কিন্তু এই তিক্ত ওষুধটাও সেবন করুন। আপনি যখন তাকে হাদিয়া দিলেন তখন বিষয়টা এই দাড়াল যে, পকেট থেকে পয়সা বের হল এবং এমন লোকের কাছে পৌছল যার প্রতি আপনার অন্তরে বিদ্বেষ রয়েছে। মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি যখন এই কাজটা করবেন তখন এর উসীলায় হাসাদের ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

এই কাজ বারবার করুন

এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, 'একটা উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত এই কাজগুলো করুন। 'হাসাদ' দূর হবে। অন্তত বিশবার এই বিষয়টা প্রকাশ অর্থাৎ, বিশবার কাজগুলো করুন।' এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখল যে, অমুকের প্রতি আমার মনে 'হাসাদ' রয়েছে। হযরত থানভী (রহ.) বললেন যে, তার প্রশংসা কর, সম্মান কর এবং হাদিয়া দাও। অন্তত বিশবার যদি এই কাজগুলো কর তাহলে ইনশাআল্লাহ হাসাদ দূর হয়ে যাবে।

'হাসাদ' ও 'হিক্দ' এর পার্থক্য

আরেক চিঠির উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) লেখেন,

> 'কারো ক্ষতি বা অবনতির সংবাদ শুনে যদি মনে আনন্দ জাগে তাহলে তা হচ্ছে 'হাসাদ'। আর যদি তার পক্ষ থেকে কষ্ট

পেয়ে থাক তাহলে তা 'হিক্দ'। কিন্তু শুধু মনের এই অবস্থার উপর শাস্তি হবে না। যদি মনের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা হয় তাহলে শাস্তি হবে। যেহেতু কাজটা ইচ্ছাধীন তাই তা না-করাও ইচ্ছাধীন। তবে ওই প্রবণতা দুর্বল করা কর্তব্য যেন তা প্রবল হয়ে না ওঠে। এর উপায় এই যে, মনে মনে লজ্জিত হবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করবে, আল্লাহ যেন তা দূর করে দেন। ঐ ব্যক্তির সহযোগিতা করবে, তা কাজকর্মের দ্বারা হোক, অর্থের দ্বারা হোক কিংবা দুআর মাধ্যমে হোক। এভাবে এই মন্দ প্রবণতা দূর হয়ে যাবে।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৪)

এই চিঠিতে হযরত থানভী (রহ.) 'হাসাদ' ও 'হিকদে'র পার্থক্য আলোচনা করেছেন। হাসাদ সম্পর্কে বলেছেন, 'কারো ক্ষতির সংবাদ শুনে যদি মন খুশি হয়' যেমন কারো ঘরে চুরি বা ডাকাতি হওয়ার খবর শুনে মনে হল যে, ভালো হয়েছে তার সম্পদ কিছু কমেছে! কারো ব্যবসায়ে লোকসান হল, এটা শুনে খুব আনন্দ লাগল যে, খুব ভালো হয়েছে। বড় বাড় বেড়েছিল এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হবে। এগুলো হচ্ছে অন্যের নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার আনন্দ। এটাও হাসাদের একটা প্রকার। এভাবে কারো ক্ষতিতে খুশি হওয়া হাসাদ।

হিক্দ ও কীনা

কারো দ্বারা যদি আপনি কষ্ট পেয়ে থাকেন এবং এ কারণে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়, আর এই ঘৃণার কারণে তার ক্ষতিতে আপনার মনে আনন্দ জাগে, তাহলে একে 'হিক্দ' বলা হয়। অর্থাৎ, আপনার মনে 'কীনা' রয়েছে। কীনার ব্যাখ্যা এই যে, কোনো ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, যার কারণে আপনার মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু যেমন প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা ছিল তা নেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আপনার মনে চাপা ক্রোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি হল। এখন তার কোনো ক্ষতির সংবাদ আপনাকে আনন্দিত করছে। আপনি তার ক্ষতি কামনা করছেন। এই অবস্থাটাকে 'কীনা' বলা হয়। এর আলোচনা সামনে আলাদাভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ। হযরত থানভী (রহ.) এখানে শুধু 'হিকদ' ও 'হাসাদের' পার্থক্য বয়ান করেছেন। যার সারকথা এই যে, কারো ক্ষতির কারণে মনে আনন্দ জাগলে একে হাসাদ বলে। আর কারো দ্বারা কষ্ট পাওয়ার কারণে এই অবস্থাটা সৃষ্টি হলে একে হিক্দ ও কীনা বলে।

একে দুর্বল করা চাই

সামনে হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'তবে শুধু মানসিক প্রবণতার উপর শাস্তি হবে না।' অর্থাৎ, অন্তরে যে আনন্দ স্বভাবগতভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা যেহেতু ব্যক্তির কর্ম নয় তাই এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু যদি এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে এমন কোনো কাজ করে যার দ্বারা তার কষ্ট হয় তাহলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর এই কাজটা যেমন ব্যক্তির নিজের কর্ম তেমনি তা না-করাও তার ইচ্ছাধীন।

তবে ঐ মানসিক প্রবণতাও দূর করা অপরিহার্য যাতে তা প্রবল না হয়ে যায়। এর উপায় এই যে, অন্তরের এই প্রবণতার উপর লজ্জিত হবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করবে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবে, আল্লাহ যেন তা দূর করে দেন এবং ঐ ব্যক্তির সাহায্য করবে, চাই কাজ-কর্মের মাধ্যমে হোক, কিংবা অর্থের মাধ্যমে হোক অথবা দুআর মাধ্যমে হোক। এভাবে এটা স্তিমিত ও মৃতপ্রায় হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা হেফাযত করুন। হাসাদ বড় মন্দ প্রবণতা। আরও ভয়ের বিষয় এই যে, আমাদের আলেমদের মধ্যে এই প্রবণতা খুব বেশি পাওয়া যায়। কেননা, ইলম এমন এক দৌলত যার প্রকৃতি ঊর্ধ্বগামিতা। এজন্য অন্য কাউকে ইলম ও মাকবুলিয়াতের দিক থেকে অগ্রগামী হতে দেখলে অন্তরে হাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়।

শয়তানের গল্প

হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি শয়তানকে স্বপ্নে দেখল ফেরিওয়ালার সুরতে। অনেক গাট্টি তাঁর কাঁধে। কিন্তু সেগুলো বড় বিচিত্র জিনিসে পরিপূর্ণ। কোনোটাতে পায়খানা, কোনোটাতে পেশাব, কোনোটাতে পুঁজ– এভাবে সারা দুনিয়ার সকল নাপাকী তার কাছে বিদ্যমান। আবার সকল পোটলাতেই বিভিন্ন লেবেল লাগানো রয়েছে। যেমন, হাসাদ, কীনা, সম্পদের মোহ, পদ ও পদবীর মোহ ইত্যাদি।

রাস্তায় কোনো লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এগুলো নিয়ে কোথায় চলেছ? শয়তান বলল, এগুলো আমার ব্যবসার পণ্য। এগুলো বিক্রি করতে যাচ্ছি। লোকটি বলল, এই ময়লা-আবর্জনা কে কিনবে? শয়তান বলল, এগুলো কোথায় বিক্রি হয় তা আমার জানা আছে। এই যে 'সম্পদের মোহ' লেবেল আঁটা পোটলাটা দেখছ, এটা বিক্রি হবে ব্যবসায়ীদের কাছে। তারা এর খরিদ্দার। আর এই যে 'পদমর্যাদার মোহ' ও 'হাসাদ' লেবেল আটা পোটলা দেখছ, এগুলো বিক্রি হবে আলেমদের কাছে। তারাই এর গ্রাহক! আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন। আমীন।

ইলমের কারণে হাসাদ ও মর্যাদার মোহ সৃষ্টি হয়

ইলমের সঙ্গে যদি ইখলাস না থাকে তাহলে ওই ইলমের কারণে 'পদের মোহ' সৃষ্টি হয়। আর তা থেকে সৃষ্টি হয় 'হাসাদ'। কেননা যখন অন্যকে ইলমের দিক দিয়ে অগ্রগামী হতে দেখবে তখন তার অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হবে যে, সে কেন আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেল? কেন তার এত প্রসিদ্ধি ও সুনাম? কেন তার এত গ্রহণযোগ্যতা? অন্যদিকে যদি ইলমের সঙ্গে ইখলাস থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে তো হাসাদ ও 'হুব্বে জাহ' সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং অন্যকে ইলমের দিক থেকে অগ্রগামী হতে দেখলে আনন্দ হবে। আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে আমাদের সবাইকে ইখলাস দান করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.)-এর ইখলাস

হযরত মাওলানা ইদরীস কান্দলবী (রহ.)- আল্লাহ তাআলা তার মর্তবা বুলন্দ করুন- আমার ওয়ালিদ ছাহেব হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.)-এর সহপাঠী ছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে গভীর মুহাব্বত ছিল। এত বেশি মুহাব্বত ছিল যে, ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)-এর প্রত্যেক কিতাবের দু'টি করে কপি তার কাছে থাকত। তিনিও যেহেতু লিখতেন এজন্য ওয়ালিদ ছাহেব তার কিতাবের যে নাম রাখতেন তিনিও ঐ নাম রাখতেন। ওয়ালিদ ছাহেব তাফসীরের কিতাব লিখলেন এবং নাম রাখলেন 'মাআরিফুল কুরআন।' তিনিও তার তাফসীর-গ্রন্থের নাম রাখলেন 'মাআরিফুল কুরআন'। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) এক কিতাব লিখলেন 'দাআওয়ায়ে মির্জা' নামে তো তিনিও এই নামে কিতাব লেখেন। এ দু'জনের কয়েকটি কিতাব একই নামের রয়েছে।

হাসাদের কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয়

তিনি লাহোরে থাকতেন। একবার আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য লাহোর গেলাম। পরিচয় দেওয়ার পর বললেন, 'মৌলভী শফীকে আমার সালাম দিও।' মাওলানা কখনোই বলতেন না, মৌলভীই বলতেন। এরপর বললেন, মৌলভী শফীর সঙ্গে আমার বায়ান্ন বছরের সম্পর্ক। আলহামদু লিল্লাহ! এই বায়ান্ন বছরের মধ্যে একবারের জন্যও আমাদের কারো মনে একচুল পরিমাণ হিংসা-হাসাদ সৃষ্টি হয়নি। এরপর বললেন, বল দেখি, একচুল পরিমাণ কোনো কিছু কেন সৃষ্টি হল না। বললেন যে, মৌলভীদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার মূল কারণ 'হাসাদ'। অমুক ব্যক্তি কেন আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেল? এই হাসাদের কারণে অন্তরে বিদ্বেষ-বিমুখতা সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্ক নষ্ট হয়। আলহামদু লিল্লাহ মৌলভী শফীর সঙ্গে আমার কখনো হাসাদ হয়নি।

অতুলনীয় বন্ধুত্ব

এরপর বললেন, বল দেখি, আমাদের মধ্যে হিংসা-হাসাদ কেন সৃষ্টি হয়নি? আমি বললাম, আপনিই বলুন। বললেন, তুমি কি কাফিয়া পড়েছ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ! পড়েছি। বললেন, 'তাওয়াবে' এর আলোচনা পড়েছ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ! পড়েছি। বললেন, 'তাওয়াবে'-এর মধ্যে একটি আছে 'নাত'। সেটা পড়েছ? বললাম, জ্বী হাঁ! পড়েছি। বললেন, 'নাত' দু ধরনের হয় : 'মাতবূ' এর 'নাত' এবং 'মুতাআল্লিকে মাতবূ'-এর নাত। যেমন যদি বল– زَيْدُنِ الْعَالِمُ তাহলে اَلْعَالِمُ শব্দটি زَيْدٌ এর নাত ও সিফত। আর যদি বল– زَيْدُنِ الْعَالِمُ غُلَامُهٗ তাহলে اَلْعَالِمُ যদিও মূলত غُلَامٌ এর নাত বা সিফত কিন্তু তরকীব করার সময় এভাবে বলবে যে, زَيْدٌ মওসূফ এবং اَلْعَالِمُ غُلَامُهٗ সিফত অথচ اَلْعَالِمُ তো زَيْدٌ এর সিফত নয় বরং তার মুতাআল্লিক غُلَامُهٗ -এর সিফত। কিন্তু তবুও তরকীবে একে زَيْدٌ এরই সিফত বলা হবে। এরপর বললেন, মৌলভী সাহেব! যখন মৌলভী শফীর কোনো রচনা আমার সামনে আসে তখন আমি ভাবি যে, আমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে زَيْدُنِ الْعَالِمُ اَخُوْهُ -এর মতো। যে রচনা তিনি লিখেছেন, তা বাস্তবে তার হলেও তার মাধ্যমে সেটা আমারও। এই কারণে দীর্ঘ বন্ধুত্বের পরও আমাদের মধ্যে কখনো হাসাদ পয়দা হয়নি।' আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মানসিকতা অর্জন করার তাওফীক দিন।

ইলমের সঙ্গে ইখলাস ও খাদেম হওয়ার মানসিকতা

অতএব ইলমের সঙ্গে ইখলাসও থাকা চাই। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করা চাই। ইলমের দ্বারা অন্যের উপর নিজের বড়ত্ব ও বিশেষত্ব ফলানো কোনো মতেই ঠিক নয়।

আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) কত সুন্দর কথা বলতেন– আল্লাহ তাআলা কি এই ইলম অন্যদের উপর বড়ত্ব ফলানোর জন্য দান করেছেন? ভাই, আল্লাহ তোমাকে একটি নিয়ামত দান করেছেন, একে সঠিক স্থানে ব্যবহার কর। ইলমের সঠিক ব্যবহার হল, এর দ্বারা মানুষের উপকার করা। তোমরা হলে খাদেম আর সকল সৃষ্টি তোমাদের মাখদূম। তাই ইলমের মাধ্যমে অন্যের উপর বড়ত্ব ফলানো নয় খেদমতের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া চাই।

তাহলে হাসাদ পয়দা হবে না

যখন ইখলাস পয়দা হবে তখন এ ইলমের দিক থেকে অন্য কাউকে অগ্রগামী হতে দেখলে এবং তার দ্বারা মানুষের উপকার হতে দেখলে এই অনুভূতি সৃষ্টি

হবে যে, আমার উদ্দেশ্যেই পূরণ হচ্ছে। অতএব তিনি দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে আনন্দিত হবেন।

খ্যাতি ভালো জিনিস নয়

শোহরত-খ্যাতি দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে তা ভালো নয়ই, বাস্তব কথা এই যে, দুনিয়ার শান্তি ও আরামের দিক থেকেও অত্যন্ত মন্দ বিষয়। এর ফলে মানুষ কোনো কাজের থাকে না। এ ধরনের অর্থহীন বিষয়ের জন্য কেন মানুষ লালায়িত হয় এবং কেন অন্যের প্রতি হিংসা করে? ভাই, লোকেরা যদি আপনার পরিবর্তে অন্যের দিকে অধিক আকৃষ্ট হয় তবে তো আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত। কেননা, সে আপনার অর্ধেকেরও বেশি কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য ওই ব্যক্তির প্রতি হিংসা না করে আল্লাহ তাআলার শোকরগোজারী করুন।

সারকথা

সারকথা এই যে, অন্তরে ইখলাস থাকলে হিংসা-হাসাদ নির্মূল হয়ে যায়। তাই হাসাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার বড় উপায় অন্তরে ইখলাস পয়দা করা। যতই ইখলাস পয়দা হতে থাকবে ততই অন্তর থেকে হাসাদ দূর হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সাতান্নতম মজলিস

বিদ্বেষ ও তার চিকিৎসা

বিদ্বেষ ও তার চিকিৎসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

গত দুই দিন হাসাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং আলহামদু লিল্লাহ! বিষয়টা সমাপ্ত হয়েছে। এখানে হযরত থানভী (রহ.) আরেকটি আত্মিক ব্যাধি 'হিক্‌দ' (বিদ্বেষ) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বিদ্বেষ পোষণের শাস্তি

এটাও মানুষের অনেক বড় মানসিক ব্যাধি। এটা এত মারাত্মক যে, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> শবে বরাতে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য মানুষকে ক্ষমা করেন। কবীলায়ে বনূ কালবের বকরীর পালের পশম পরিমাণ মানুষকে আল্লাহ ক্ষমা করে থাকেন...।

আরবের বনূ কালব গোত্র অনেক বড় গোত্র ছিল। এঁরা সংখ্যায় ছিল হাজারেরও অধিক। প্রত্যেকের বকরীর পাল ছিল। অতএব তাদের বকরীর সংখ্যা হাজার হাজার; বরং লক্ষ অতিক্রম করে যাবে। এত মানুষকে আল্লাহ এই রাতে ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু দুই ধরনের মানুষকে ক্ষমা করেন না।

টাখনুর নিচে লুঙ্গি-পায়জামা পরা

দেখুন, এ রাতে রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়। রহমতের পরোয়ানা বণ্টন করা হয়, কিন্তু এ রাতেও দু ধরনের মানুষের মাগফিরাত হয় না : এক. যার পাজামা-লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলন্ত থাকে। আল্লাহ মাফ করুন। কেননা, এটা অহংকারের চিহ্ন। যে মানুষ এ রাতেও অহংকার পরিত্যাগ করে না এবং আল্লাহর সামনে বিনয় ও সমর্পণের পরিবর্তে অহমিকায় মত্ত থাকে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, এর তো ক্ষমা ও মাগফিরাতের প্রয়োজন নেই। এজন্য তাকে ক্ষমা করা হয় না।

বিদ্বেষ পোষণ

দ্বিতীয় ব্যক্তি যার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকেও ক্ষমা করেন না। সে যতই বন্দেগী করুক– নামায পড়ুক, সিজদা করুক, রোযা রাখুক, রাত জেগে ইবাদাত করুক, শবে বরাত ও শবে কদরেও তাকে ক্ষমা করা হয় না। এই প্রবণতা এতই খারাপ যে, যে সময় আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের খাযানা বণ্টিত হয় সে সময়ও বিদ্বেষ পোষণকারী বঞ্চিত থাকে। এজন্য সর্বদা ভয় করা চাই, সতর্ক থাকা চাই, কোনো মুসলিমের প্রতি যেন আমার অন্তরে বিদ্বেষ না থাকে। মুসলমানের কাজ তো এই যে–

کفر ست در طریقت ما کینہ داشتن

آئین ما است سینہ چوں آئینہ داشتن

অর্থাৎ, আমাদের এই পথে তো অন্য মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী এবং আমাদের নীতি হল সীনা আয়নার মতো পরিষ্কার রাখা, অন্য মুসলিমের প্রতি কীনা না রাখা।

‘কীনা’ কাকে বলে

‘কীনা’র পরিচয় সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> ‘কীনা হল স্বেচ্ছায় কারো অকল্যাণ কামনা অন্তরে পোষণ করা এবং তাকে কষ্ট দেওয়ার পন্থা অন্বেষণ করা।’
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৬৪)

অর্থাৎ, কেউ যদি স্বেচ্ছায় কারো অকল্যাণ কামনা অন্তরে পোষণ করে এবং তার কোনো ক্ষতি হোক, কোনো কষ্ট হোক– এজন্য চেষ্টাও করে তাহলে একে কীনা বলা হবে।

‘কীনা’ কীভাবে পয়দা হয়

‘কীনা’ সাধারণত এভাবে পয়দা হয় যে, কেউ আপনাকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়েছে এতে আপনার মনে ক্রোধ সৃষ্টি হল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হল কিন্তু যে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে সে এমন অবস্থানে রয়েছে যে, আপনার পক্ষে তার ক্ষতি করা সম্ভব নয়। সে হয়তো বয়সে আপনার বড়, কিংবা পদ ও পদবীতে বড়, তার উপর আপনার কোনো কর্তৃত্ব নেই। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হলেও প্রতিশোধ নেওয়ার আপাতত কোনো সুযোগ আপনার

নেই। একদিকে ক্রোধ ও উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে তা বের হওয়ারও কোনো পথ নেই। ফলে আপনার মনে একটা চাপ সৃষ্টি হল। এটাই মানুষের মনে কীনা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। তখন সে ভাবতে থাকে, এখন যদিও প্রতিশোধ নিতে পারলাম না কিন্তু সুযোগ পেলে তোমাকে আমি ছাড়ব না। এই অবস্থাটাকে কীনা বলা হয়।

এই ভাবনা গোনাহ নয়

যদি অন্তরে এই সংকল্প সৃষ্টি হয় যে, সুযোগ পেলে সে যে পরিমাণ কষ্ট আমাকে দিয়েছে আমিও তাকে সে পরিমাণ কষ্ট দিব তাহলে এটা গোনাহ নয়। কেননা, শরীয়ত এই অধিকার দিয়েছে যে, কেউ যদি আপনাকে কষ্ট দেয় তাহলে আপনিও তাকে ওই পরিমাণ কষ্ট দিতে পারেন।

ক্রোধের সময় মাত্রাজ্ঞান থাকে না

কিন্তু এই চাপা ক্রোধ মানুষের মনে এই প্ররোচনা দেয় যে, তাকে যদি বাগে পাই তাহলে যে পরিমাণ কষ্ট আমাকে দিয়েছে তার দশ গুণ বেশি কষ্ট আমি তাকে দিব। কেননা, যারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অভ্যস্ত নয় তারা কখনো মাত্রা ঠিক রাখে না। যারা গালিগালাজে অভ্যস্ত তাদের রীতি হল, কেউ যদি তাদেরকে বলে তুমি একটা আহমক ও বেকুব, তাহলে সে প্রতিউত্তরে সঙ্গে সঙ্গে বলবে, তুই আহমক, তোর বাপ আহমক, তোর দাদা আহমক। সে কখনো একজনের উপর সন্তুষ্ট হবে না, বাপ-দাদা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যার প্রেরণা ও প্রবণতার পরিশুদ্ধি হয়নি সে কখনো মাত্রা রক্ষা করতে পারে না। আরবীতে একটি কথা আছে–

"اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ"

অর্থাৎ, মূর্খ শুধু একবার আহমক বলে তৃপ্ত হয় না; বরং সে আরো অগ্রসর হয়। তদ্রূপ কাউকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ হলে সে সীমা রক্ষা করে না। কেউ তাকে একটা মারলে সে দুইটা মেরে দেয়।

প্রতিশোধপরায়ণতা 'কীনা'র অন্তর্ভুক্ত

সুযোগ পেলে সুদে আসলে প্রতিশোধ নিব– এই পাশবিক প্রেরণাকে 'কীনা ও বুগ্‌য' (বিদ্বেষ) বলা হয়। এর ফলে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেলে কষ্ট দিবে, বদনাম করার সুযোগ পেলে বদনাম করবে, গীবতের সুযোগ পেলে গীবত করবে, কথাবার্তা ও কটাক্ষের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পেলে তা-ই করবে।

এই যাবতীয় কাজের পিছনে যে প্রবণতা কার্যকর তা হল 'কীনা' ও 'বুগ্য'। এজন্য এই প্রবণতার চিকিৎসা প্রয়োজন।

মানুষের কাছে তো নিক্তি নেই

দেখুন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই অধিকার দিয়েছেন যে, যে আপনাকে জেনে বুঝে কষ্ট দিয়েছে আপনি তার প্রতিশোধ নিতে পারেন, কিন্তু ততটুকুই যতটুকু সে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। এর বেশি নয়। এটা হল নির্ধারিত সীমারেখা। একে অতিক্রম করা জায়েয নয়। কিন্তু কীভাবে বোঝা যাবে যে, কোন অবস্থায় মানুষ সীমা অতিক্রম করল? কেননা, মানুষের কাছে এমন কোনো নিক্তি নেই, যার মাধ্যমে সে বুঝবে, কতক্ষণ সে সীমার ভিতরে থাকছে আর কখন সীমা অতিক্রম করে গেল। কখন মনের আগুন নেভানোর জন্য বদলা নিচ্ছি আর কখন আল্লাহর জন্য নিচ্ছি।

হযরত আলী (রাযি.)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার এক ইহুদী হযরত আলী (রাযি.)-এর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে গোস্তাখীর বাক্য উচ্চারণ করল। নাউযুবিল্লাহ! হযরত আলী (রাযি.) বরদাশত করবেন– এই প্রশ্নই আসে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন এবং তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। ইহুদী যখন দেখল যে, এখন বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই তখন সে নিচে থেকে হযরত আলী (রাযি.)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রাযি.) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং উঠে দাড়ালেন। লোকেরা বলল, এখন তো তাকে আরো বেশি শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন ছিল অথচ তাকে ছেড়ে দিলেন? হযরত আলী (রাযি.) বললেন যে, এতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার যে লড়াই চলছিল তা এজন্য ছিল যে, সে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করেছে। অতএব তার সঙ্গে আমার লড়াই ব্যক্তিগত কারণে ছিল না, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য ছিল, কিন্তু যখন সে থুথু নিক্ষেপ করল তখন আমার মনে ক্রোধ জাগল এবং প্রতিশোধ প্রবণতা জেগে উঠল। এ অবস্থায় তাকে যদি শাস্তি দিতাম তাহলে তা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণ হয়ে যেত। আমি নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতে চাই না।

সাহাবায়ে কেরাম পরিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন

এই ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

"وَيُزَكِّيْهِمْ"

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধির জন্য প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এমন তাযকিয়া করেছেন, যার দৃষ্টান্ত উপরোক্ত ঘটনায় আপনারা লক্ষ করলেন।

মোটকথা, মানুষ যখন প্রতিশোধ নেয় তখন সাধারণত মাত্রা রক্ষা করে না; বরং সীমালংঘন করে ফেলে। আর যদি প্রতিশোধ নিতে না পারে তাহলে অন্তরে কীনা পয়দা হয়ে যায়– আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন আমীন– এই কীনা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি।

কীনার প্রতিকার

এর চিকিৎসাও তা-ই যা হাসাদের চিকিৎসা। অর্থাৎ, যার সম্পর্কে কীনা সৃষ্টি হয়েছে ইচ্ছা না হলেও মানুষের সামনে তার প্রশংসা করুন এবং তার জন্য দুআ করুন– ইয়া আল্লাহ! দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে উচ্চ মর্তবা দান করুন। ইয়া আল্লাহ! যার প্রতি আমার অন্তরে বিদ্বেষের পাহাড় জমে আছে তাকে দুনিয়াতেও উন্নতি দান করুন, আখেরাতেও উন্নতি দান করুন। এটা করলে অন্তর ব্যথায় নীল হয়ে যাবে। কেননা, তার প্রতি অন্তরে কীনা ও ঘৃণা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে এবং ইচ্ছা হচ্ছে যে, বাগে পেলে তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করে দেই কিন্তু মুখে তার প্রশংসা করা হচ্ছে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য দুআ করা হচ্ছে। যদিও অন্তর জর্জরিত হয়ে যাবে কিন্তু কীনার চিকিৎসা এটাই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ (حم سجدة : ٣٥)

অর্থাৎ, এই কাজ তার পক্ষেই করা সম্ভব যাকে আল্লাহ সবরের গুণ দান করেছেন এবং তার পক্ষেই সম্ভব যে অত্যন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী। এই আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হল যে, এটা যে করতে পারবে সে অনেক বড় সৌভাগ্য লাভ করবে।

জান্নাতের জন্য কুরবানী লাগবে

ভাই! জান্নাত এত সস্তা নয়। এর জন্য কিছু ত্যাগ ও কুরবানী লাগবে। কখনো জানের কুরবানী, কখনো মালের কুরবানী এবং কখনো আবেগ-অনুভূতির কুরবানী লাগবে। এই শেষোক্ত কুরবানী কখনো জান-মালের কুরবানীর চেয়েও কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর জন্য তা করতে হয়। এক কবি বলেন–

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی - حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ঐ প্রাণটা দিয়েছি যা তিনিই দিয়েছিলেন। অতএব সত্য কথা এই যে, (প্রাণ বিসর্জনেও) তার হক আদায় হল না।

এজন্য যার প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যই দুআ করবে। আল্লাহ যখন দেখেন যে, আমার বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য এই কাজ করছে, সে আমারই জন্য তার মনের চাহিদাগুলোকে দলিত-মথিত করছে, আবেগ-অনুভূতিকে কুরবান করছে এবং অন্তরের কামনা-বাসনাগুলোকে হত্যা করছে তখন আল্লাহ তাকে অতি উঁচু মর্তবা দান করেন।

তার ভালো গুণ খুঁজে বের করুন

তাহলে প্রথম কাজ এই যে, মনের এই অবস্থাকে মন্দ মনে করুন। ভাবুন যে, তাঁর প্রতি আমার মনে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং যেসব সংকল্প মনে উদয় হচ্ছে এগুলো ভালো নয়। এগুলো দূর করা দরকার। এর পদ্ধতি এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করেছেন–

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا بِآخَرَ"

(مسلم : كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء)

অর্থাৎ, কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ না করে। মূলত হাদীসটি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে এসেছে যে, স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা পোষণ না করে। কেননা, তার একটি বিষয় অপসন্দের হলে অন্য একটি বিষয় পসন্দের হবে।

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করার পন্থা বলে দিয়েছেন। যার সারকথা এই যে, যার প্রতি অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে তার ভালো গুণগুলো লক্ষ্য কর এবং ভালো গুণগুলো চিন্তা করে বের কর। অর্থাৎ, এভাবে ভাবুন যে, তার প্রতি আমার মনে যে ঘৃণার আগুন জ্বলছে তার কারণ হল অমুক বিষয়টা। কিন্তু এটা ছাড়াও তো তার মধ্যে অনেক ভালো গুণ রয়েছে। ঐ ভালো গুণগুলোর কথা স্মরণ করুন তাহলে ঘৃণা হ্রাস পাবে।

কিছুই মন্দ নয় কুদরতের সৃজন-ভূমে

দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না যার মধ্যে কোনো ভালো গুণ নেই। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করেননি যাতে শুধুই কুফ

আর কৃষ্ণতা, শুভ্রতার লেশমাত্রও নেই। তদ্রূপ এমন কিছুও সৃষ্টি করেননি যাতে শুভ্রতা আর শুভ্রতা, কৃষ্ণতা কিছুমাত্রও নেই। বরং প্রত্যেকেরই কিছু দোষ ত্রুটি আছে, কিছু গুণপনাও রয়েছে। পৃথিবীতে এই নিয়মই কার্যকর।

نھیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

সময়ের পেয়ালায় কোনো কিছুই ফেলনা নয়। সৃষ্টির কর্মশালায় কিছুই মন্দ নয়।

অতএব এ প্রসঙ্গে একটি করণীয় এই যে, যার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য তার দোষ-ত্রুটি ভুলে যান এবং তার গুণ ও যোগ্যতাগুলো স্মরণ করতে থাকুন।

'কীনা' সম্পর্কে সতর্কবাণীগুলো স্মরণ করুন

দ্বিতীয় করণীয় এই যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে যেসব সতর্কবাণী এসেছে, যেমন যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষী ও প্রতিশোধপরায়ণ, শবে বরাতেও তার মাগফিরাত হয় না। এগুলোকে স্মরণ করুন এবং চেষ্টা করুন যেন তার বিরুদ্ধে কোনো কথা মুখ থেকে বের না হয় এবং তার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করা না হয়। তার জন্য কল্যাণের দুআ করুন এবং মানুষের সামনে তার প্রশংসা করুন।

এটা বিদ্বেষ নয়

এখানে একথাটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, অনেক সময় মানুষ বিদ্বেষ নয় এমন বিষয়কেও বিদ্বেষ মনে করে। বস্তুত 'বিদ্বেষ' তখনই অবয়ব পায় যখন একজন অন্যজনের ক্ষতি করার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পরিকল্পনা করে কষ্ট দিতে থাকে। তখন একে 'বুগ্‌য' (বিদ্বেষ) বলা হবে। কিন্তু শুধু এটুকু অবস্থা যে, তার সঙ্গে স্বভাব-রুচির মিল হয় না এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা হয় না। তাহলে এটা বিদ্বেষ নয়, স্বভাবের দূরত্ব। অতএব কারো সঙ্গে সাক্ষাত, মেলামেশা ইত্যাদিতে অস্বস্তিবোধ হলে সাক্ষাত নাই করলেন কিন্তু তার ওয়াজিব হকগুলো আদায় করুন। যেমন দেখা হলে সালাম করুন, তিনি সালাম দিলে সালামের জওয়াব দিন, অসুস্থ হলে খোঁজ-খবর নিন, ইন্তেকাল হয়ে গেলে জানাযায় শরীক হোন, তার সুখ-দুঃখের সময়গুলোতে সহমর্মিতা প্রকাশ করুন। এই যথেষ্ট। এটা অপরিহার্য নয় যে, তার সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, সকাল-সন্ধ্যা তার সঙ্গে

মজলিস জমাতে হবে, হাসি-তামাশা করতে হবে। এগুলো অর্থহীন বিষয়, যার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা অপরিহার্য যে, তার অনিষ্ট কামনা থেকে বিরত থাকবে।

স্বভাবের অমিল 'কীনা' নয়

এই কথাটাই হযরত থানভী (রহ.) নিম্নোক্ত মালফূযে উল্লেখ করেছেন–

> যদি কারো পক্ষ থেকে কষ্টের কোনো বিষয় ঘটে এবং তার সঙ্গে মেলামেশা ভালো না লাগে তাহলে এটা স্বভাবগত দূরত্ব ও আড়ষ্টতা, এটা গোনাহ্ নয়। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৪)

অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবে বিভিন্নতা রয়েছে, তাই একজনের স্বভাব যদি অন্যজনের সঙ্গে না মেলে তাহলে অপরিহার্য নয় যে, মেলাতেই হবে। এজন্য এটাকে বিদ্বেষ বলা হবে না।

অন্যের ক্ষতিতে আনন্দিত হওয়া

দেখুন, যারা শায়খের মাধ্যমে নিজেদের ইসলাহ্ করেন তারা নিজেদের বিভিন্ন অবস্থা শায়খকে অবহিত করেন যে, আমার অবস্থা এই। এটা কি কোনো আত্মিক রোগ? রোগ হলে উপশমের জন্য কী করণীয়? বস্তুত এ বিষয়গুলোই শায়খের কাছ থেকে জানার বিষয়। এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)কে পত্র লিখলেন–

> "প্রতিপক্ষের কোনো ক্ষতির সংবাদ শুনলে অন্তরে আনন্দ অনুভূত হয়।" (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৫)

এটা হচ্ছে ইসলাহের পদ্ধতি। মনের অবস্থাগুলো সম্পর্কে শায়খকে অবহিত করা। এই পত্রলেখক অনুভব করেছেন যে, যখন প্রতিপক্ষের কোনো ক্ষতির সংবাদ পাই যেমন তার ঘর-বাড়ি আগুনে জ্বলে গেল, কিংবা চুরি-ডাকাতি হল অথবা তার বদনাম হয়ে গেল। তখন অন্তরে আনন্দ ও প্রফুল্লতা বোধ করি। এই অনুভূতি কি গোনাহ্ ও রোগ? যদি এটা রোগ ও গোনাহের বিষয় হয় তাহলে উপশমের উপায় কী?

এই অবস্থাটা দূর করা চাই

উত্তরে হযরত থানভী (রহ.) লেখেন–

> 'সচেতনভাবে চিন্তা করুন যে, এই আনন্দের অনুভূতি দূর করা চাই এবং দুআ করুন, আল্লাহ্ যেন এমন আনন্দের প্রবণতা দূর করে দেন।' (প্রাগুক্ত)

হযরত থানভী (রহ.)-এর প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ, এ অবস্থায় এক কাজ এই যে, অন্যের ক্ষতিতে আপনার মনে যে আনন্দ জাগছে, সচেতনভাবে চিন্তা করুন যে, এই আনন্দটা ভালো নয়;' এটা খুবই মন্দ বিষয়। 'সচেতনভাবে চিন্তা করার' কথা এজন্য বলা হচ্ছে যে, স্বভাবগতভাবে যে আনন্দ এসে যায় এটা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের বাইরের বিষয়। আর এ ধরনের বিষয়ে মানুষ অপারগ, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পাকড়াও হবে না। কিন্তু চিন্তা ও বিশ্বাসে এই বোধটা জাগ্রত করতে হবে যে, মনের ওই অবস্থাটা খুবই নীচ প্রবণতা। এটা দূর করা উচিত।

দ্বিতীয় কাজ হল আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআ করা– ইয়া আল্লাহ! আমার মনে যে মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে এটা অত্যন্ত নীচু মানসিকতা। আমি স্বীকার করছি যে, এই আনন্দটা আমার না হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ইয়া আল্লাহ! এটা আমার ইচ্ছা ও কর্মের বিষয় নয়। তুমি নিজ অনুগ্রহে এটা দূর করে দাও।

অনিচ্ছাকৃত ভাবনা গোনাহ্ নয় তবে মন্দ

দেখুন, হযরত থানভী (রহ.) একথা বলেননি যে, তোমার অন্তরে যে আনন্দ হয়েছে তা অনেক বড় গোনাহ। কেননা, অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বভাবের প্রেরণায় যে অনুভূতিগুলো মানব-মনে সৃষ্টি হয় তাতে গোনাহ হয় না। এর কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তিও হবে না। কেননা, এগুলো মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এই অনুভূতিগুলোকে যদি অন্তরে স্থান দেওয়া হয় এবং এগুলোকে গোনাহ মনে না-করা হয় তাহলে একসময় এগুলো কীনা ও হিংস্রতার রূপ ধারণ করে স্থায়ী হয়ে যাবে। এর ফলে গোনাহের কাজও সংঘটিত হতে থাকবে। গীবত-শেকায়েত হবে, মনে কষ্ট দেওয়া হবে, মন্দ কথা বলা হবে। এজন্য এই ভাবনারই চিকিৎসা করুন, এইভাবে যে, একে মন্দ ভাবুন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করুন।

এই দুই কাজ তো সঙ্গে সঙ্গেই করুন এবং তৃতীয় কাজ এই হবে যে, এই অনুভূতির বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবেন না।

অন্যের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টকে নিজের বদ আমলের ফলাফল মনে করা

এক ব্যক্তি হযরত থানভী (রহ.)কে পত্র লিখলেন–

> 'কামনা করি, যেন প্রতিপক্ষের বিরোধীতাকে নিজের অসমীচীন কার্যকলাপ ও মন্দ কাজকর্মের ফলাফল মনে করি।'
>
> (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৫)

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে নিগৃহীত হলে মানুষের মনে শত্রুতা ও প্রতিশোধ পরায়ণতা সৃষ্টি হয় এজন্য পত্র লেখক লিখেছেন যে, আমার ইচ্ছে হয় যে, যখনই কারো দ্বারা কষ্ট পাই, তখন যেন তার বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে এই চিন্তা আসে যে, মিয়া! দুনিয়াতে মানুষ যেসব কষ্ট ভোগ করে তা তার বদ আমলের কারণে এসে থাকে। কুরআন শরীফে এসেছে–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشورى : ٣٠)

অর্থাৎ, তোমরা যেসব কষ্ট-মুসীবত ভোগ করে থাক তা তোমাদের নিজেদের কর্মের কারণেই এসে থাকে। তাহলে কেউ যদি আমাকে গালমন্দ করে, কেউ যদি কষ্ট দেয় তাহলে এটাও আমার বদ আমলের কারণেই হয়েছে। যদি আমি বদ আমল না করতাম তাহলে এই লোক আমাকে কষ্ট দিত না। কোনো মানুষ, কোনো প্রাণী কিংবা যায়েদ, উমর, বকর যে কেউ হোক এদের মাধ্যমে পাওয়া কষ্টটা প্রকৃতপক্ষে আমারই কর্মের ফল। কেউ যদি আমাকে প্রহার করে তাহলে সে আমাকে প্রহার করছে না; বরং আমি প্রহৃত হচ্ছি আমারই কোনো মন্দ কর্মের কারণেই।

জল্লাদ বাদশাহর হুকুমের অধীন

বাদশাহ যদি জল্লাদকে আদেশ দেন যে, অমুককে একশ বেত লাগাও এবং জল্লাদ তা পালন করে তাহলে প্রহারকারী ওই জল্লাদ হলেও কিন্তু সে তো প্রহার করেছে বাদশাহর আদেশে। এজন্য যাকে বেত্রাঘাত করা হচ্ছে সে জানে, আমার প্রকৃত শত্রু জল্লাদ নয়, বাদশাহ। এজন্য কখনো যদি সে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা করে তাহলে জল্লাদের উপর নিবে না। কেননা, বাদশাহ যখন বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছে তখন এই আদেশ লঙ্ঘন করার শক্তি তার নেই। ওই আদেশ পালন করতেই সে বাধ্য এবং এটাই তার দায়িত্ব।

'তাকদীর' তার মাধ্যমে করিয়ে নিচ্ছে

অতএব, যদি এ চিন্তা জাগ্রত হয় যে, যে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে তার কী ক্ষমতা আমাকে কষ্ট দেওয়ার, এটা তো 'তাকদীরে'র কাজ, যা তার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর তাকদীরের পক্ষ থেকে এটা এজন্যই এসেছে যে, আমি কোনো মন্দ কাজ করেছিলাম, যার সাজা আমাকে দুনিয়াতেই দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আমি কষ্টদাতার প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হব। এই চিন্তাটা মনে এলে শত্রুর পক্ষ থেকে কষ্ট ভোগ করলেও অন্তরে শত্রুতা পয়দা হবে না।

এই ভাবনা ইচ্ছার অধীন

হযরত থানভী (রহ.) উত্তরে লেখেন–

> 'এই কথা স্মরণ করাটা মানুষের সামর্থের কাজ এবং বার বার স্মরণ করার দ্বারা এই মানসিকতা স্থায়ী হয়ে যাবে।' (প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ, আমি যে কষ্ট ভোগ করছি তা আমার মন্দ কর্মের কারণেই এসেছে– এই চিন্তাটা মানুষের সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ এবং বারবার এই কাজ করার দ্বারা ধীরে ধীরে তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

হযরত জুন্নুন মিসরী (রহ.)-এর ঘটনা

'রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা'তে হযরত জুননুন মিসরী (রহ.)-এর একটি ঘটনা আছে। একবার তিনি পথ চলছিলেন, কোনো নির্বোধ তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পিছনে চলতে লাগল। লোকটির হাতে একটি লাঠি ছিল। সে তা দিয়ে হযরত জুননুন মিসরী (রহ.)-এর মাথায় আঘাত করল। সে সময় হযরত জুননুন (রহ.)-এর মুখ থেকে সর্বপ্রথম যে বাক্য বের হল তা এই ছিল–

"اِضْرِبْ رَأْسًا طَالَمَا عَصَى اللّٰهَ"

'মার এই মাথাকে, সে তো দীর্ঘকাল আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত।'

অর্থাৎ, এই কষ্টকে তিনি নিজের কর্মের প্রতিফল বলেই গণ্য করেছেন।

আমি সবচেয়ে বড় পাপী

একবার এ জুননুন (রহ.)-এর কাছে লোকেরা এসে বলল যে, হযরত! দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে না, দুআ করুন, আল্লাহ যেন দুর্ভিক্ষ দূর করে দেন। তিনি উত্তরে বললেন, পাপাচারের কারণে এই এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে না। আর আমিই হলাম এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পাপী। অতএব, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হয়তো আমার চলে যাওয়ার পরে এই এলাকায় আল্লাহর রহমত আসবে এবং বৃষ্টি হবে। তিনি নিজেকে সর্বনিকৃষ্ট বলে গণ্য করলেন।

এইসব কিছু হচ্ছে কারো ইঙ্গিতে

মোটকথা, এই কথা সঠিক যে, কারো ক্ষমতাই নেই অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়ার, না কোনো মানুষের ক্ষমতা আছে, না কোনো পশু-প্রাণীর, না কোনো জ্বীনের। যা কিছু হচ্ছে অন্য কারো পক্ষ থেকেই হচ্ছে এবং এর পিছনেও রয়েছে অনেক হেকমত-রহস্য। আমার-আপনার যুক্তিতে যেহেতু ওইসব হেকমত আসে না তাই আমরা অস্থির হয়ে বিলাপ করতে থাকি।

দুনিয়াতেই পাক সাফ করতে চান

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন, কেউ যদি কোনো বাঘের খাচায় আটকা পড়ে যায় তাহলে তার ইচ্ছার কোনো অবকাশ থাকে না। সমর্পণ ও হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না। যদি তোমার ভক্ষণ করতে ইচ্ছা হয় তাহলে ভক্ষণ কর, রক্তাক্ত করতে ইচ্ছা হলে রক্তাক্ত কর। এটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এভাবে প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, এই বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটছে সব 'মালিকুল মুলক ওয়াল মালাকূত' এর ফয়সালায় ঘটছে। কেউ যদি তোমাকে পাথর মারে তো সেটা তাঁরই ফয়সালায় হচ্ছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই ফয়সালা কেন হল? এই ফয়সালা এজন্যই হয়েছে যে, তুমি মন্দ কাজ করছিলে আর আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, দুনিয়াতেই শাস্তি হয়ে যাক, যেন আখেরাতের আযাব পেতে না হয়। কেননা পথ তো দুটোই : হয় আখেরাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন অথবা দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করেছেন, আখেরাতের আযাবের পরিবর্তে দুনিয়াতেই সাজা দিয়েছেন যেন এখানেই হিসাব-কিতাব পরিষ্কার হয়ে যায়।

এই ভাবনা 'কীনা' -বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিলুপ্ত করে

অতএব যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে– এটা কারো ফয়সালা মোতাবেকই হচ্ছে। তাহলে কষ্টদাতার প্রতি শত্রুতা পোষণ করার কী প্রয়োজন? শত্রুতা যদি পোষণ করতেই হয় নিজের কৃতকর্মের প্রতি কর, যার কারণে তোমাকে এই কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। এভাবে চিন্তা করলে ইনশাআল্লাহ কারো প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

আটান্নতম মজলিস

হুব্বে দুনিয়া (দুনিয়ার ভালোবাসা) ও তার চিকিৎসা

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হবে দুনিয়া নয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই

হযরত থানভী (রহ.) একজন সালিকের চিঠির উত্তরে লেখেন–

> 'স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা যদিও দুনিয়া বলেই গণ্য কিন্তু তা মুবাহ (বৈধ); বরং পসন্দনীয়। তবে শর্ত এই যে, দ্বীন সম্পর্কে যেন উদাসীন না করে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা গভীর হওয়া কাম্য। যখন তাকওয়া গভীর হয় তখন স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও গভীর হয়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৫)

যেসব বিষয় গোনাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তা 'দুনিয়া'

যে 'দুনিয়া' সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

সকল পাপের মস্তিষ্ক হচ্ছে দুনিয়ার আকর্ষণ। আরো বলা হয়েছে–

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (الحديد : ٢٠)

'দুনিয়াবী যিন্দেগী হল ধোকার উপকরণ।'

এ সবই (নিম্নোক্ত) দু' বিষয়ের কোনো একটি : এক. দুনিয়ার সঙ্গে এমন সম্পর্ক হয়ে যাওয়া যা মানুষকে গোনাহর কাজে লিপ্ত করে। বলাবাহুল্য যে, ফরয-ওয়াজিব পরিত্যাগ করাও গোনাহের অন্তর্ভুক্ত।

বৈধ কাজেও অতি মগ্নতা 'দুনিয়া' বলে গণ্য

দুই. যদিও দুনিয়াবী কাজকর্ম সরাসরি কোনো গোনাহের কাজে লিপ্ত করেনি কিন্তু এতে এত বেশি মগ্ন করে দিয়েছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো

চিন্তার ফুরসতই তার হয় না। সারা দিন ঐ এক চিন্তাই দিল-দেমাগকে আচ্ছন্ন করে রাখে, আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও আখেরাতের চিন্তা মনেই আসে না। যদিও একে ফতোয়ার ভাষায় গোনাহ বলা যাবে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত কোনো 'গোনাহে'র কাজে সে লিপ্ত হয়নি, কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, এই অতিমগ্নতা একসময় গোনাহ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এইজন্য দুনিয়ার ব্যাপারে এত বেশি মগ্নতা না হওয়া চাই।

এগুলো না হলে দুনিয়া ক্ষতিকর নয়

যদি দুনিয়ার সঙ্গে উপরোক্ত দুই ধরনের সম্পর্ক না হয় অর্থাৎ, কোনো গোনাহর কাজেও লিপ্ত হয়নি কিংবা বৈধ বিষয়েও এত বেশি নিমগ্ন হয়নি যে, রাত-দিন দুনিয়ার চিন্তায় মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাহলে দুনিয়া ক্ষতিকর হওয়ার পরিবর্তে উপকারী হয়ে যায় এবং তা আল্লাহর নৈকট্য ও আখেরাতের সাফল্য অর্জনের উপায় হয়ে যায়। অতএব উপরোক্ত বিষয় দু'টি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তাহলে দুনিয়া ক্ষতিকর হবে না।

মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন–

چیست دنیا از خدا غافل شدن - نے قماش ونقرہ وفرزند وزن

'দুনিয়া' হল আল্লাহকে বিস্মৃত হওয়া। এই কাপড়-চোপড়, সোনা-চাঁদি, স্ত্রী-সন্তান 'দুনিয়া' নয়।

যদি পার্থিব কারণে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়, আখেরাতকে ভুলে যায় তাহলে তা নিন্দনীয় ও অশুভ। তা না হলে সহায়-সম্পদের প্রাচুর্যও নিন্দিত নয়।

সকল 'আহলে দুনিয়া' কি কাফের

এক বুযুর্গের একটি পংক্তি আছে–

اہل دنیا کافران مطلق اند - ہر دم اندر بق بق و در چق چق اند

দুনিয়াদার হল খাঁটি কাফেরগোষ্ঠী– সর্বদা বকবক ও চুকচুক-এর মধ্যেই মগ্ন।

এই পংক্তির উপর আপত্তি হয় যে, ওই বুযুর্গ দুনিয়াদারদের সরাসরি কাফের বলে দিলেন! তারা সর্বদা বকবক ও চক্চক্ করে বলে?

এর ব্যাখ্যা এই যে, এখানে 'দুনিয়াদার' বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা দুনিয়ার আল্লাহকে অস্বীকার করে দিয়েছে এবং কুফর অবলম্বন করেছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হযরত থানভী (রহ.) করেছেন, অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাখ্যা। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এই পংক্তিতে 'দুনিয়াদার' শব্দটি مبتدا। (উদ্দেশ্য) নয়, خبر (বিধেয়) আর 'খাটি কাফেরগোষ্ঠী' হল মুবতাদা (উদ্দেশ্য)। তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়াদাররা কাফের বরং অর্থ হল কাফিররাই প্রকৃত দুনিয়াদার।

আল্লাহ-বিস্মৃতিই 'দুনিয়া'

মোটকথা, পার্থিব ধন-সম্পদ 'দুনিয়া' নয়। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হল আল্লাহ বিস্মৃতির নাম। আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে– এ কথা ভুলে যাওয়া হল 'দুনিয়া'। এই বিস্মৃতি যদি না হয় তাহলে এই দুনিয়াই আখেরাতের জন্য সহায়ক হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলাই আদেশ দিয়েছেন নিজের দেহ ও প্রাণের হক আদায় করার, স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় করার, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শির হক আদায় করার। এই হকগুলো আদায়ের জন্য যদি দুনিয়া উপার্জন করা হয় তাহলে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা হচ্ছে। অতএব, তা আল্লাহ-বিস্মৃতি নয় এবং নিন্দিত 'দুনিয়া' নয়; বরং এমন 'দুনিয়া'র ব্যাপারেই বলা হয়েছে–

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ (سورة الجمعة : ١٠)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার করুণা অন্বেষণ কর।

দুনিয়াকে 'আল্লাহর করুণা' বলা হয়েছে। কেননা, বান্দা যখন আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত দায়িত্বগুলো আদায়ের জন্য দুনিয়া অন্বেষণ করে তখন তা হয় আল্লাহর করুণা। সেটা নিন্দিত দুনিয়া নয়; বরং দ্বীন ও আখেরাতের পাথেয়।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত

হযরত থানভী (রহ.) যে বলেছেন, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা শরীয়তে কাম্য এর সূত্র হচ্ছে কুরআন মাজীদের এই আয়াত–

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً (سورة الروم : ٢١)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে প্রীতি ও করুণা সৃষ্টি করেছেন। এই ভালোবাসা আল্লাহর দান। হাদীস শরীফে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ وَاَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِيْ

(ترمذى، كتاب النكاح، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। (তিরমিযী)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

(بخاری، كتاب النكاح، باب المداراة مع النساء)

অর্থাৎ, মহিলাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের অসীয়ত আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর। (বুখারী)

সুতরাং এই আদেশগুলো পালন করা উদ্দেশ্য কেউ যখন স্ত্রীকে ভালোবাসে তখন তা আর দুনিয়া থাকে না; বরং সরাসরি দ্বীন হয়ে যায়।

তাকওয়া যত বাড়ে স্ত্রীর প্রতি মহব্বতও তত বাড়ে

এজন্যই হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, মানুষের তাকওয়া-খোদাভীতি বৃদ্ধি পাওয়ার দ্বারা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। কেননা, সে জানে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। আমি তা আদায় করতে বাধ্য। এই নিয়তে যখন সে তা আদায় করে তখন সওয়াবের অধিকারী হয়।

আমাদের ও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য

এজন্য যত ওলীয়ে কামেল অতিবাহিত হয়েছেন তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। আমরাও আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসি তবে তাদের মতো গভীর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে নেই। এরপরও আরেকটি বড় পার্থক্য রয়েছে। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তারাও স্ত্রী-সন্তানকে ভালোবাসতেন, আমরাও ভালোবাসি, তারাও সন্তানদের সঙ্গে খেলা করতেন, আমরাও করি, তারাও স্ত্রীর প্রতি আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতেন আমরাও করি, কিন্তু একটা বড় পার্থক্য রয়েছে।

তাঁদের ভালোবাসা হক আদায়ের জন্য

পার্থক্যটা হল, আমরা ভালোবাসি আনন্দ লাভের জন্য। যেমন আমরা যখন শিশুদের সঙ্গে খেলা করি তখন এজন্য করি যে, এতে একটা নির্মল আনন্দ রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য-সম্পর্ক এজন্য হয় যে, এতে আনন্দের বিষয় আছে, কিন্তু আল্লাহর ওলীগণ এজন্য ভালোবাসেন যে, আল্লাহ তাদের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করেছেন। তাই এই বিষয়গুলোতেও তারা ওই নূর ও নূরানিয়াত

অনুভব করেন যা আল্লাহর বন্দেগীর সময় অনুভব করে থাকেন। এজন্য আমাদের ভালোবাসা ও তাঁদের ভালোবাসায় আকাশ-পাতালের ব্যবধান।

পূণ্যাত্মা স্ত্রীদের সঙ্গে নবীজীর (সা.) মধুর ব্যবহার

আমি আমার শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই ছাহেব আরেফী (রহ.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, একদিন হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বললেন, প্রথমে আমার খুব আশ্চর্য বোধ হত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পূণ্যাত্মা স্ত্রীদের প্রতি কীভাবে এত হৃদ্যতা ও ভালোবাসার আচরণ করেন, যা বিভিন্ন হাদীস শরীফে এসেছে? যেমন হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করছেন, কাঁধের পিছনে দাড় করিয়ে হাবশীদের যুদ্ধের মহড়া দেখাচ্ছেন, রাতের বেলায় এগারো মহিলার কাহিনী শোনাচ্ছেন! যাঁর সম্পর্ক সর্বদা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যুক্ত, যার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে, ফেরেশতাদের আগমন অব্যাহত রয়েছে, ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে যার সম্পর্ক সর্বদা অবিচ্ছিন্ন তিনি পার্থিব এই সামান্য বিষয়ে কীভাবে মনোযোগ দেন? এটা ভেবে আমার খুব আশ্চর্য বোধ হত।

দুই বিষয় একত্র হতে পারে

এরপর বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! এখন বুঝে আসছে যে, এই দুটো বিষয় একত্র হতে পারে। কেননা, স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে তাদের যে আচরণ প্রকৃতপক্ষে তা সাধারণ মানুষের আচরণের মতো নয়। এর প্রকৃতিটাই ভিন্ন। কেননা, এই বিষয়গুলোও তাদের কাছে আল্লাহর স্মরণেরই সূত্র। তাঁদের নিয়ত ও উপলব্ধি সঠিক হওয়ার কারণে দুনিয়ার সকল কাজেই ওই নূর ও নূরানিয়াতের স্পর্শ পেয়ে থাকেন যা তারা ইবাদত ও বন্দেগীর মধ্যে পেয়ে থাকেন।

'কুতবী' পড়ে ঈসালে সওয়াব!

আমি আমার ওয়ালিদ ছাহেবের কাছ থেকে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব (রহ.)-এর একটি ঘটনা শুনেছি। একদিন শায়খুল হিন্দ (রহ.) 'কুতবী' পড়াচ্ছিলেন, যা ইলমে মানতেক (যুক্তি ও তর্কশাস্ত্রের) একটি কিতাব। দরসের মধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললেন, আমার আম্মা ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর জন্য ঈসালে সওয়াবের দরখাস্ত করছি। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) হাত ওঠালেন এবং দুআ করতে লাগলেন, ইয়া আল্লাহ! আমরা এই যে সবক পড়ছি এর সওয়াব তাকে পৌঁছে দিন। আবেদনকারী অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে, কুতবী কিতাবেরও ঈসালে সওয়াব হয়! কুরআন মাজীদ বা হাদীস শরীফ

পড়ে ঈসালে সওয়াব করা হত তাহলে বিষয়টা বোধগম্য হত, কিন্তু কুতবী কিতাবের ঈসালে সওয়াব হয় কীভাবে?

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) বললেন, মিয়া! আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও করমে নিয়ত যদি শুদ্ধ থাকে তাহলে আমার কাছে বুখারী শরীফ ও কুতবীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে সওয়াব বুখারী শরীফে হবে তা কুতবীতেও হবে ইনশাআল্লাহ্।

'মোল্লা হাসানে'র দরসে অন্তরে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জারী

আমি ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)-এর কাছে শুনেছি, আমার দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন ছাহেব (রহ.) বলতেন, আমরা শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে মানতেকের কিতাব 'মোল্লা হাসান' পড়তাম। ওই সবকে আমরা পরিষ্কার শুনতে পেতাম যে, তাঁর কলব থেকে আল্লাহ্ আল্লাহ্ ধ্বনি আসছে! ভাবুন, 'মানতেকে'র সবকেও এই বিষয়টা ঘটত, যে শাস্ত্রকে লোকেরা 'নাপাক' পর্যন্ত বলে দিয়েছে। তাহলে সেই সবকেও নূর ও বরকত ছিল যেহেতু নিয়ত শুদ্ধ ছিল এবং পন্থা সঠিক ছিল। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিয়তকে শুদ্ধ করে দিন। আমীন।

ইত্তেবায়ে সুন্নত অবলম্বন করুন

প্রত্যেক বিষয়ে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নিয়ত করুন। কেননা, সুন্নাত গোটা জীবনকেই ধারণ করে। জীবনের যে পর্যায়েরই বিষয় হোক না কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্য় তার সূত্র পাওয়া যাবে। তাই প্রত্যেক কাজে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের নিয়ত করুন, দুনিয়ার সব কাজ দ্বীনের কাজে পরিণত হবে। সেসব কাজেও এমনই নূর ও বরকত অনুভূত হবে যা ইবাদত-বন্দেগীতে হয়ে থাকে। এরপর তা নিন্দিত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এর জন্য মশ্ক প্রয়োজন

তবে এর জন্য মশ্ক লাগবে। আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.) বলতেন, দীর্ঘদিন ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মশক করেছি। যেমন, খানা সামনে এসেছে। সুস্বাদু খাবার, ক্ষুধাও পেয়েছে, খেতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছি যে, ইচ্ছা হচ্ছে এজন্য খাব না, পর মুহূর্তেই ভেবেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দেহ ও প্রাণের প্রতিও আমাদেরকে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন এবং হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অভ্যাস এই ছিল যে, যখন তাঁর সামনে খাবার আসত তখন আল্লাহর শোকরগুজারীর সঙ্গে খাবার গ্রহণ করতেন। আমিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণে খাবার খাব। এরপর বিসমিল্লাহ পড়ে খাবার শুরু করতাম। যেহেতু নিয়ত শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই এই খাবারও 'দুনিয়া' থাকেনি 'দ্বীনে' পরিণত হয়েছে।

প্রত্যেক কাজকে দ্বীনে পরিণত করুন

ধরুন, আপনি ঘরে প্রবেশ করলেন বাচ্চাকে খেলতে দেখে আনন্দ হল। ইচ্ছা হল তাকে কোলে নিয়ে আদর করবেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন এবং ভাবলেন যে, ইচ্ছে হচ্ছে এজন্য এই কাজ করব না, পর মুহূর্তেই ভাবলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদেরকে আদর করতেন, তাঁরই অনুসরণে আমি তাকে কোলে নিয়ে আদর করব। এরপর তাকে কোলে নিয়ে আদর করলেন তাহলে এই কাজটাও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের কারণে 'দ্বীন' হিসেবে গণ্য হবে।

সারকথা

সারকথা এই যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবনের কোনো কাজ এমন নেই যাকে নিয়ত ও উপলব্ধির বিশুদ্ধতার মাধ্যমে ইত্তেবায়ে সুন্নাত বা দ্বীন বানানো যাবে না। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উনষাটতম মজলিস

গাফলত (আল্লাহ-বিস্মৃতি) ও তার চিকিৎসা

গাফলতের প্রতিকার মাসনূন দুআসমূহ

গাফলতের প্রতিকার মাসনূন দুআসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

কোন উদাসীনতা নিন্দিত

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'নিন্দিত উদাসীনতা হল অবসর সময়েও আল্লাহ তাআলাকে বিস্মৃত থাকা এবং বিনা প্রয়োজনে এমন দায়িত্ব গ্রহণ করা যা আল্লাহর স্মরণে প্রতিবন্ধক হয়।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৬)

যে কথাটা বারবার বলা হয় যে, আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকা উচিত নয় এই বিস্মৃতি ও উদাসীনতার অর্থ কী? কোন ধরনের উদাসীনতা পরিহারযোগ্য? উপরোক্ত মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) তা ব্যাখ্যা করেছেন। দুটি বিষয় এই উদাসীনতার অন্তর্ভুক্ত।

অবসর সময়েও আল্লাহকে ভুলে থাকা

এক. অবসর সময়েও আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকা। অর্থাৎ, যখন মানুষ কোনো কাজে ব্যস্ত নয় তখন তার অন্তরে আল্লাহর স্মরণ জাগে না এবং অবকাশের সময়ও আল্লাহর স্মরণ কিংবা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চিন্তা মনে জাগে না, এ সময়ও শুধু দুনিয়ার চিন্তাতেই মন আচ্ছন্ন থাকে, পার্থিব ধন-সম্পদ, শোভা ও আনন্দ এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের চিন্তাতেই ডুবে থাকে এটাই গাফ্লত ও আল্লাহ-বিস্মৃতি। এটি একটি অবস্থা।

আল্লাহর স্মরণে প্রতিবন্ধক পেশা গ্রহণ

দ্বিতীয় বিষয় হল, স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে এমন কোনো পেশা অবলম্বন করা, যা আল্লাহর স্মরণে প্রতিবন্ধক হয়। আল্লাহর স্মরণে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল গোনাহ ও গোনাহের পক্ষে সহায়ক পেশা ও কাজ। কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে এ জাতীয় পেশা অবলম্বন করে তাহলে তা গাফলত ও আল্লাহ বিস্মৃতির অন্তর্ভুক্ত।

যেমন একটি কাজ মূলত বৈধ ও মুবাহ কিন্তু আশঙ্কা আছে যে, এ কাজে মগ্ন হলে আল্লাহর স্মরণ বিনষ্ট হবে এবং এই আশঙ্কাও আছে যে, এই বৈধ কাজে মগ্ন হলে পরে কোনো গোনাহের কাজেও লিপ্ত হয়ে যেতে হবে।

গাফেলদের সঙ্গী হওয়া গাফলতের অন্তর্ভুক্ত

ধরুন, কিছু আল্লাহ-বিস্মৃত গাফেল মানুষের সমাবেশ। কেউ বিনা প্রয়োজনে তাতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা করল অথচ তার জানা আছে যে, এটা এমন লোকদের সমাবেশ যারা আখেরাত থেকে গাফেল এবং সে সমাবেশে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আখেরাতের আলোচনা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই; বরং সম্ভাবনা আছে যে, সেখানে বিভিন্ন গোনাহের কাজ হবে, এরপরও সে স্বেচ্ছায় সেখানে গেল তাহলে সে নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করল। তার এই কাজও 'গাফলত'-এর অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়াবী কাজকর্ম গাফলত সৃষ্টি করে

মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, সে গোনাহের দিকেই আগে ধাবিত হয়। এই পাপ-প্রবণতাই মানুষকে ফেরেশতা থেকে আলাদা করেছে। এই প্রবণতা যদি না থাকত তাহলে মানুষে-ফেরেশতায় কোনো পার্থক্য থাকত না। একই সঙ্গে মানুষকে এই আদেশও করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে থাক, খাও, পান কর, উপার্জন কর, ভোগ কর এবং স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বসবাস কর। কিন্তু সাবধান, গোনাহ করবে না। কিন্তু মানুষ যখন দুনিয়াবী কাজকর্মে বের হয় তো এগুলোর বৈশিষ্ট্যই হল, মানুষের মধ্যে গাফলত ও আল্লাহ-বিস্মৃতি সৃষ্টি করে।

দুআ পড়ার দ্বারা গাফলত দূর হয়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরবান হোন। তিনি এমন এক পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন যা অনুসরণ করলে দুনিয়াবী কাজকর্মও মানুষকে গাফেল বানাতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি কদমে এবং প্রতি কাজের শুরুতে এক একটি দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে এই দুআ পড়, ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দুআ পড়, বাজারে গেলে এই দুআ পড়, খাবার সামনে এলে এই দুআ পড়, খাবার শেষ হলে এই দুআ পড়, পানি পান করার সময় এই দুআ পড়, বাথরুমে যাওয়ার আগে এই দুআ পড়, বাথরুম থেকে বের হয়ে এই দুআ পড়, বিছানায় গিয়ে এই দুআ পড়, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের সময় এই দুআ পড়। এই সকল মাসনূন

দুআ, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়ে দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য হল দুনিয়াবী কাজকর্মে মগ্ন হওয়ার দ্বারা মানুষের মধ্যে যে আল্লাহ বিস্মৃতি সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা করা। যে প্রত্যেক কাজের শুরুতে দুআ পড়ে দুনিয়াবী কাজকর্ম আরম্ভ করে তাকে কীভাবে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করবে? এমন ব্যক্তিকে দুনিয়া কখনো গাফেল বানাতে পারবে না। কেননা সর্বাবস্থায় সে আল্লাহকেই স্মরণ করছে।

আল্লাহ-বিস্মৃতিই গাফলত

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং যে সব কাজ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় সেগুলো ভুলে যাওয়ার নামই গাফলত। এর সর্বোত্তম চিকিৎসা মাসনূন দুআ। মাসনূন দুআ মামুলি বিষয় নয়, কিন্তু আমরা যখন পড়েছি যে, মাসনূন দুআ মুস্তাহাব এবং এই নীতি আমাদের জানা আছে যে, মুস্তাহাব এমন কাজকে বলে, যা করলে সওয়াব, না করলে গোনাহ নেই তখন আমরা ভাবতে লাগলাম, তাহলে আর মাসনূন দুআ না পড়লে কী হয়? এজন্য মৌলভী সাহেবরা এই দুআগুলো পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেন না। কেননা অন্তরে এর গুরুত্ব নেই। এই অবস্থাটা মোটেই ভালো নয়।

মুস্তাহাব কাজও করা চাই

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব আরেফী (রহ.) বলেন যে, একবার আযান হচ্ছিল, তখন একজন আলেম কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কেউ বলল, হযরত! আযান হচ্ছে, এখন কথাবার্তা না বললেই ভালো। সেই আলেম বললেন, হাঁ, জানি। আযানের জওয়াব দেওয়া তো ফরয-ওয়াজিব নয়! যেন যে কাজগুলো ফরয-ওয়াজিব নয় তা করণীয়ও নয়! তাতে কোনো ফযীলতও নেই! এমন ইলম তো বড় নিরস ইলম, যা শুধু আইনের কাজ করায়! ইশক ও মহব্বত এবং প্রেম ও ভালোবাসারও যে একটা দাবি আছে সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই!

তাবলীগে বের হওয়ার দ্বারা দুআ ইয়াদ হয়

লোকেরা তাবলীগ জামাতে যায়। সেখানে কিছুদিন থাকার দ্বারা মাসনূন দুআগুলো ইয়াদ হয়ে যায়। কেননা তারা নিজেরাও দুআ পড়েন, অন্যদেরও দুআ শেখান। কিন্তু সাধারণভাবে লোকদের মাসনূন দুআ ইয়াদ থাকে না। কারণ হল, এই বিষয়ে সচেতনতাই নেই। আরে ভাই! যখন দ্বীন শেখার জন্য বের হবে এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলো পূরণ করবে তখন দুআসমূহ মুখস্থ হয়ে যাবে।

এটাতো আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী যে, এইসব দুআকে ফরয-ওয়াজিব বানাননি। কেননা, ফরয-ওয়াজিব হলে তো মানুষ কষ্টে পড়ে যেত। কিন্তু এগুলোর উপকারিতা এত গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে মানুষ তা অনুমানও করতে পারে না।

মাসনূন দুআ আল্লাহ তাআলার পুরস্কার

প্রথমত যেসব দুআ হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় করেছেন এগুলো এমন দুআ যে, মানুষ যদি সারা জীবন সিজদায় পড়ে থাকে তবুও এমন দুআ করার তাওফীক হবে না। ওই দুআগুলোর মধ্যে কোনো একটি দুআও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে বেড়া পার।

এরপর এই দুআগুলোর বড় সুফল এই যে, এভাবে আল্লাহর যিকিরের তাওফীক হয় এবং দুনিয়াবী কাজকর্মে মগ্ন হওয়ার কারণে যে গাফলত প্রবণতা পয়দা হওয়ার আশঙ্কা ছিল তা থেকে এই দুআগুলো মানুষকে রক্ষা করে।

আল্লাহ্ বিস্মৃতি বড় বিপদ

এই গাফলত অনেক বড় বিপদ। আল্লাহ রক্ষা করুন। মানুষ যদি ভুল করে কোনো গোনাহ করে তাহলেও এত পেরেশানীর কারণ নেই। তাওবা কর আশা আছে যে, গোনাহ মাফ হয়ে যাবে, কিন্তু গাফলত! গোনাহ করা হচ্ছে, কিন্তু কোনো অনুভূতিই নেই! কখনো মনে এই প্রশ্নই জাগছে না যে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে তখন কী জওয়াব দিব? আখেরাতের কোনো চিন্তাই নেই। এগুলো হচ্ছে গাফলতের ফলাফল। এজন্য গাফলত অনেক বড় বিপদ। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলিমকে এ থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন। এই দুআগুলো এই বিপদ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। এগুলো মামুলি বস্তু নয়। এজন্য এ বিষয়ে যত্নবান হোন। কোন্ সময় কী দুআ আছে নিজেও মুখস্থ করুন, বাচ্চাদেরকেও মুখস্থ করান। দুআর বিভিন্ন কিতাব আছে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর কিতাব 'মুনাজাতে মকবুল' নামে রয়েছে। আমারও একটি পুস্তিকা 'পুরনূর দুআয়েঁ' নামে আছে। এতে মাসনূন দুআগুলো সংকলিত হয়েছে। যে এই দুআগুলো পড়তে অভ্যস্ত হবে সে কখনো গাফলতের শিকার হবে না।

ইংল্যান্ডে স্কুলের শিশুরা ও মাসনূন দুআ

একবার আমার ইংল্যান্ড যাওয়া হল। স্কটল্যান্ড রাজ্যের একটি শহর গ্লাসগো, সেখানে গিয়েছি। সেখানের লোকেরা প্রোগ্রাম করলেন যে, গোটা স্কটল্যান্ডে মুসলমানদের যত স্কুল আছে সবগুলোর সমাবেশ আহ্বান করবেন এবং সে সমাবেশে সকল স্কুলের সকল শিশুকে একত্র করা হবে। আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল এবং কিছু নসীহত করার জন্য বলা হল। আমি সম্মত হলাম। সেই সমাবেশে গোটা স্কটল্যান্ডের স্কুলগুলোর সকল মুসলিম শিশুরা সমবেত হয়েছিল, যাদের সংখ্যা হবে আড়াই-তিন হাজার। অনেক বড় সমাবেশ ছিল। আমি সেখানে পৌঁছলাম। দায়িত্বশীলরা আমাকে বললেন যে, এখানে প্রায় তিন হাজার শিশু রয়েছে। সকল স্কুলের সমন্বয়ে আমাদের একটি ফেডারেশন রয়েছে। এটা মুসলিম শিশুদের দ্বীনী তালীম-তারবিয়াতের জন্য কাজ করে থাকে। আমরা মুসলিম শিশুদের অন্তরে দ্বীনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সৃষ্টি করার জন্য অনেক কাজ করেছি। একটি কাজ হল আমরা তাদেরকে মাসনূন দুআ শিখিয়েছি। তিন হাজার শিশু আপনার সামনে রয়েছে আপনি যাকে চান যে কোনো সময়ের দুআ জিজ্ঞাসা করুন।

আমি এক শিশুকে প্রশ্ন করলাম, ঘুমের সময় কী দুআ পড়তে হয়? সে সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে দুআ পড়তে আরম্ভ করল। আরেকজনকে বাজারে যাওয়ার দুআ জিজ্ঞাসা করলাম, সেও সঙ্গে সঙ্গে তা পড়ল। প্রায় তিন হাজার শিশু উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক শিশুর মাসনূন দুআসমূহ কণ্ঠস্থ ছিল। এই শিশুরা বৃটেনের মতো দেশে বসবাস করে। তারা মাদরাসার ছাত্র নয়, স্কুলের ছাত্র। আমার আনন্দও হল এবং ঈর্ষাও হল যে, যে জিনিস আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন তা তো আমাদের দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

শৈশবেই দুআ মুখস্থ করান

মনে রাখুন, শৈশবেই যে শিশুর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআসমূহ পড়ার তাওফীক হল এবং অভ্যাসে পরিণত হল পরবর্তী জীবনে কোনো বড় শয়তানও তাকে গোমরাহ করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এই দুআই ইনশাআল্লাহ তাকে পথ দেখাবে।

মোটকথা, গাফলত থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম উপায়, মাসনূন দুআ। এ বিষয়ে আমাদের সবার সচেতন হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ষাটতম মজলিস

দুনিয়া মন্দ নয়, দুনিয়ার মুহাব্বত মন্দ

দুনিয়া মন্দ নয়, দুনিয়ার মুহাব্বত মন্দ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

দুনিয়া উপার্জন করা নিষিদ্ধ নয়

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'দুনিয়া উপার্জন করা নিষেধ নয়, তবে দুনিয়ার মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা নিষেধ। এমনকি নিন্দা- সমালোচনার মধ্য দিয়ে হলেও। কেননা, যে বস্তুর কোনো মূল্যই অন্তরে নেই তার সমালোচনাও করা হয় না।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৬)

অর্থাৎ, হালাল উপার্জন নিষেধ নয়। নিষিদ্ধ হল দুটো বিষয় : ১. দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ। এটা নিষেধ। ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ নিষিদ্ধ নয়, যা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে থাকে। তবে এত বেশি আকর্ষণ, যা মানুষকে গোনাহের কাজে লিপ্ত করে কিংবা বৈধ কাজেও অতিরিক্ত মগ্নতা সৃষ্টি করে, তা নিষেধ।

হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-এর দুআ

হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-এর খিলাফত কালে যখন কিসরার ধনভাণ্ডার তাঁর কাছে উপস্থিত হল এবং মসজিদে নববীতে সোনা-চাঁদির স্তূপ হয়ে গেল তখন তিনি একটি দুআ করেছিলেন, ইয়া আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এই দুআ করি না যে, দুনিয়ার মুহাব্বত আমাদের অন্তর থেকে একেবারে দূর করে দিন কেননা, আপনি নিজেই কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

অর্থাৎ, মানুষের জন্য 'কামনার ভালবাসা'কে সুশোভিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, নারীদের মহব্বত, সন্তান-সন্ততির মহব্বত, স্তূপিকৃত সোনা-চাঁদির

মহব্বত, চিহ্নিত ঘোড়ার পালের মহব্বত, চতুষ্পদ জন্তুর মহব্বত, ক্ষেত-খামারের মহব্বত।

এইসব বিষয়ের আকর্ষণ অনেকটা মানুষের স্বভাবের অংশ। অতএব কিছু না কিছু আকর্ষণ এগুলোর দিকে থাকবেই। তাই একেবারে বিলুপ্ত করার দুআ করি না তবে এই প্রার্থনা করছি যে, দুনিয়ার মহব্বত যেন কোনো দ্বীনী দায়িত্বে প্রতিবন্ধক না হয়ে যায় এবং কোনো গোনাহের কারণ না হয়ে যায়।

দুনিয়াকে মন ও মস্তিষ্কে স্থান দেওয়া নিষেধ

মোটকথা, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও পার্থিব বিষয়-আশয়ের প্রতি যে স্বভাবগত আকর্ষণ আছে তা নিন্দিত নয়। কেননা, এটা মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের বাইরের বিষয়।

তবে তা এমনভাবে অন্তরে পোষণ করা যে, সর্বদা মন-মস্তিষ্ক দুনিয়ারই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, এটা নিষেধ।

দুনিয়ার মাহাত্ম্য অন্তর থেকে বের করে দিন

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, অন্তরে দুনিয়ার মাহাত্ম্য সৃষ্টি করা নিষেধ। দুনিয়ার মাহাত্ম্য বলতে বোঝায়, একে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং দুনিয়ার বিষয়-আশয়কে অনেক বড় সফলতা মনে করা। কিংবা কারূনের ধনভাণ্ডার যারা দেখেছিল তাদের মতো মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। তারা বলেছিল–

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (سورة القصص : ٧٩)

'হায়! আমরাও যদি এমন সম্পদের অধিকারী হতাম যেমন সম্পদ রয়েছে কারূনের! এটা তো বড় সৌভাগ্য!'

ওই দুর্ভাগাদেরতো দুনিয়া কিছুই মিলেনি, উপরন্তু আক্ষেপ করে গোনাহে লিপ্ত হল। দুনিয়ার মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে এত বেশি ছিল যে, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়াকে তারা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করল!

সে তো বড় বদনসীব

দেখুন, কেউ যদি কিছু ধন-সম্পদের অধিকারী হয়, আর সে কিছু ভোগ-বিলাস করে, কিছু আমোদ-প্রমোদ করে তাহলে গোনাহে পতিত হলেও কিছু চাহিদাতো সে পূরণ করল, কিন্তু যে দুনিয়া কিছুই পেল না, শুধু আক্ষেপই করতে থাকল, এমন আক্ষেপ যার কারণে দুনিয়ার বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল তার চেয়ে বদনসীব আর কে হতে পারে?

না খোদা হি মিলা, না বিসালে ছনম্

একজন খুব ভালো বলেছেন–

"بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ"

এখানে ফকীর বলতে সুফী-দরবেশ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যে দরবেশ কোনো আমীরের দরজায় দাড়ানো থাকে সে বড় মন্দ দরবেশ। মন্দ এজন্য যে, সে "خسر الدنيا والآخرة" অর্থাৎ, 'না দুনিয়া, না আখিরাত'-এর দৃষ্টান্ত। দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিও তার জুটল না, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটাল, অন্যদিকে তার আমীরের দরজায় দাড়িয়ে থাকা প্রমাণ করে যে, আমীরত্ব তার কাছে অত্যন্ত মর্যাদার বিষয়। এর মাহাত্ম্য তার অন্তরে রয়েছে। তাহলে তার আখেরাতও বরবাদ হল।

দুনিয়ার মাহাত্ম্য বড় ফিতনা

সে তো বড়ই নীচু মানুষ, যে সম্পদের লোভে গোনাহের কাজ করে। আলহামদু লিল্লাহ! অধিকাংশ মুসলমান এই নীচুতা থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন, আমীন। কিন্তু গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের বিষয়টা এমন যে, অনেক পরহেযগার মানুষও এর শিকার। যেমন মালদারের মাল-দৌলতের কারণে অন্তরে বড় ইয্যত-সম্মান, তার পিছনে পিছনে ঘোরা হচ্ছে, তার সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক বাড়ানো যায় সে চিন্তা করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে গর্ব করা হচ্ছে যে, এত বড় বড় সম্পদশালী আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, এই যে দুনিয়ার বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এটা অনেক বড় ফিতনা। এই ফিতনায় আমরা খুব বেশি আক্রান্ত হয়ে যাই।

মালদারদের বন্ধুত্বের কারণে গর্ব করা

আজকাল আমাদের আলেম-উলামা এ ফেতনায় খুব বেশি লিপ্ত। অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলা হয়, অমুকতো আমার বন্ধু। তার কাছে আমার আসা-যাওয়া আছে। এই গর্বটা কেন করা হচ্ছে? এজন্য যে, ওই লোক সম্পদশালী ও বিত্তবান। তার বিত্ত-বৈভবের কারণে অন্তরে তার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য রয়েছে এবং মানুষের সামনে যখন বলা হয় যে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, আসা-যাওয়া আছে, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব আছে তখন এসবের উদ্দেশ্যে হল, লোকেরাও আমাকে বড় মনে করবে এবং ভাববে যে, তারতো এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক। এটাই প্রমাণ করে যে, অন্তরে দুনিয়ার মাহাত্ম্য রয়েছে। এজন্য কোনো নিঃস্ব-দরিদ্র লোকের সঙ্গে যদি সম্পর্ক থাকে তবে তা লোকের সামনে উল্লেখ

করা হয় না, যে অমুকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক! তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, পরহেযগার। তার কাছে আসা-যাওয়া করি। অথচ বিত্তশালীদের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা করা হয়। বুঝা গেল, দুনিয়ার মাহাত্ম্য দ্বীনের চেয়েও বেশি।

সূরা আবাসা-এর প্রথম আয়াতগুলোর শানে নুযূল

কুরআন মজীদের আয়াত–

"عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى"

কখন নাযিল হয়েছে? একবার হুযূরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কাফেরদের নেতারা উপস্থিত ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযি.) কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন, এতো নিজের মানুষ, যে কোনো সময় মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারবে। কিন্তু এরা কাফেরদের নেতৃস্থানীয় লোকজন, অনেক দূর থেকে এসেছে। যদি এদের মস্তিষ্কে ঈমান বসে যায় তাহলে এরা নিজেদের গোত্রের জন্যও ঈমানের কারণ হয়ে যাবে। একথা ভেবে তিনি ওই সাহাবী থেকে বিমুখ হয়ে তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা করা হল এবং এই আয়াত নাযিল হল। অথচ সাধারণ বিচারে তাঁর চিন্তা একদম সঠিক ছিল। কেননা, এই সাহাবী নিকটের মানুষ। যে কোনো সময় মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে পারবেন। কিন্তু এইসব রঈস লোকেরা কুফরীর মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, হতে পারে নসীহতের কারণে কুফরী পরিত্যাগ করবে। কিন্তু যেহেতু বাহ্যত ওই রঈসদের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছিল এবং একজন দরিদ্র ব্যক্তির দিকে বিমুখতা প্রদর্শন করা হচ্ছিল এজন্য ভর্ৎসনা করা হল। অথচ দুনিয়ার সম্পদ ও প্রাচুর্যের তিলমাত্র মর্যাদা যে তাঁর অন্তরে ছিল না এটা কি বুঝিয়ে বলতে হবে। তবুও আল্লাহর পক্ষ হতে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। তাহলে যেসব ক্ষেত্রে দুনিয়ার কারণে মানুষকে সম্মান করা হয়, বড় মনে করা হয়, আল্লাহ হেফাযত করুন, এটা অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়।

সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, মানুষ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সবচেয়ে সৌভাগ্যশালী মানুষ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সম্পদের মোহ থেকে রক্ষা করেছেন। প্রাচুর্য দিয়েছেন, কিন্তু প্রাচুর্যের মোহ থেকে রক্ষা করেছেন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব তার সামনে পরিষ্কার। এই ব্যক্তি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান।

দ্বিতীয় মানুষ

দ্বিতীয় হল যাকে আল্লাহ না দুনিয়া দিয়েছেন, না দুনিয়ার মহব্বত। দারিদ্রের মধ্যেই তার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে নেই।

তৃতীয় ব্যক্তি

তৃতীয় হল যার সম্পদও আছে, সম্পদের মোহও আছে। এই লোক দুনিয়ার মহব্বতের কারণে যদি গোনাহের কাজে ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তবুও যৎসামান্য দুনিয়াতো ভোগ করল, কিছু ফূর্তিতো করল। সে দুনিয়া পেল, আখেরাত হারাল।

চতুর্থ ব্যক্তি

চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্যায়ের ব্যক্তি হল সবচেয়ে বড় হতভাগা। এর অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রয়েছে, কিন্তু দুনিয়া তার জোটেনি। অর্থাৎ, দুনিয়ার আকর্ষণ, মোহ ও মাহাত্ম্য তার অন্তরে রয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পদ-পদবী ইত্যাদি কিছুই সে পায়নি। শুধু আক্ষেপই আক্ষেপ– আমার যদি একটা বাড়ি থাকত, যদি একটা গাড়ি থাকত! কিন্তু কিছুই সে পেল না, সারাজীবন রিক্ত হস্তেই কেটে গেল। এ হল–

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ (سورة النجم : ١١)

'দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই গেল।'

সে দুনিয়ায় ধন-দৌলতের আক্ষেপ-আকাঙ্ক্ষার কারণে গোনাহগার হল এভাবে সে আখেরাত হারাল। আর ধন-সম্পদও পেল না, ভোগ-বিলাসও করতে পারল না। এভাবে তার দুনিয়া গেল। মোটকথা, অন্তরে যে দুনিয়ার মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে তা এতই ভয়াবহ যে, না জানি এটা আবার আমাকে আপনাকে خسر الدنيا والاخرة এর দৃষ্টান্ত বানিয়ে না দেয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

দামেস্কের এক বুযুর্গের ঘটনা

শামের দামেস্ক শহরে এক বড় আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ বাস করতেন। মসজিদে বসে আল্লাহ আল্লাহ করতেন। লোকেরা তার কাছে সাক্ষাত করার জন্য ও দুআ নেওয়ার জন্য আসত। ধীরে ধীরে গভর্নরের কাছে সংবাদ পৌছল যে, এই বুযুর্গ

অত্যন্ত আল্লাহওয়ালা এবং 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত'। লোকেরা তার কাছে দুআ করানোর জন্য আসে এবং যে দুআ তিনি করেন কবুল হয়। গভর্নর ভাবলেন তার সঙ্গে সাক্ষাত করা দরকার এবং দুআ নেওয়া দরকার। বাদশাহ ও ক্ষমতাশালীরা যখন বুযুর্গদের কাছে যায় তখন তাদের উদ্দেশ্য নিজেদের অন্তর ও চরিত্রের সংশোধন হয় না, বরং তারা এই আবেদন করে থাকে যে, আমার ক্ষমতা ও রাজত্ব যেন স্থায়ী হয়- এই দুআ করুন। যাইহোক! গভর্নর লোক-লশকর নিয়ে ওই বুযুর্গের ডেরায় উপস্থিত হল। বুযুর্গ পা লম্বা করে বালিশে হেলান দিয়ে আরাম করছিলেন। গভর্নর নিকটে আসার পরও তিনি সে অবস্থাতেই থাকলেন। লোকেরা বলল, গভর্নর সাহেব এসেছেন! কিন্তু এটা শুনেও তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সূচিত হল না। গভর্নর বড় আশ্চর্য হলেন। কেননা, আজ পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তিনি হননি। এটা তো অচিন্তনীয় বিষয় যে, কারো কাছে তিনি যাবেন আর সে এভাবে পা ছড়িয়ে বসে থাকবে! সম্মানের জন্য দাড়াবে না! যাইহোক! গভর্নর সাক্ষাত করল, সালাম দিল এবং দুআর আবেদন করল। বুযুর্গ শায়িত অবস্থাতেই সালামের জওয়াব দিলেন, দুআ করলেন এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব বুঝিয়ে ও আখেরাতের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে কিছু নসীহত করলেন। গভর্নর প্রভাবিত হল এবং বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যে পা ছড়িয়ে দেয় সে হাত বাড়ায় না

গভর্নর ফিরে গিয়ে এক থলি স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া পাঠাল। গভর্নরের দূতকে বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? সে বলল, গভর্নর সাহেব আপনার জন্য এই থলিটা পাঠিয়েছেন। বুযুর্গ বললেন, এটা ফেরত নিয়ে যাও। তাকে বলবে–

إِنَّ الَّذِىْ يَمُدُّ رِجْلَهٗ لَا يَمُدُّ يَدَهٗ

'যে পা ছড়ায় সে কখনো হাত পাতে না।'

এই বলে তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর এই আচরণ অনুসরণীয় নয়

এই ঘটনা সম্পর্কে একটা বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। তা এই যে, গভর্নর যখন সাক্ষাতের জন্য এল তো বুযুর্গ পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলেন, অবস্থা পরিবর্তন করেননি। মনে রাখতে হবে যে, বুযুর্গদের মনে বিভিন্ন ভাব ও ভাবনা আসে যা সব সময় অনুসরণযোগ্য হয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হল, অতিথির সম্মান করা, সে আমীর হোক কি ফকীর হোক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন–

"أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ"

অর্থাৎ, কেউ যদি পদের অধিকারী হয় তবে তার উপযুক্ত সম্মান কর।'

কিন্তু যেহেতু আল্লাহওয়ালাদের মনে কখনো কখনো তাকভীনীভাবে বিভিন্ন ভাবনা আসে যে, এখন তার সঙ্গে এমন আচরণই ফলদায়ক হবে এজন্য তারা ঐ রকম আচরণ করেন। কিন্তু অন্যদের জন্য তাদের অনুসরণ করা উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, কোনো সম্মানী ব্যক্তির আগমনের সময় তোমরা পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকলে। নবীজীর সুন্নাহ, যা অনুসরণীয়, তা এই যে, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান কর।'

মর্যাদা কর্মের কারণে হওয়া চাই

ঐ বুযুর্গের উক্তি– 'যে পা ছড়ায় সে কখনো হাত পাতে না।' এর অর্থ হল, দুনিয়ার কোনো গুরুত্ব আমার অন্তরে নেই, তোমার মর্যাদা তোমার কর্ম ও কীর্তির দ্বারা, তোমার তাকওয়া ও পরহেযগারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার বিত্ত-বৈভব এবং পদ ও ক্ষমতার দ্বারা হবে না। সারকথা, দুনিয়ার কোনো গুরুত্বই নেই।

এটা অত্যন্ত নাযুক বিষয়

এই দুই বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। একদিকে উপরোক্ত হাদীস মোতাবেকও আমল হবে, অন্যদিকে অন্তরে দুনিয়ার মর্যাদাও থাকবে না। আল্লাহ তাআলার তাওফীকেই এই ভারসাম্য তৈরি হতে পারে। বুযুর্গদের সোহবত ও তাদের শাসনের মাধ্যমেই এটা তৈরি হতে পারে।

অহংকারী ধনীর ঘটনা

আইয়ুব খানের আমল। নির্বাচন হচ্ছিল। নির্বাচনে এক বড় পুঁজিপতি প্রার্থী হয়েছিল। আমাদের মহল্লাও তার নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহল্লায় হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)-এর প্রভাব ছিল। এজন্য ওই বিত্তশালী ভাবল যে, মুফতী সাহেবের সমর্থন পাওয়া গেলে সুবিধা হবে। একদিন তিনি তার লোকজন নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন এবং কলিংবেল বাজালেন। আমি দরজায় গেলাম এবং তার সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তিনি তার পরিচয় দিলেন এবং এমন ভঙ্গিতে নাম বললেন যে, তার ধারণা ছিল, অর্ভথ্যনাকারী নাম শোনামাত্রই ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে, এত বড় মানুষ আমাদের বাসায় এসেছেন! আমি নাম শুনে বললাম, বলুন, কেন এসেছেন? তিনি পুনরায় বললেন, আমি অমুক, মুফতী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি। আমি বললাম, এখন তো তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাতের সময় নয়। এই উত্তর শুনে তার চেহারা যে আকার ধারণ করল তা ছিল দেখার মতো। তাঁর যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না, আমি কোনো বাড়ীতে যাব আর তারা বলবে, এখন সাক্ষাতের সময় নয়। তিনি আবার বললেন, আমি এতদূর থেকে এসেছি। আমি বললাম, আসার আগে আপনার সময় জেনে নেওয়া উচিত ছিল। যাইহোক! তিনি খুব বিরক্ত হলেন এবং বললেন, আপনি কে? আমি বললাম, আমি তাঁর পুত্র। তিনি বললেন, আমি মুফতী সাহেবকে অভিযোগ করব। আমি বললাম, আমি যখন সাক্ষাতের জন্য আসবেন তখন অভিযোগ করবেন। এরপর তিনি সাক্ষাতের সময় নিলেন এবং দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের জন্য এলেন।

সে সময় তিনি ওয়ালিদ ছাহেবের নিকট অভিযোগও করেছিলেন যে, ইতিপূর্বেও একবার আমি এসেছিলাম, কিন্তু সাক্ষাত হয়নি। এরপর বললেন, আপনার দারুল উলূম যেন কোথায়? আমি এটা বানিয়ে দিব, সেটা বানিয়ে দিব। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) বললেন, আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ পাকের শোকর, সাধারণ মুসলমানদের এক দুই টাকা চাঁদার মাধ্যমেই আমাদের কাজ সমাধা হয়ে যায়। এতেই বড় বরকত। এটা ছাড়া আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

মোটকথা, তার বিশ্বাস ছিল, আমার নাম শোনামাত্র সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এটা তার ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছিল।

এক মাছির পাখার সমানও দুনিয়ার মূল্য নেই

হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

"لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً"

(ترمذى، كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله)

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তাআলার কাছে দুনিয়ার মূল্য এক মাছির পাখার সমানও হত তাহলে আল্লাহ তাআলা কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। এই হল দুনিয়ার মূল্য। এই হাদীস যদি অন্তরে বসে যায় তাহলেই দুনিয়ার মূল্য ও মর্যাদা পরিস্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই অন্তর্জ্ঞান দান করুন। আমীন।

দুনিয়া একটি প্রয়োজন

তবে দুনিয়া একটি প্রয়োজন। প্রয়োজন হিসেবে আমরা দুনিয়াকে ব্যবহার করতে পারি। যেমন ঘরে বাথরুমের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ

স্থান নয় যে, সর্বদা তার চিন্তা মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখবে। একই কথা দুনিয়ার ক্ষেত্রেও। দুনিয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুপাতে তা ব্যবহারও করতে হবে, কিন্তু তার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অন্তরে থাকা উচিত নয়। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই– ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া দান করুন প্রয়োজন অনুপাতে; বরং ইচ্ছা ও চাহিদা অনুপাতে, তবে দুনিয়ার মোহ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

ইমাম যুহরী (রহ.)

ইমাম যুহরী (রহ.) অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে পার্থিব ধন-সম্পদও দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তার শীষ্য বলেছেন–

"مَا رَأَيْتُ أَحَدًا اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَهُ مِنْهُ"

আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনো মানুষ দেখিনি যার কাছে দুনিয়া এতটা অসার ও মূল্যহীন। এরপর বলেন–

"كَانَتِ الدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَعْرِ"

দিরহাম তার কাছে যেন ছাগলের লাদির মতো ছিল!

অর্থাৎ, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের কোনো মর্যাদাই তার অন্তরে ছিল না। দিরহাম যদি আসে তো ভালো, না আসলেও কিছু যায় আসে না। যখন দিরহাম আসত তখন এমনভাবে লোকদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতেন, যে একদম শূন্য হয়ে যেতেন।

অতএব দুনিয়া আল্লাহ্ দান করুন, কিন্তু অন্তরে তার মাহাত্ম্য যেন না আসে।

হযরত লাইছ ইবনে সাদ (রহ.)

হযরত লাইছ ইবনে সাদ (রহ.) অত্যন্ত উঁচু মানের মুহাদ্দিস ছিলেন এবং ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। তার জীবনীতে এসেছে যে, তার প্রতি দিনের আয় কয়েক কেজি স্বর্ণের সমপরিমাণ ছিল। এত সম্পদ আল্লাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু জীবনে কখনও যাকাত ওয়াজিব হয়নি। কেননা, নিসাবের উপর বছর অতিবাহিত হতে পারত না। একদিকে সম্পদ এসেছে অন্য দিকে তা বণ্টন হয়ে গেছে। কখনো কোনো দোস্তকে দিয়ে দিয়েছেন, কখনো আত্মীয়-স্বজনকে দিয়েছেন, কখনো কোনো আলেমের খেদমতে হাদিয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর কথা– সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সে যাকে দুনিয়া দেওয়া হয়েছে কিন্তু দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে রক্ষা হয়েছে, হযরত লাইছ ইবনে সাদ (রহ.) এদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দুনিয়া ছিল, কিন্তু দুনিয়ার আকর্ষণ ছিল না।

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ (রহ.)

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর শায়খ হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মদ (রহ.), যিনি আমাদের সবার অগ্রপুরুষ, তাঁর জীবনীতে আছে যে, বাজারে যাওয়ার সময় সঙ্গে টাকার থলে থাকত। কোনো দোকান থেকে কিছু সওদাপাতি কেনা হলে দোকানদারকে সেই থলে দিয়ে বলতেন, যা দাম হয়েছে এখান থেকে নিয়ে নাও। তাঁর চিন্তা এই ছিল যে, টাকা গুণে গুণে দোকানদারকে দিতে যে সময় ব্যয় হবে সে সময়ে তো দশবার 'সুবহানাল্লাহ' বা দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়া যায়।

এক চোরের ঘটনা

একবার তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক চোর আন্দাজ করে ফেলল যে, তাঁর কাছে টাকার থলে আছে। সেও পিছন পিছন হাটতে লাগল। একসময় সুযোগবুঝে ওই থলেটা ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গেল। তিনি ফিরেও দেখলেন না, কে এই থলে নিয়ে গেল। নিয়ে গেছে তো নিয়ে গেছে। তিনি ঘরে ফিরে এলেন। ভাবলেন যে, কে যাবে খুঁজতে– কে থলে নিয়ে গেল? কবি বলেন–

یہ کہاں کا فسانہ سود و زیاں – جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا
کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

আল্লাহর তাআলার শাস্তিকে ভয় কর

কিন্তু আল্লাহর ওলী যখন প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন তো আল্লাহ তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেন। এদিকে অবস্থা এই দাড়াল যে, চোর যখন থলে নিয়ে পালাতে চাইলো তখন সে পালানোর পথই খুজে পাচ্ছিল না। কখনো এই গলিতে ঢোকে কখনও ওই গলিতে, কিন্তু বের হওয়ার কোনো পথই খুঁজে পায় না। ঐ গলিগুলোই তার জন্য 'তীহ প্রান্তরে' পরিণত হল। কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও যখন সে এভাবে দিশেহারা হয়ে শুধু চক্কর কাটছিল তখন তার মনে হল, যার থলে ছিনিয়ে এনেছি বোধহয়, তিনি আল্লাহ তাআলার ওলী হবেন। আমি তার ক্ষতি করেছি। আমি তার থলি তাকে ফেরত দিব। তাহলে হয়তো মুক্তি পেতে পারি।

চোর ও মিয়াজীর বিবাদ

শেষে চোর হযরত মিয়াঁজীর বাড়িতে গেল এবং দরজায় আওয়াজ দিল। হযরত মিয়াঁজী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? চোর বলল, হযরত! এই থলিটা ফিরিয়ে দিতে এসেছি। মিয়াঁজী বললেন, আমি তো এটা নিব না। সে জিজ্ঞাসা করল, কেন নিবেন না? এটা তো আপনারই থলি? মিয়াজী বললেন, যখন তুমি তা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলে তো আমি সেটা তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। এখন এটা আর ফেরত নেব না। চোর বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে ফেরত নিন। আমি তো মুসীবতে পড়ে গেছি। ঘরে যাওয়ার রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছি না। মিয়াঁজী বললেন, আমি এখন কীভাবে নেই, এটা তো আমার নয়? এভাবে দুজনের মধ্যে বিবাদ হতে লাগল, একজন থলে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল, অন্যজন নেওয়ার জন্য কোনোভাবেই প্রস্তুত নয়। শেষে ঐ লোক বলল, ঠিক আছে তাহলে দুআ করুন আমি যেন ঘরে ফেরার রাস্তা খুঁজে পাই। মিয়াঁজী (রহ.) বললেন, ঠিক আছে দুআ করছি। এরপর সে চলে গেল।

দুনিয়া প্রার্থনা করুন তবে দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

মোটকথা, প্রয়োজন অনুপাতে আল্লাহর কাছে দুনিয়া চাওয়া উচিত— ইয়া আল্লাহ! এই পরিমাণ সহায়-সম্পদ দান করুন, যেন কারো মুখাপেক্ষী না হই এবং প্রয়োজনগুলো শান্তির সঙ্গে পূরণ হয়ে যায়। বরং আমি তো বলি, এই দুআও করুন, ইয়া আল্লাহ! জায়েয ইচ্ছাগুলোও পূরণ করে দিন। তবে দুনিয়ার সঙ্গে হৃদ্যতা পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন। দুনিয়ার বড়ত্ব ও গুরুত্ব অন্তরে সৃষ্টি হতে দিবেন না। তদ্রূপ এমনও যেন না হয় যে, পয়সাওয়ালাদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অন্তরে রয়েছে, দরিদ্রদের কোনো মর্যাদা নেই। কারো প্রতি মর্যাদা যেন শুধু তাকওয়া ও দ্বীনদারীর কারণে হয়। আল্লাহর নৈকট্যের কারণে হয়। অর্থ-বিত্তের কারণে না হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন—

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

(كنز العمال : ١٦٥٩٤)

'ইয়া আল্লাহ! আমাকে মিসকীনের জীবন দান করুন, মিসকীনের মৃত্যু দান করুন এবং মিসকীনদের সঙ্গেই আমার হাশর করুন।'

বুঝা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হল দ্বীনদারী। আমরা যে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের মর্যাদা অন্তরে নিয়ে বসে আছি তা অত্যন্ত খারাপ জিনিস। অর্থ ও বিত্তের কারণে কারো কোনো বিশেষত্ব হওয়া উচিত নয়। এই দিক থেকে আমীর-ফকির এক সমান। হাঁ যদি বিত্তবান ব্যক্তি দ্বীনদারীরও অধিকারী হয়ে থাকেন, আল্লাহর ভয় ও আনুগত্য তার মধ্যে থেকে থাকে তাহলে এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে সম্মান করুন, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। অর্থ ও বিত্তের কারণে সম্পর্ক রাখা পরিহার করুন।

এক পীর সাহেব

কখনো কখনো দ্বীনদারদের এই অবস্থা হয় যে, প্রথম দিকে যদিও নিয়ত ঠিক থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন বিত্তশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকে গৌরবের বিষয় মনে করতে থাকে। এটা ভালো নয়। হযরত থানভী (রহ.) এক পীর সাহেবের ঘটনা লিখেছেন যে, একদিন মুরীদ এসে পীর সাহেবকে বলল, হযরত! আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি! তা এই যে, আপনার আঙুলে মধু লাগানো আছে আর আমার আঙুলে পায়খানা! পীর সাহেব বললেন, ঠিকই তো দেখেছ। আল্লাহ তাআলা আমাকে ইলম ও তাকওয়া দান করেছেন, যার দৃষ্টান্ত হল মধু। আর তুমি হলে দুনিয়ার কুকুর, তাই তোমার আঙুলে পায়খানা লেগে আছে। মুরিদ বলল, হযরত! কথা এখনো শেষ হয়নি। এরপর দেখলাম, আমি আপনার আঙুল চাট্‌ছি আর আপনি আমার আঙুল!' নাউযুবিল্লাহ। অর্থ এই যে, পীর সাহেব তাকে দ্বীন শেখাচ্ছিলেন যা ছিল মধুর মতো পবিত্র ও উপকারী অন্যদিকে মুরীদের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করছিলেন দুনিয়া, যার দৃষ্টান্ত হল পায়খানা। পীর সাহেব মুরীদকে ভালো জিনিস দিচ্ছিলেন, ইলম দিচ্ছিলেন, দ্বীন শেখাচ্ছিলেন, তারবিয়াত করছিলেন, কিন্তু তার অন্তরে মুরীদের সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং তা তিনি গ্রহণ করছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন। আমীন।

দুনিয়ার নিন্দাও বেশি করবেন না

যাইহোক! উপরোক্ত মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন যে, 'দুনিয়া উপার্জন করা নিষেধ নয়, তবে দুনিয়ার মহব্বত ও অন্তরে তার মাহাত্ম্য পোষণ করা নিষেধ।' এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'নিন্দার মধ্য দিয়ে হলেও। কেননা যে বস্তুর গুরুত্ব অন্তরে নেই, তার সমালোচনাও করা হয় না।'

অর্থাৎ, মর্যাদার সঙ্গে দুনিয়ার আলোচনা তো অবশ্যই নিষেধ। সমালোচনার আঙ্গিকেও তার আলোচনা অধিক করা ভালো নয়। যেমন কেউ উঠতে বসতে

সর্বদা দুনিয়াকে গালমন্দ করাই কাজ বানিয়ে নিল। এটা প্রমাণ করে যে, অন্তরে দুনিয়ার গুরুত্ব আছে। অন্যথায় বার বার, নিন্দার প্রসঙ্গে হলেও, তার আলোচনা করা হত না।

দুনিয়া আলোচনার যোগ্য বিষয় নয়

ভাই! দুনিয়া তো আলোচনার যোগ্য বস্তুই নয়। অতএব বিনা প্রয়োজনে তার সমালোচনায় অধিক মগ্ন হওয়া তাকে গুরুত্ব দেওয়ারই শামিল। কেননা, যে বস্তুর গুরুত্ব নেই, তার কোনো আলোচনাই হয় না। দেখুন, বাতাসে সর্বদা ধূলিকণা উড়ে বেড়াচ্ছে। এগুলোর কি কোনো গুরুত্ব আছে? নেই। এখন কি আপনি বসে বসে এই বক্তৃতা করতে থাকবেন যে, এতে এই দোষ আছে, এই অসুবিধা আছে? কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই কাজ করবে না। কেননা, এইসব ধূলিকণা তো আলোচিত হওয়ার মতো কোনো বস্তু নয়। এজন্য কেন শুধু শুধু দুনিয়ার নিন্দা বয়ান করবেন? হাঁ! নসীহতের প্রসঙ্গে এর অসারত্ব আলোচনা করা নিষেধ নয়। যেমন স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তবে বিনা প্রয়োজনে দুনিয়ার নিন্দা করাও একে গুরুত্ব দেওয়ারই নামান্তর।

গোনাহের কথা স্মরণ করবেন না

গোনাহ সম্পর্কে বুযুর্গরা বলেছেন যে, 'কখনো গোনাহের কথা মনে আনবে না। না ইচ্ছাকৃতভাবে তা করার কথা চিন্তা করবে, আর না ইচ্ছাকৃতভাবে না-করার কথা চিন্তা করবে।' যেমন কেউ বসে বসে ভাবতে লাগল, অমুক জায়গায় খুব ঘুষ পাওয়া যায়। আমি এটা নিব না। কিংবা অমুক জায়গায় কুদৃষ্টির চাহিদা চরিতার্থ করা যায়, আমি এটা করব না। এভাবে চিন্তা করাও ভয়াবহ। কেননা, না-করার চিন্তার অন্তরালে গোনাহকে স্মরণ করা হচ্ছে। এর ফল এই হতে পারে যে, গুনাহ তাকে আকৃষ্ট করে ফেলবে এবং সে গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

ফিতনার দিকে উঁকি মেরেও তাকাবে না

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আখেরী যমানায় যেসব ফেতনার প্রাদুর্ভাব ঘটবে তোমরা সেদিকে উঁকি মেরেও তাকাবে না, যে, দেখি কী হচ্ছে! কেননা, যে উঁকি মেরে দেখবে ফেতনা তাকেও ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।'

গোনাহ থেকে বড় ফেতনা আর কী? গোনাহের প্রকৃতিই এই যে, মানুষ যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা করে– চাই যে ধরনের চিন্তাই হোক, গোনাহ তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়। এগুলো হচ্ছে নফস ও শয়তানের বিভিন্ন কুমন্ত্রণা।

গোনাহ্ সম্পর্কে জানারও চেষ্টা করো না

কখনো কখনো নফস-শয়তান মানুষের মনে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, অমুক গোনাহর কাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। তাহলে বুঝে শুনে তা থেকে বিরত থাকা যাবে এবং অন্যকেও বিরত রাখা যাবে।

এক আলেমের ঘটনা। একবার পরিচিত কেউ তাকে সিনেমা হলে দেখে ফেলল। জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এখানে? ওই আলেম সাহেব বললেন, আমি এখানে এসেছি সিনেমা কী জিনিস তা বুঝার জন্য যাতে এর দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেও তা থেকে বাঁচতে পারি এবং অন্যকেও বাঁচাতে পারি! অথচ তিনি বাঁচার আগেই গোনাহে লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন!

যাইহোক! গোনাহ্ সম্পর্কে নফসের একটি প্রতারণা এই যে, বিষয়টা সম্পর্কে একটু জানাশোনা হোক। এখন জানাশোনা হতে গিয়ে নিজেই ওই গোনাহের শিকার হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা হেফাযত করুন। আমীন।

এজন্য হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই ফেতনার দিকে উঁকি দিলেও ফেতনা তোমাদেরকে টেনে নিয়ে যাবে। এজন্য জানার জন্যও গোনাহের কাছে যাওয়া যাবে না।

নফসের একটি ধোঁকা

গোনাহ্ সম্পর্কে নফসের একটি চাল এই যে, সে মানুষকে বলে, এই গোনাহ একবার ভালোভাবে করে তৃপ্ত হয়ে যাও। এরপর তাওবা করে তা ছেড়ে দিও। একবার যখন তা করবে তো মন পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে, না-করার আক্ষেপ আর থাকবে না। মনে রাখবেন, এটা নফসের অনেক বড় ধোঁকা। কেননা, অভিজ্ঞতা বলে যে, গোনাহের কাজ করার দ্বারা গোনাহের পিপাসা মেটে না বরং তা আরো তীব্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত মানুষ যখন গোনাহ্ থেকে দূরে থাকে তখন তার অন্তরে সেই গোনাহের ব্যাপারে একটা সংকোচের পর্দা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু একবার করে ফেলার পর সেই পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়। তখন ওই গোনাহের ব্যাপারে তার মনে দ্বিধা-সংকোচ থাকে না। সে তখন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

গোনাহ্ করার দ্বারা পিপাসা তীব্রতর হয়

আল্লাহ্ তাআলা রক্ষা করুন! গোনাহতো এমন জিনিস যে, এর পিপাসা কখনো শেষ হয় না। এমন কখনো হয় না যে, একবার করে ফেললে মনের কামনা স্তিমিত হবে এবং গোনাহের কামনা দূর হয়ে যাবে। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, গোনাহের মজা হল চুলকানীর মতো। কারো যদি চুলকানি হয় তাহলে চুলকাতে খুব মজা পাওয়া যায়। এজন্য বলা হয়ে থাকে দুনিয়াতে দুটি বস্তুই

আছে মজার : 'খাজ' ও 'রাজ'। খাজ অর্থ চুলকানি আর রাজ অর্থ রাজত্ব। চুলকানিতে মজা বহুত, কিন্তু এটা এতই অস্বাস্থ্যকর যে, যতই চুলকাবেন ততই তা বিস্তৃত হবে। খুজলির বৈশিষ্ট্য হল, একবার চুলকালে সাময়িকভাবে যন্ত্রণা প্রশমিত হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পর পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ চুলকানি শুরু হয়। গোনাহের কাজও এমন। একবার যখন মানুষ তা করে তখন এর চাহিদা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। এজন্য কখনো নফস-শয়তানের এই প্রতারণায় পড়বেন না যে, একবার করে নেওয়ার দ্বারা তৃপ্তি হয়ে যাবে এবং চাহিদা কমে যাবে। মনে রাখুন, ইচ্ছার কখনো মৃত্যু হয় না বরং যতই তা প্রশ্রয় পায় ততই শক্তিশালী হয়।

গোনাহের সঙ্গে সম্পর্কই না থাকুক

এজন্য গোনাহকে চিন্তা-ভাবনার বিষয় বানানো উচিত নয়, যদিও তা নিন্দার আঙ্গিকেই হোক না কেন। আমাদের একজন বন্ধু, যিনি হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁর আশেক ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। একদিন আমাকে এক আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন যে, হযরত (রহ.) আমাদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। আমি বললাম, কী পরিবর্তন? তিনি বললেন, হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) আমাদেরকে গোনাহ থেকে সম্পর্কহীন করে দিয়েছেন। তিনি ইংরেজি শব্দ Indiffenent ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেন, এর ফলে আলহামদু লিল্লাহ, গোনাহের চিন্তাও মনে আসে না– না গোনাহের আগ্রহ, না ঘৃণা। ঘৃণাও তো আসলে এক ধরনের সম্পর্ক। অতএব না আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা, না ঘৃণার সঙ্গে।

মূর্খদের উত্তর হল নিরুত্তর থাকা

হযরত থানভী (রহ.) বলতেন, গোনাহের আলোচনাই কেন হবে? আলোচনা তো এমন বিষয়ের হয় যার কিছু গুরুত্ব আছে। অনেক লেখক আছে যারা শুধু এজন্যই প্রবন্ধ লেখে এবং এখানে পাঠিয়ে দেয় যে, তা খণ্ডন করা হোক। কেননা, যখন তা খণ্ডন করা হবে তখন তার নাম প্রচার হবে। জনৈক ব্যক্তির উক্তি– 'বদনাম যদি হয় তবে নাম ছাড়া কি হবে?' তারা এটা চায় যে, তাদের প্রবন্ধের উত্তর লেখা হোক। কেননা, যতই উত্তর লেখা হবে ততই তার প্রসিদ্ধি হবে। তাই এর চিকিৎসা হল সেদিকে ভ্রুক্ষেপই না করা।

আজকাল মানুষের অবস্থা এই যে, যেখানেই কোনো প্রবন্ধ দেখে যাতে কোনো ভুল কথা লেখা আছে তো আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেয় যে, সাহেব এর

জওয়াব লেখ। এখানে গোমরাহীর কথা লিখে দিয়েছে। আরে ভাই! এটাই তো ওই প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য। এতে তার নাম প্রচার হবে। লোকেরা বলবে, যার খণ্ডন অমুক আলেম করেন সে তো সাধারণ লোক নয়। এজন্য উত্তর লেখার অর্থই হচ্ছে তাকে মর্যাদা দেওয়া। এক্ষেত্রে করণীয় তা-ই যা শায়খ সাদী (রহ.) বলেছেন–

جواب جاہلاں باشد خاموشی

মূর্খের উত্তর হল উত্তর না-দেওয়া।

সব কথা খণ্ডন করার প্রয়োজন হয় না

এজন্য সব কথা খণ্ডন করা সুফল বয়ে আনে না। কিছু বিষয় এমন আছে যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাই উচিত নয়। এটাই তার প্রতিকার। এর পিছনে সময় ব্যয় করার অর্থ হয় না। বর্তমান যুগে সবার হাতেই কলম এসে গেছে, সবাই এখন জিহ্বার মালিক। যার যা ইচ্ছা তা-ই লেখে আর পত্রিকাগুলো সব কথাই ছাপার জন্য প্রস্তুত। এখন মানুষ কতজনের পিছনে সময় ব্যয় করবে? কত জনের জবাব দিবে? বরং জবাব দিলে কখনো কখনো সেটাই তার প্রচারণার কাজ করে।

এজন্য হযরত থানভী (রহ.) এই মালফূযে অত্যন্ত নাযুক কথা বলেছেন যে, অন্তরে দুনিয়ার গুরুত্ব থাকবে না– না তার আগ্রহ, না নিন্দা। অর্থাৎ, না তার গুরুত্ব আলোচনা করবে,না নিন্দা করবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

একষষ্টিতম মজলিস

দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতিকার

প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে আল্লাহর হেকমত রয়েছে

দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতিকার

প্রাচুর্য ও দারিদ্রের মধ্যে আল্লাহর হিকমত রয়েছে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

দুনিয়ার সব চিন্তা নিন্দিত নয়

এক মালফূযে হযরত থানবী (রহ.) বলেন–

'দুনিয়া যে চিন্তা নিন্দিত তা হল দুনিয়াকে আসল মাকসাদ মনে করে অর্জনের চিন্তা করা। যদি আসল মাকসাদ মনে না করা হয় তাহলে সেই চিন্তা নিন্দিত নয়, জায়েয। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে হালাল রিযিক অন্বেষণ করা ফরয। সাথে সাথে দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা যদি দুনিয়া পরিহারের জন্য হয় তবে তা-ও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে তুলনা করার জন্য চিন্তা করা যে, দুটোর মধ্যে কোনটা গ্রহণীয় আর কোনটা বর্জনীয় এই চিন্তা কাম্য।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৬)

অর্থাৎ, দুনিয়ার চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া নিন্দনীয়। হাদীস শরীফে তা থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন যে–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَهَمِّنَا

'হে আল্লাহ! দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার মূল বিষয় বানিয়ে দিবেন না।'

দুনিয়াকে আসল মাকসাদ মনে করে সর্বদা মন-মস্তিষ্ক এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে তা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি দুনিয়াকে আসল মাকসাদ মনে করা না হয়, তাহলে এ নিয়ে চিন্তা করা মন্দ নয়। যেমন এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার যিম্মায় কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন যেমন, নিজের দায়িত্ব, স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব ইত্যাদি।

এই দায়িত্ব আদায় করতে হলে দুনিয়া অর্জনও জরুরি। তাই দুনিয়া উপার্জন করছি। এ রকম চিন্তা করা খারাপ নয়।

সম্পদ সর্বাবস্থায় 'যুহদ' পরিপন্থী নয়

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন :

> 'সম্পদ জমা করা সর্বক্ষেত্রে 'যুহদ' পরিপন্থী নয়। তবে তাকে গোনাহের হাতিয়ার বানানো যুহদ পরিপন্থী। কারো জন্য সম্পদশালী হওয়াই ভালো। আল্লাহ তাআলা জানেন যে, কার প্রাচুর্য দ্বারা নৈকট্য হাসিল হবে আর কার দারিদ্র্য দ্বারা হবে। এজন্য তিনি কাউকে সম্পদ দেন, কাউকে দরিদ্র রাখেন।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৬)

সম্পদকে নাফরমানীর কারণ বানিও না

'যুহ্‌দ'-এর যে অর্থ সাধারণত করা হয় তাহল, দুনিয়াকে ত্যাগ করা। এটা ভুল। 'যুহদ'-এর সঠিক অর্থ হল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি। এজন্য সম্পদ জমা করা সর্বাবস্থায় যুহদ পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ, এ রকমও হতে পারে যে, লোকটা অনেক সম্পদের মালিক অথচ সে যাহেদ। কেননা, তার সম্পদ আছে, কিন্তু সম্পদের আকর্ষণ নেই এবং অন্তরে সম্পদের মহব্বতও নেই। তবে সম্পদকে গোনাহের মাধ্যম বানানো 'যুহ্‌দ' পরিপন্থী। যেমন, সম্পদ ভুল জায়গায় খরচ করা, এটা যুহ্‌দ পরিপন্থী। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ كُلِّ غِنًى يُطْغِيْنِي

হে আল্লাহ! আমাকে এমন প্রাচুর্য থেকে রক্ষা করুন, যা আমাকে নাফরমান বানিয়ে দিবে।

বিত্তশালীদের অবশ্যই এই দুআ করা উচিত। কেননা, সম্পদের মধ্যে ঔদ্ধত্য রয়েছে। যদি আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী না হয় এবং বুযুর্গদের সোহবত ও তারবিয়াত না থাকে তাহলে সম্পদ মানুষের চিন্তা-চেতনায় ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করে এবং তাকে স্বেচ্ছাচারী বানিয়ে দেয়। ফলে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই সম্পদকে গোনাহের মাধ্যম বানানো উচিত নয়।

সম্পদকে নেককাজের মাধ্যম বানাও

অপর দিকে মানুষ যদি এই সম্পদকে শোক্‌র, ইবাদত, ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ, সদকা, দান এবং নেক আমলের মাধ্যম বানিয়ে নেয় তাহলে তো সুবহানাল্লাহ। এই সম্পদ তখন দ্বিগুণ নেয়ামত। দুনিয়াতেও নেয়ামত,

আখেরাতেও নেয়ামত। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন, কারো কারো জন্য সম্পদশালী হওয়াই ভালো। আল্লাহ জানেন কার প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে নিয়ে যাবে। আর কাকে দারিদ্র। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই জানেন যে, যদি অমুকের কাছে সম্পদ থাকে তাহলে নাফরমানীর বদলে আমার সাথে তার সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে পক্ষান্তরে অমুকের কাছে সম্পদ থাকলে সে নাফরমান হয়ে যাবে।

دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

প্রত্যেকের পাত্র দেখে আল্লাহ দান করেন। কাউকে এটা দেন কাউকে অন্যটা সব আল্লাহর বণ্টন।

টেকো মাথাওয়ালার নখ না থাকাই কল্যাণ

মাঝে মধ্যে আমাদের চিন্তা হয়। দয়া জাগে যে, আহা! লোকটাতো খুব অভাবী, গরীব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন যে, যদি তাকে টাকা-পয়সা দেওয়া হত তবে কী কাণ্ড সে ঘটিয়ে ফেলত? নিজেও মুসীবতে পড়ত অন্যদেরকেও মুসীবতে ফেলত। এজন্য তাকে সম্পদ দান করেননি। দারিদ্র ও অভাবই তার জন্য উত্তম।

স্বচ্ছলতা অল্প দিবো, নাকি বেশী দিবো?

একটি ঘটনা কোনো কিতাবে পড়িনি, কিন্তু হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, যখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তায় এক লোক এসে জুটল। সে বলল, আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে যাচ্ছেন তো আমাদের জন্য কিছু দরখাস্ত করবে। হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কী দরখাস্ত করব? সে বলল, আমি অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত, আমার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই, অভাবের সংসার। আল্লাহর যেন আমাকে স্বচ্ছল করে দেন। হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন। সর্বশেষে ঐ লোকটির দরখাস্তও পেশ করলেন– ইয়া আল্লাহ! রাস্তায় এক লোকের সাথে দেখা হয়েছিল, সে খুব অভাব ও পেরেশানীর মধ্যে আছে। আপনি তার দুআ কবুল করুন এবং তাকে স্বচ্ছলতা দান করুন। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বচ্ছলতা অল্প দিব না বেশি? মূসা (আ.) বললেন, দিবেন যখন বেশি করেই দেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, ঠিক আছে। আমি তাকে প্রাচুর্য দান করলাম। হযরত মূসা (আ.) ফিরে আসলেন।

কেবল জান্নাতে

একদিন মনে পড়ল যে, যার জন্য আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করেছিলাম তাকে একটু দেখে আসি। সে তো এখন স্বচ্ছল হয়ে গেছে। তিনি যখন তার ঘরে পৌঁছলেন এবং দরজায় আওয়াজ দিলেন এক মহিলা বের হয়ে আসল। তিনি বললেন, আমি অমুকের সাথে দেখা করতে চাই। ঐ মহিলা বলল, সে মারা গেছে। হযরত মূসা (আ.) পেরেশান হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ! একথাতো আমার বুঝে আসল না যে, সে আপনার কাছে স্বচ্ছলতা চেয়েছিল অথচ সে জীবনটা পর্যন্ত হারাল। আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাকে অল্প স্বচ্ছলতা দিব না অধিক? তুমি বলেছিলে অধিক দিতে আর দুনিয়াতে তো অধিক স্বচ্ছলতা হয় না। যা হয় সবই কম। এজন্য আমি তাকে অধিক স্বচ্ছলতা এভাবে দিয়েছি যে, তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছি এবং জান্নাত দান করেছি।

দুটোই কেন দিলেন না

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে তো ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেও স্বচ্ছলতা দিতে পারতেন অতঃপর জান্নাত দিতেন। তার জবাব হল–

دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

অর্থাৎ, যদি দুনিয়ায় সে স্বচ্ছলতা লাভ করত তাহলে না জানি তার আমল কেমন হত? কোন গোনাহে সে লিপ্ত হত। কোন গোমরাহীতে সে পড়ে যেত। যার ফলে সে হয়তো শেষ পর্যন্ত জান্নাতও হারিয়ে ফেলত।

গরীবের উপর আল্লাহর কী দয়া হয় না?

আপনি যখন কোন অভাবী ও গরীব লোককে দেখেন তখন আপনার মনটা কেঁদে ওঠে। আহা! বেচারা কত কষ্টেই না আছে। এর অর্থ হল, তাকে দেখে আপনার দয়া হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর দয়া হয় না (?) আরে মিয়াঁ! যিনি এই জগতসংসার বানিয়েছেন তিনি আপনার চেয়ে ভালো জানেন যে কার সাথে কেমন ব্যবহার উপযুক্ত হবে। আপনার-আমার অস্তিত্বই কী? আমাদের জ্ঞান ও বিদ্যার দৌড়ই বা কতটুকু? আমরা কতটুকুই বা অনুমান করতে পারি, কোন যন্ত্রাংশের কী কার্যকারিতা? এগুলোতো একমাত্র সেই সর্বজ্ঞানী জানেন। তিনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। এজন্য তিনিই জানেন যে, সে ব্যক্তির জন্য অভাব ও দারিদ্রই উপযুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমার-আপনার চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু। দয়ার কারণেই তিনি তাকে বেশি ধন-সম্পদ দেননি।

আল্লাহ তাআলা শাসকও এবং প্রজ্ঞাবানও

এ কারণে বুযুর্গগণ বলেন, যখন কোন আপনজনের ইন্তেকাল হয় তখন দুটো বিষয় চিন্তা করা উচিত। এক. আল্লাহ তাআলা শাসক। দুই. আল্লাহ প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ যেহেতু শাসক তাই তার ফায়সালাই শিরোধার্য। তদ্রূপ তিনি প্রজ্ঞাবান শাসক। তাই তাঁর ফায়সালা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক, ভালো লাগুক বা না লাগুক, আমরা খুশি হই বা দুঃখিত হই, ঐ ফায়সালা মাথা পেতে মেনে নেওয়া জরুরি। ফায়সালা তারই হক, তার ফায়সালার উপরই আমল করা জরুরি।

কারো জন্য সম্পদশালী হওয়া কল্যাণকর

এরপর হযরত থানভী (রহ.) বলেন, 'কারো জন্য ধনী হওয়াই কল্যাণকর।' অর্থাৎ, কাউকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করে মর্তবা বুলন্দ করেন। সম্পদ দান করে শোকরিয়া আদায়ের তাওফীক দেন। সে যত শোকরিয়া আদায় করবে ততই তার মর্তবা বুলন্দ হবে। আবার কাউকে অভাব দিয়ে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। যেহেতু অভাবের মধ্যে সে সবর করে তাই সবরের দ্বারা তার মর্তবা বুলন্দ হয়। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

অর্থাৎ, 'যে খায় এবং শোকরিয়া আদায় করে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে রোযা রাখে এবং ধৈর্যধারণ করে।' সুতরাং রোযা রেখে ধৈর্য ধরলে যেমন সওয়াব তেমনি খেয়ে শোকরিয়া আদায় করলেও সওয়াব। এ কারণে রমযান মাসে আল্লাহ তাআলা দুই কাজই করান। দিনে রোযাদার ও ধৈর্যধারণকারী আর রাতে আহারকারী ও শোকরিয়া আদায়কারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهٗ

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের রিযিক খাও এবং শোকর কর। (সূরা সাবা : ১৫)

রমযানে কম খাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়

এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলতেন যে, কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, 'রমযান মাসে ইফতারের পরও কম খাওয়া উচিত।'

অন্য দিনের তুলনায় কম খাওয়া সঠিক কাজ নয়। কেননা, আসল বিষয় হল আল্লাহর আদেশ পালন। দিনে আল্লাহ না খেয়ে থাকতে বলেছেন, তাই না

খাওয়াতে সওয়াব, ইফতারের পরে যেহেতু খেতে বলেছেন তো এখন খেলেই সওয়াব। বন্দেগী বা আনুগত্যের দাবিতো এটাই।

ইফতার দ্রুত কর

এ কারণে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, যখন ইফতারীর সময় হয়ে যায় তখন খেতে দেরী করো না; বরং তাড়াতাড়ি খাও। কেন? কারণ এতে আনুগত্যের অনুশীলন করানো হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বলেছি খেয়ো না, ততক্ষণ না খেয়ে থাক। আর যখন আমি বলি যে, এখন খাও, তখন তাড়াতাড়ি খাও। এখন খাওয়া থেকে বিরত থাকাও এক প্রকার গোনাহ। হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যখন তিনি বলে দিয়েছেন, খাও! সুতরাং এখন নিশ্চিন্তে মজা করে খাও।

রমযানে রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়

হযরত থানভী (রহ.) আরো বলেন যে, হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা রমযান মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেন। হযরত বলেন, আশ্চর্যের বিষয় হল আল্লাহ রিযিক বাড়ান রমযানে। আর আমরা খাই পরে। আল্লাহ যেহেতু এখন রিযিক দিয়েছেন তাই এখন খাব। এজন্য রযমানের রাতে খাওয়া কমানোর দরকার নেই। দাসত্ব ও আনুগত্যের দাবিই হল– যখন তিনি রিযিক দিবেন তখন মজা করে খাওয়া। এটাই দ্বীনের আনুগত্য।

মোটকথা, কখনো আল্লাহ কোনো বান্দাকে নেয়ামত দান করেন এবং শোকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করেন। এভাবে তার মর্তবা বুলন্দ করেন। তিনিই জানেন, কার জন্য ধনী হওয়া কল্যাণকর আর কার জন্য দরিদ্র হওয়া কল্যাণকর।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বুযুর্গও ছিলেন ধনীও ছিলেন

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) যিনি ফকীহও ছিলেন, মুহাদ্দিসও ছিলেন, সুফীও ছিলেন, আবার ধনীও ছিলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ মানুষ, আপনিও এত সম্পদ জমা করেছেন? এ দুটোর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য তো আমরা ধরতে পারছি না। তিনি উত্তর দিলেন–

لَوْ لَا هٰذَا لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَآءِ

যদি আমাদের কাছে সম্পদ না থাকত, তাহলে এই সকল শাসক আমাদেরকে রুমাল বানিয়ে ব্যবহার করত।

অর্থাৎ, তারা আমাদেরকে নগণ্য মনে করত এবং সব জায়গায় ব্যবহার করত। এখন আমাদের কাছে সম্পদ আছে, তাই উভয়ের অবস্থা সমান। এখন আমরা কারো অধীন হয়ে থাকার অবস্থা থেকে মুক্ত।

ইমাম মালেক (রহ.) প্রতিদিন নতুন কাপড় পরতেন

ইমাম মালেক (রহ.) প্রতিদিন নতুন এক জোড়া কাপড় পরতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া দান করেছিলেন, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বা মগ্নতা কোনোটাই তাঁর মধ্যে ছিল না। এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা দরকার যে, হে আল্লাহ! প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া আমাদের দান করুন; বরং আমিতো আরো বাড়িয়ে বলি যে, চাহিদা অনুযায়ীই দান কর। জায়েয চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করুন কিন্তু এর মহব্বত ও মর্যাদা আমাদের দিলে ঢেলে দিবেন না। আমীন।

দুনিয়া দাও, দুনিয়ার মহব্বত দিও না

সর্বদা আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুআ করা দরকার। যদি এই প্রজ্ঞা পেয়ে যাই তো সব পেয়ে গেলাম। কেননা সকল অনিষ্টের মূল হল দুনিয়ার মহব্বত। হাদীস শরীফে এসেছে–

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْـئَةٍ

'দুনিয়ার মহব্বত সকল গোনাহের মূল।'

আল্লাহ যদি এই ব্যাধি থেকে নাজাত দান করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদেরকে এই কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

বাষট্টিতম মজলিস

দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতিকার

দুনিয়া অন্বেষণকারী শান্তিতে থাকে না

দুনিয়ার মহব্বত ও তার প্রতিকার

দুনিয়া অন্বেষণকারী শান্তিতে থাকে না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'কুরআনের আয়াত– فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ এর মধ্যে উন্নতি করার আদেশ রয়েছে। কিন্তু এই শর্তে যে, তা কল্যাণের ক্ষেত্রে হতে হবে। আপনি অর্থ ও বিত্তের উন্নতির পক্ষপাতিত্ব করছেন, চাই দ্বীন নিরাপদ থাকুক বা না থাকুক কিন্তু আমরা দ্বীনদারী বিহীন আর্থিক উন্নতিকে গোদরোগ বলে মনে করি। গোদাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর ফুলে যাওয়াকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের উন্নতি বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা অসুস্থতা।'

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৯)

নেক কাজের মধ্যে উন্নতির আদেশ করা হয়েছে

তিনি বলেন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ পাক আদেশ দিয়েছেন–

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ, ভালো কাজে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর এবং প্রতিযোগিতা কর। (সূরা বাকারা : ১৪৩)

অন্য জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছে–

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

অর্থাৎ, আল্লাহর মাগফিরাত এবং আসমান ও জমীন বরাবর প্রশস্ত জান্নাত অর্জনের জন্য একে অপরের চেয়ে দ্রুত ধাবিত হও। (সূরা আলে-ইমরান : ১৩৩)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া এবং উন্নতি করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব উন্নতি করার আদেশ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু উন্নতি যেন ভালো এবং নেক কাজের ক্ষেত্রে হয়। তাহলে তা প্রশংসনীয় ও কাম্য এবং আল্লাহ্র পছন্দনীয়।

দ্বীন ছাড়া উন্নতি আযাব

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, আজ মানুষ শুধু আর্থিক উন্নতির নাম 'উন্নতি' রেখেছে। চাই দ্বীন ঠিক থাকুক বা না থাকুক। এটা উন্নতি নয়; বরং আযাব। কেননা, যে উন্নতি দ্বীন ব্যতীত হয়, তা কোনো অর্জনই নয়। মরহুম আকবর এলাহাবাদী একজন চিন্তাশীল কবি ছিলেন। তার কবিতা–

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوۃ ہے نہ حج ہے
ہمیں اس سے پھر غرض کیا کوئی جنٹ کوئی جج ہے

অর্থাৎ, কেউ যদি কোনো পদের অধিকারী হয়ে যায় জেন্টলম্যান হয়ে যায় বা জজ-ব্যরিস্টার হয়ে যায়, কিন্তু দ্বীন থাকল না, নামায থাকল না, রোযা থাকল না তো দুনিয়াবী সকল উন্নতি অর্থহীন।

সুস্বাস্থ্য না গোদ

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যে আমরা দ্বীনদারী ছাড়া দুনিয়ার উন্নতিকে গোদ রোগ বলে মনে করি। এতে যদিও বাহ্যিকভাবে মনে হয় শরীর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এই বৃদ্ধি অসুস্থতা ও কষ্টের বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধির ফল ভালো হয় না। তেমনিভাবে যদি অর্থ-বিত্ত বৃদ্ধি পায় দ্বীনদারী বা দ্বীন হুমকীর মধ্যে পড়ে তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) এই উন্নতি ও অগ্রগতি হচ্ছে গোদের মতো। এটা এমন কোন ঈর্ষণীয় বস্তু নয়, যা হাসিল করার জন্য মানুষ চিন্তা করবে।

দুনিয়া অন্বেষণকারী শান্তিতে থাকে না

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

> 'ইমাম গাযালী (রহ.) লিখেছেন যে, আখেরাতের সামনে দুনিয়া পুরোপুরি ঘৃণার বস্তু। কিন্তু এই তুলনা ছাড়াও দুনিয়া ঘৃণিত। কেননা দুনিয়া অন্বেষণকারী শান্তিতে থাকে না। অর্থাৎ, দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য বাদ দিয়ে তার ভিতরের অবস্থা যদি লক্ষ কর, তাহলে দেখবে এরা কেউ দুঃখ-দুর্দশা

থেকে মুক্ত নয়। অপর দিকে আখেরাত অন্বেষণকারী সবাই শান্তিতে রয়েছে।' (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৭৯)

আখেরাতের সামনে দুনিয়া একেবারে মূল্যহীন

এই মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) ইমাম গাযালী (রহ.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তা এই যে, আখেরাতের সামনে দুনিয়ার কোনোই মূল্য নেই। কেননা, আখেরাত অসীম আর দুনিয়া সসীম। আর দুনিয়া এতো সসীম যে, কেউ জানে না সে কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে।

দুনিয়া নিজের বিচারেও প্রিয় হওয়ার যোগ্য নয়

আখেরাতের সঙ্গে তুলনা করা ছাড়াও যদি চিন্তা করা হয় তাহলেও দেখা যাবে যে, এটা কোনো মহব্বতযোগ্য বস্তু নয়। কারণ, বাহ্যিকভাবে যা ভালো দেখা যায়, যেমন টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, বাংলো-বাড়ি, গাড়ী, ফ্যাক্টরী এগুলো সব বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয়। আর যে লোক এই দুনিয়ার অন্বেষণকারী অর্থাৎ, রাত-দিন এই চিন্তায় পড়ে থাকে যে, আমার সম্পদ যেন বেড়ে যায়, আমার গাড়ি-বাড়ি যেন দামি হয়, তাহলে এ রকম দুনিয়ান্বেষীরা শান্তিতে থাকে না। কারণ, সব সময় সে এ নিয়ে পেরেশান থাকে, ফলে তার আর শান্তিতে থাকা হয় না।

ধনীরা বিপদের শিকার

যত বড় বড় পুঁজিপতি দেখা যায়, যারা মিল-কারখানার মালিক, তাদের বড় বড় বাড়ি আছে, বাংলো আছে, গাড়ি আছে, চাকর-নওকর আছে তাদেরকে বাহ্যিকভাবে দেখতে মনে হয় তারা খুব আনন্দে আছে। কিন্তু গভীরভাবে তাদের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে, বেচারা এত মুসীবতের শিকার যে তার কোনো হিসাব নেই। আর ঐসব মুসীবত সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। যখন আমরা তা জানতে পারি, তখন অনুমান করতে পারি যে, কী মুসীবতে সে রয়েছে।

একজন সম্পদশালীর অবস্থা

আমি আপনাদেরকে কী বলব? এমন অনেক লোক আমার কাছে এসেছে যাদেরকে দেখে সাধারণ লোক আফসোস করে বলে–

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ (سورة القصص : ٧٩)

হায়! আমাদেরও যদি এমন সম্পদ থাকত। এ তো খুবই ভাগ্যবান। আল্লাহ তাকে সবকিছু দিয়েছেন।

এক লোক, যার প্রতি ঘণ্টার আয় লাখের কাছাকাছি, বিভিন্ন রাষ্ট্রে তার বাড়ি, কারখানা-কোম্পানি রয়েছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তার ঘরে ঢুকে

দেখুন! কী মুসীবতে সে রয়েছে? তার স্ত্রী আমার কাছে এসে বলছে, এই সম্পদ আমার জন্য আযাব। কোনো ঝুপড়িতে যদি ডাল-ভাত খেয়ে থাকতাম তাহলে তা আমার জন্য হাজার গুণে ভালো হত!

ভাবুন, অন্যেরা তার সম্পর্কে কী চিন্তা করছে আর তার ঘরের অবস্থা কী?

দুনিয়ার লোভ শুধু বাড়তেই থাকে

যদি আপনি এই ধনীদের ভিতরের অবস্থা গভীরভাবে দেখেন, তাহলে দেখতে পারবেন শান্তি নামক বস্তু তাদের জীবনে নেই। যদি টাকা-পয়সা থাকে, কিন্তু শান্তি না পাওয়া যায় তাহলে ঐ পয়সা দিয়ে কী লাভ হল? যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তাদের কোনো পেরেশানী নেই তবুও এই দুনিয়া অন্বেষণটাই একটি আযাব। কারণ, দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য হল– মানুষ যতই এর পিছনে দৌড়ায় এ ততই পালিয়ে যায়। দুনিয়া-অন্বেষীরা দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মরেই যায়। অথচ দুনিয়া তার হাতে আসে না। কেননা, দুনিয়া অন্বেষীরা কোনো অবস্থাতেই স্থির হয় না।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার অন্বেষীর অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন যে, কারো যদি এক উপত্যকা ভরা স্বর্ণ লাভ হয় তাহলে সে চায় আরেক উপত্যকা হোক, দুই উপত্যকা হলে আশা করে তৃতীয় উপত্যকার। এভাবে একপর্যায়ে কবরের মাটি ছাড়া আর কোনো কিছুই তার পেট ভরতে পারে না। যত দিন জীবিত থাকে তত দিন সব সময় এই চিন্তাই করতে থাকে যে, অমুক জিনিসটা আমার নাই, ওটা যেন পেয়ে যাই, ঐ জিনিসটা নেই, ওটা যেন পেয়ে যাই। আর সব সময় ওগুলো পাওয়ার জন্য ছুটতে থাকে। এ অবস্থাটা আযাব ছাড়া আর কী?

অল্পেতুষ্টির মধ্যে শান্তি রয়েছে

শান্তি যদি কোনো বস্তুর মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হল অল্পেতুষ্টি। অর্থাৎ, যা কিছু আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়ায় আমাকে হালাল পদ্ধতিতে দান করেছেন আলহামদু লিল্লাহ! এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা জায়েয ও শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে যে পরিমাণ দুনিয়া অন্বেষণের অনুমতি দিয়েছেন তা করছি। যা পেলাম তার উপর আল্লাহর শোকর এবং তার দয়া। এটাই হল শান্তি। মনে রাখবেন, দুনিয়ার চাহিদা ও দুনিয়ার মহব্বতের সাথে অল্পেতুষ্টি কখনোই একত্রিত হতে পারে না।

অতএব, যে দুনিয়ার অন্বেষী হবে, দুনিয়াকে মহব্বত করবে তার কখনো অল্পে তুষ্টি হাসিল হবে না। সে তো বলবে আরো যেন পাই, আরো যেন পাই। আর যে দুনিয়ার অন্বেষী নয় সে ভাববে যে, দুনিয়া তো আমার জীবনেরই একটি অংশ। আল্লাহ তাআলা এই জীবনে কিছু দায়-দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা এই দায়িত্বগুলো আদায় করার জন্য দুনিয়া উপার্জন করছি

এবং তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ ও মহব্বত নেই, তাহলে আল্লাহ তার অন্তরে অল্পেতুষ্টি দান করবেন। আর অল্পেতুষ্টির চেয়ে অধিক শান্তিদায়ক কোনো বস্তু নেই।

কে শান্তিতে আছে

দেখুন! এক লোক ডাল-রুটি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে কিন্তু তার অন্তর প্রশান্ত যে, আলহামদু লিল্লাহ আমি যা কিছু পাচ্ছি তা হালাল এবং আমার জন্য উপযুক্ত। আমি এতেই খুশি। আর অন্য এক লোক বিরানী-কোর্মা খাচ্ছে এবং হাজারো বিলাসিতার মধ্যে রয়েছে কিন্তু তার চিন্তা, আমি কী পেলাম? অমুকের যা আছে তা তো আমার নেই, অমুকের যেমন গাড়ি-বাড়ি আছে আমারও তো সে রকম দরকার। সারাক্ষণ সে এভাবে চিন্তা করতে থাকে। বলুনতো কে শান্তিতে আছে? বলাবাহুল্য, যে ডাল-রুটি খাচ্ছে সে। কারণ, সে মানসিকভাবে তৃপ্ত এবং আল্লাহর শোকর গোযারীতে তার মন প্রশান্ত।

আমার পেয়ালায় রয়েছে পানশালার সারাৎসার

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.)-এর একটি সুন্দর কবিতা রয়েছে। আমার পড়তে খুব ভালো লাগে। তিনি বলেন–

مجھکو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی مے
میرے پیمانہ میں لیکن حاصل میخانہ ہے

কার পেয়ালায় কতটুকু পরিমাণ শরাব আছে তাতে আমার কী? আমার পেয়ালায় তো পানশালার সারবস্তুই রয়েছে।

অর্থাৎ, যা কিছু আল্লাহ আমার ভাগ্যে দিয়েছেন সেটাইতো আমার জন্য পানশালার সার-নির্যাস। এর উপর আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি এবং এতেই আমি তৃপ্ত। যে দিন মানুষের মধ্যে এই বুঝ তৈরি হবে, সে দিন তার দুনিয়ার পেরেশানী ও অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, দুনিয়াতে অল্পেতুষ্টি ছাড়া শান্তি পাওয়ার কোনো পথ নেই। যখন দিলে অল্পেতুষ্টি থাকবে না তখন দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও দুনিয়া অন্বেষণ শুরু হবে। আর তা মানুষকে রাত-দিন পেরেশানীতে ফেলে রাখবে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত শেখ সাদী (রহ.) 'গুলিস্তাঁ'য় একটি ঘটনা লিখেছেন যে, আমি একবার সফরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সে সারা রাত আমাকে

বিরক্ত করল এবং তার ব্যবসার কাহিনী আমাকে শোনাতে লাগল। অমুক জায়গায় আমার এই ব্যবসা, ভারতে ঐ জিনিসের কারবার, ইরানে ঐ জিনিসের কারবার, খোরাসানে ঐ বস্তুর কারবার ইত্যাদি। সব কাহিনী শোনানোর পর সে বলল, আমার সব কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তবে শেষ একটি বাণিজ্যের ইচ্ছা আছে, আমার জন্য দুআ করবেন এটা যেন সফল হয়। এরপর আমি অল্পেতুষ্টির জীবন যাপন শুরু করব। আর বাকী জীবন ছোটাছুটি না করে দোকান ঘরে বসেই কাটিয়ে দেব।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শেষ বাণিজ্য কোথায় হবে? সে বলল, আমি এখান থেকে পণ্য কিনে চীনে যাব সেখানে এগুলো বিক্রি করে কাচের পাত্র কিনব, সেগুলো রোমে নিয়ে বিক্রি করব। কারণ, চীনা কাচের মূল্য সেখানে বেশি। ওখান থেকে কিছু পণ্য কিনে আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে বিক্রি করব। সেখান থেকে কার্পেট কিনে ভারতে বিক্রি করব। ভারত থেকে গ্লাস কিনে হলব নিয়ে বিক্রি করব ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে সে সারা পৃথিবী সফরের এক বিশাল পরিকল্পনা উপস্থাপন করল। আর বলল, আমার জন্য দুআ করবেন কোনোভাবে এই পরিকল্পনা সফল হলেই আমি বাকী জীবন 'অল্পেতুষ্টি'র সাথে দোকানে বসে কাটিয়ে দিব। অর্থাৎ, এতকিছু করার পরও বাকী জীবন দোকান করব। শেখ সাদী (রহ.) সব শুনে বললেন–

آں شنیدستی کہ در صحرائے غور - رخت سالارا فتادہ اسپ طور
گفت چشم تنگ دنیادار را - یا قناعت پر کند یا خاک گور

আমি তাকে বললাম, তুমি শুনেছ যে, 'গোর' এর মরুভূমিতে এক বণিক তার খচ্চর সহকারে মৃত অবস্থায় পড়েছিল তার মালপত্র পড়ে ছিল তার পাশে। ঐ মালপত্র যেন বলছিল, দুনিয়াদারদের চোখের ক্ষুধা কেবল 'অল্পেতুষ্টি' বা কবরের মাটিই দূর করতে পারে। তৃতীয় কোনো বস্তু তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। শেখ সাদী (রহ.) বলেন, যখন এই দুনিয়া কারো উপর চেপে বসে তখন অন্তরে দুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো চিন্তার উদয় হয় না। এটাই হল 'দুনিয়ার মহব্বত' যা নিষিদ্ধ।

হাতে খুজলী হলে কী করব?

আমার সাথেও এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানের বহুত বড় এক ব্যবসায়ী যে পৃথিবীর বাইশ জন শীর্ষ ধনীর একজন; একদিন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তো আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। এখন আপনি কিছু ভালো

কাজ করে যান এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করুন, যা সুদ ছাড়া লেনদেন করবে। প্রথমেই সে জিজ্ঞেস করল, সুদ ছাড়া কীভাবে চলবে? আমি বললাম, আপনার তো হাজার হাজার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে। কোটি কোটি টাকা আপনার আয়। যদি একটি প্রতিষ্ঠান সুদ ছাড়া চলার কারণে লোকসানেরও মুখোমুখি হয়, তাহলেও আল্লাহর জন্য ক্ষতিটা বরদাশত করে নিবেন। সে বলল, মৌলভী সাহেব! আপনি বলেছেন ঠিকই কিন্তু হাতের খুজলীর কী করব? বাস্তবেই বিত্তশালীদের হাতে পয়সা বাড়ানোর খুজলী শুরু হয়ে যায়। এখন বলুন, ঐ খুজলীওয়ালা লোক শান্তিতে আছে, না যে ডাল-রুটি খেয়েই নিশ্চিন্ত সে শান্তিতে আছে?

ঐ সম্পদ দিয়ে কী লাভ যা পিতাকে সন্তান থেকেও দূরে সরিয়ে দেয়

এই খুজলী কি শান্তির বস্তু? এই খুজলীর ফল হল পিতার কাছে ছেলের খবর নেই। ছেলের কাছে পিতার খবর নেই। হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.)-এর নিকট এক ব্যবসায়ী এসে বলল : আমি অমুক জায়গায় কাজ করি আর আমার ছেলে অমুক জায়গায় কাজ করে। কথা-বার্তায় বুঝা গেল যে, পনের বছর ধরে সে ছেলের চেহারা দেখেনি! হায়! ঐ সম্পদ দিয়ে কী লাভ, যার কারণে সন্তানের সাথেও দেখা হয় না? সন্তানের সাথে থাকার আনন্দ পাওয়া যায় না?

মোটকথা, দুনিয়া অন্বেষণই একটি আযাব। হযরত ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াতো আযাবই। খোদ দুনিয়া অন্বেষণ নিজেও এক আযাব। তাই দুনিয়া একটি ঘৃণাযোগ্য বস্তু। যদি কোন বস্তু শান্তিদায়ক হয়, তাহলে তা অল্পেতুষ্টি অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমাকে জায়েয ও হালাল পন্থায় যা দিয়েছেন আমার জন্য তাই অনেক। এর মধ্যেই আমার তৃপ্তি ও স্বাদ।

দুনিয়ার ক্ষেত্রে নিচের দিকে তাকাও

দ্বীনের ব্যাপারে নিজের উপরে যারা আছে তাদেরকে দেখ। আর দুনিয়ার ব্যাপারে নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে দেখ। লক্ষ্য করুন, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের সম্পদ আপনার চেয়ে কম এবং তারা বিভিন্ন পেরেশানীর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন এবং ঐ লোকদের থেকে উত্তম বানিয়েছেন এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন : দুনিয়া অন্বেষী শান্তি পায় না। যদি বাহ্যিক চাকচিক্য বাদ দিয়ে

ভিতরের অবস্থা লক্ষ করা হয়, তাহলে বুঝতে পারবে সে কোনো পেরেশানী থেকে মুক্ত নয়। প্রত্যেকে দুনিয়ার ব্যাধিতে আক্রান্ত।

এক মাজযূবের অল্পেতুষ্টি

পরে বলেন যে, অপর দিকে আখেরাত অন্বেষীরা সবাই শান্তিতে আছে। কেন? এজন্য যে, তাদের অন্তরে অল্পেতুষ্টি আছে। যার ফলে তাদের কোনো চিন্তাই নেই। দেওবন্দে একটি টিলার উপর আমাদের বোনের বাড়ি ছিল। সেখানে এক মাজযূব থাকত। বোন তাকে বলতেন, আমাকে বাজার থেকে ঐ জিনিসটা এনে দাও। সে নিয়ে আসত এবং এর বিনিময়ে বোন তাকে কখনো পয়সা দিতেন, কখনো খাবার দিতেন। ঐ মাজযূব মাঝে মধ্যে কথা শুনত এবং বাজারে যেত আবার কখনো না করে দিত। একবার বোন তাকে বললেন, আমাকে ঐ জিনিসটা এনে দাও, তোমাকে এক পয়সা দিব। মাজযূব বলল, যাব না। জিজ্ঞেস করা হল, কেন যাবে না? সে বলল : আমার ক্ষুধা লাগেনি। তার উদ্দেশ্য হল, আমি তখনই কাজ করব যখন আমার ক্ষুধা লাগবে এবং পয়সার দরকার হবে। এখন আমার ক্ষুধা নেই, তাই কাজের দরকারও নেই।

ফকীরীর মধ্যে রয়েছে সুখ ও শান্তি

ঐ ব্যক্তির "অল্পেতুষ্টি"র দিকে লক্ষ করুন, যে বলে যে, যখন পয়সার দরকার হবে তখন কাজ করব। এখন তো আমার প্রয়োজন নেই তাই পয়সারও দরকার নেই। তার চেহারায় শান্তি ও প্রশান্তির যে ছাপ দেখা যেত তা বড় বড় ধনীদের চেহারায় দেখা যেত না। কারণ, তার মধ্যে অল্পেতুষ্টি ছিল এবং এই গরীবীর মধ্যে শান্তি ও প্রশান্তি ছিল। অতএব, বাস্তবতা হল শান্তি ও প্রশান্তি হাসিলের জন্য দুনিয়ার কোনো বস্তুর প্রয়োজন নেই; বরং এটা আল্লাহ তাআলার দান। তিনি যদি চান তাহলে ডাল-রুটির মধ্যে শান্তি দান করেন। তবে শর্ত হল মানুষের মধ্যে আখেরাতের অন্বেষণ থাকতে হবে। যদি তিনি না দেন, তাহলে বড় বড় বাড়ি ও বাংলোর মধ্যেও পেরেশানী হতে থাকবে। এজন্য হযরত থানভী (রহ.) বলেন : 'অপর দিকে আখেরাত অন্বেষীরা সবাই শান্তিতে থাকে।' কেননা দুনিয়ার হাকীকত তাদের সামনে রয়েছে এবং তাদের মনে অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অল্পেতুষ্টি দান করেছেন। এজন্য জীবন সুখে কাটে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে অল্পেতুষ্টির জীবন দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তেষট্টিতম মজলিস

দুনিয়াকে অগ্রগণ্য মনে করা নিষিদ্ধ

দুনিয়াকে অগ্রগণ্য মনে করা নিষিদ্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

সম্পদ উপার্জন নিষিদ্ধ নয়

এক বয়ানে হযরত থানভী (রহ.) বলেন–

'আমি সম্পদ উপার্জন করা থেকে নিষেধ করি না, সম্পদের মোহ থেকে নিষেধ করি। দেখুন, অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল উপার্জনও একটি ফরয, বরং আল্লাহ তাআলার কত বড় মেহেরবানী যে, তিনি দুনিয়ার মহব্বতকে নিষেধ করেননি; বরং (দুনিয়াতে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মহব্বতের) চেয়ে অধিক মহব্বত করতে নিষেধ করেছেন, যার আলামত হল দুনিয়ার কারণে আমলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। এমনকি অর্থ-সম্পদের প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা অধিক হওয়াও নিষিদ্ধ নয়, নিষিদ্ধ হল চিন্তাগতভাবেও সম্পদের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া। চিন্তাগতভাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের মহব্বতকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এর আলামত হল, আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালনে ও 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'তে কোনো ধরনের ত্রুটি হতে না দেওয়া। যদি এটা ঠিক থাকে তাহলে স্বভাবগত মহব্বত অধিক হলেও চাই সম্পদের প্রতি হোক কিংবা স্ত্রীর প্রতি কিংবা সন্তানের প্রতি, ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেউ যদি স্বীয় সন্তানের মৃত্যুতে খুব কাঁদে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের ঘটনা শুনে বেশি না কাঁদে, তবে এর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যখন দ্বীনী বিষয় ও দুনিয়াবী স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ হবে তখন দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু যদি দুনিয়ার লোভ ও আসক্তিকে দ্বীনের জন্য কুরবান করা

হয় অথচ এর জন্য দুঃখ হচ্ছে, মনোকষ্ট হচ্ছে, তাহলে শাস্তির তো প্রশ্নই আসে না বরং সে অনেক বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে। তাকওয়ার পূর্ণতা তো এখানেই যে, দুনিয়ার লোভ ও আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হওয়া।

شہوت دنیا مثل گلخن است

کہ از وحمام تقوی روشن است

অর্থ, মোটকথা, পার্থিব আকর্ষণমাত্রই নিন্দিত নয়। হাঁ, এই আকর্ষণকে কার্যক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া নিন্দিত।"

(আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ৬৮)

কুরআনে কারীমের ইরশাদ

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآءُكُمْ وَاَبْنَآءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ (سورة التوبة : ٢٤)

বলুন তোমাদের নিকট যদি যদি তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্ররা এবং তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের গোষ্ঠী এবং তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ব্যবসা, যাতে মন্দা হওয়ার তোমরা আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা পসন্দ কর, (যদি এগুলো) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করার।

(সূরা তাওবা : ২৪)

দুনিয়ার নিছক মহব্বত নিন্দিত নয়

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে দুনিয়া যেন আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়। এতে বুঝা গেল, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি সাধারণ আগ্রহ-মহব্বত নিন্দিত নয়। আল্লাহ তাআলার রহমত দেখুন, না তিনি দুনিয়া উপার্জন

করা নিষিদ্ধ করেছেন, আর না দুনিয়ার এমন আগ্রহকে, যা আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি নয়। এটুকু আকর্ষণ অনুমোদিত।

দুনিয়ার মহব্বত অধিক হওয়ার আলামত

কিন্তু কীভাবে বুঝা যাবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত বেশি, না দুনিয়ার মহব্বত বেশি? এর উত্তর হযরত থানভী (রহ.) এভাবে দিয়েছেন যে, 'এর আলামত হল আমলে ব্যাঘাত ঘটা।' অর্থাৎ, যখন সম্পদের আগ্রহ এবং তা উপার্জনের মগ্নতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি করবে তখন বুঝে নিতে হবে যে, দুনিয়ার মহব্বত অধিক হয়ে গেছে। এটা ভয়ের কারণ ও গোনাহের কারণ।

স্বভাবজাত অধিক মহব্বতও নিষিদ্ধ নয়

এরপর হযরত থানভী (রহ.) আরো সহজ বিষয় বলেছেন যে, স্বভাবগত আকর্ষণ বেশি হওয়াও নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ হচ্ছে, বিবেচনাগত প্রাধান্য। এতে বিষয়টা আমাদের জন্য আরো সহজ হয়ে গেল। অর্থাৎ, কারো যদি পার্থিব বস্তুর সাথে স্বভাবগত আকর্ষণ অধিকও থাকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ ঐ পর্যায়ের না-ও হয়, তবুও তাতেও সমস্যা নেই। কেননা, এটা যেহেতু স্বভাবগত বিষয় তাই তা মানুষের ইচ্ছার অধীন নয়। এজন্য এর উপর জবাবদিহি ও গোনাহও হবে না। যৌক্তিক মহব্বতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

তবে বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ, বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা একথা চিন্তা করুন যে, দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী প্রয়োজনীয় হলেও এগুলো ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা ও তার সুফল অনন্ত-চিরস্থায়ী। একথাগুলো যখন চিন্তা করেছেন এবং এর উপর বিশ্বাস তৈরি হয়েছে তখন যৌক্তিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত ও প্রাধান্য আপনার মনে সৃষ্টি হল।

ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলার কি অশেষ অনুগ্রহ! তিনি যেমন সম্পদ উপার্জনকেও নিষেধ করেননি, তেমনি সম্পদের স্বভাবগত আকর্ষণকেও অপরাধ সাব্যস্ত করেননি, এমনকি এটা মানুষের বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন না করা পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছেন।

হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-এর ঘটনা

হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী (রাযি.) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি হযরত উমর (রাযি.)-এর

হাত ধরে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সকল বস্তু থেকে প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার জীবনের শপথ! ততক্ষণ তুমি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। হযরত উমর (রাযি.) বললেন : আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এখন হল হে উমর! (বুখারী, কিতাবুল আইমানি ওয়ান নুযুর)

হযরত উমর ফারূক (রাযি.)-এর কথাটা লক্ষ্য করুন, অন্য কেউ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলতে পারত যে, আপনার সাথে আমার এত মহব্বত নেই। কিন্তু ফারূকে আযম (রাযি.) তার প্রকৃত অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রকাশ করে দিলেন, যাতে চিকিৎসার কোনো বিষয় থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিকিৎসা করেন।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)-এর বুকে চাপড় দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রাযি.) বলে উঠলেন, اَلْاٰنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ। হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।

মুহূর্তের মধ্যে এ পরিবর্তন কীভাবে হল?

প্রশ্ন হয় যে, এক মুহূর্তে এই পরিবর্তন কীভাবে হয়ে গেল? কিছুক্ষণ আগেও যিনি বলছিলেন, আপনি আমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় নন, তিনিই এখন বলছেন, এখন আপনি প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। এক মুহূর্তে কীভাবে এটা সম্ভব হল? মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর দুটো ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বুকে হাত রাখার মাধ্যমে তাসাররুফ প্রয়োগ করেছিলেন, যার ফলে অন্তরে যে ঘাটতি ছিল তা দূর হয়ে যায় এবং যে পর্যায়ের মহব্বত দরকার ছিল তা হাসিল হয়ে যায়।

হযরত ফারূকে আযম (রাযি.) স্বভাবগত মহব্বত মনে করেছিলেন

অন্যান্য আলেমগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন– তা-ই হযরত থানভী (রহ.)-এর মত। তা এই যে, যখন হযরত ফারূকে আযম (রাযি.) এই হাদীস শুনলেন, তখন তিনি এর অর্থ স্বভাবগত মহব্বত মনে করেন। অর্থাৎ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বভাবগত মহব্বতও নিজের জান-মাল, পিতা-মাতা ও সন্তানাদি থেকে অধিক থাকা দরকার। এজন্য তিনি বললেন, স্বভাবগতভাবে তো

প্রাণটাই অধিক প্রিয় যদিও প্রয়োজনের মুহূর্তে রাসূলের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু হযরত উমর (রাযি.) হাদীস শরীফের যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন তা উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবগত প্রেরণার কথা বলেননি বরং বুদ্ধি ও বিশ্বাসের কথা বলেছেন। এ কারণেই তিনি তাঁর বুকে হাত রেখে সেদিকে ইশারা করলেন যে, আমার উদ্দেশ্য বুদ্ধি ও বিশ্বাসগত মহব্বত তা তো তোমার আল্লাহর রহমতে পুরোপুরিই আছে। তখন হযরত ফারূকে আযম (রাযি.)ও তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে এই ভুল ধারণা দূর হয়ে গেল। আর তিনি বলে উঠলেন الآن। অর্থাৎ, এখন বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে এবং এদিক দিয়ে তো আপনি আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। এটা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।

স্বভাবগত আকর্ষণ মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত

মোটকথা, যেসব ক্ষেত্রে ভালবাসার আদেশ ও বিধান এসেছে সেখানে যুক্তি ও বিশ্বাসগত ভালবাসাই উদ্দেশ্য। স্বভাবগত প্রেরণা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির যদি দুই স্ত্রী থাকে, তাহলে তার জন্য শরীয়তের বিধান হল উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা। তাহলে দুজনের প্রতি ভালোবাসাও সমান হতে হবে। কিন্তু সে ভালোবাসা যৌক্তিক ভালোবাসা। স্বভাবজাত ভালোবাসা নয়। কেননা এটা এক স্ত্রীর প্রতি অধিক হতে পারে এবং অন্যজনের প্রতি কম হতে পারে। এটা অপরাধ নয়। কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। হাঁ, অপরাধ তখনই হবে, যখন এক স্ত্রীর প্রতি অধিক আকর্ষণ আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পাবে এবং সমতা নষ্ট করবে। এটা অপরাধ হবে এবং এজন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

স্ত্রীদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমতা রক্ষা

দেখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল স্ত্রীদের মাঝে এমনভাবে সমতা রক্ষা করতেন যে, পৃথিবীতে কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। এরপরও তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি করেছি। আর যেটা আমার সাধ্যের বাইরে তার জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না। যেমন, স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান যেরূপ ছিল অন্য কারো প্রতি তেমন ছিল না। কিন্তু এটা স্বভাবগত প্রেরণার বিষয়, আচার-আচরণ এবং অধিকার আদায়ের প্রসঙ্গে তিনি সবার সাথে সমান ব্যবহার করতেন। মোটকথা, ভালবাসার বিষয়টি যেখানে বিধানরূপে এসেছে সেখানে বুদ্ধি ও যৌক্তিক ভালবাসা উদ্দেশ্য।

যৌক্তিক ভালবাসা হচ্ছে আইনী বিষয়

এই আইনী বিষয়টা অনেকটা শুষ্ক বিষয়। এটা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু শুষ্ক বিষয় হওয়ার কারণে কখনো তা হ্রাসও পেতে পারে। তাই এই ভালবাসা যেন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় সে উপায় অবলম্বন করা জরুরি। যেন নিছক বিচার-বুদ্ধির পর্যায় থেকে এই ভালবাসা হৃদয় ও স্বভাবের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যেন হৃদয়ের আকর্ষণও আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি অন্য সকল বস্তুর চেয়ে অধিক হয়ে যায়।

যৌক্তিক ভালবাসাকে হৃদয়ের ভালবাসায় পরিণত করা

যৌক্তিক ভালবাসাকে হৃদয় ও স্বভাবে স্থান দেওয়ার পদ্ধতি হল কার্যক্ষেত্রে সর্বদা বুদ্ধির বিচার অনুসরণ করা। কেননা মানুষ যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকেই সর্বদা অগ্রগণ্য বিবেচনা করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আদেশের বিপরীত সকল পার্থিব চাহিদাকে দলিত-মথিত করবে তখন ধীরে ধীরে এটাই স্বভাবের অংশে পরিণত হবে। তখন স্বভাবগত আকর্ষণও ঐ দিকেই বেশি হবে।

মৌলভী ও সুফীর মহব্বতের মধ্যে পার্থক্য

মৌলভী ও সুফীর মধ্যে পার্থক্য এটিই। মৌলভীর মহব্বত হয় বুদ্ধিগত আর সুফীর মহব্বত হৃদয়গত। এজন্য যে কথাটা বলা হয় যে, মৌলভীর উচিত কোনো সুফীর সোহবত গ্রহণ করা এবং তাঁর কাছ থেকে ফয়েয হাসিল করা এর তাৎপর্য এই যে, কিতাব পড়ার দ্বারা তো আল্লাহর সাথে একপ্রকার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, যা জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়, যদি শরীয়তের হুকুম-আহকাম অনুযায়ী আমল করতে থাকে। কিন্তু মৌলভী যদি এটুকু সম্পর্কই যথেষ্ট মনে করে তাহলে আশঙ্কা রয়েছে যে, কোনো সময় তার এই স্বভাবজাত আকর্ষণ প্রবল হয়ে যাবে এবং বুদ্ধির শাসন দুর্বল হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধি ও বিশ্বাসের ভালবাসাকে স্বভাবগত ভালবাসায় পরিণত করার চেষ্টা করুন।

আমরা কিতাবে এই কথাগুলো পড়েছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসগত ভালবাসা ও প্রাধান্যই যথেষ্ট; আর এটা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তাই যদি দুনিয়ার প্রতি আমাদের মহব্বত বৃদ্ধিও পায় এবং স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদের আকর্ষণ অধিক মনে হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এটা হল স্বভাবগত আকর্ষণ। কথা বেঠিক নয়, কিন্তু আসল কথা এই যে, মানুষের স্বভাবগত প্রেরণাগুলো যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তাহলে যে কোনো সময় এটা বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে পরাস্ত করার এবং গোনাহের কাজে লিপ্ত করে দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্যথায় বুদ্ধি ও বিশ্বাসগতভাবে তো সব মুমিনই আল্লাহর

সন্তুষ্টিকেই সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কেননা যে বিশ্বাস করে, আমার খালেক ও মালেক আল্লাহ। তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এবং কর্মবিধায়ক। অতএব প্রকৃত ভালবাসার তিনিই একমাত্র হকদার। এসব বিষয়ে যার ঈমান রয়েছে, বলাবাহুল্য যে, তার বুদ্ধি ও বিশ্বাসগত ভালবাসা আল্লাহর প্রতিই রয়েছে, কিন্তু তারপরেও যে মানুষ গোনাহ করে, তার কারণ এই যে, তখন তার স্বভাবের তাড়না, বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উপর প্রবল হয়ে যায় এবং সে গোনাহ করে ফেলে। এজন্য মুজাহাদা করতে হয় যেন বিশ্বাসগত বিষয়গুলো স্বভাবগত বিষয়ে পরিণত হয়। এরই নাম ইশক।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর সোহবতে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। চল্লিশ দিন পর হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) যখন বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন হাজী ছাহেব বললেন, তোমাকে যা দেওয়ার ছিল দিয়ে দিয়েছি। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) পরে বলতেন, আমি তাঁর এই কথাটা নিয়ে খুব ভেবেছি কিন্তু বারো বছর পর্যন্ত আমি এর তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। বারো বছর পর বুঝলাম যে, তিনি ঐ জিনিস দিয়েছেন যে সম্পর্কে খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) বলেন–

زہد زاہد را و دین دیندار را - ذرہ درد دل عطار را

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়াত্যাগীকে যুহদ দান করেন, দ্বীনদারকে দান করেন দ্বীন। যাকে যা দিতে চান দিন। আমি আপনার কাছে শুধু প্রার্থনা করি হৃদয়ের এককণা ব্যথা।

ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) যে অন্তর্জ্বালা কামনা করেছিলেন হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন : বারো বছর পর টের পেলাম যে, ঐ এক কণা 'দরদে দিল' হল ইশক ও মহব্বত।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর মাকাম

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) যখন গাংগুহ ফিরে আসেন তখন একটি দীর্ঘ সময় আশ্চর্য আচ্ছন্নতায় কাটল। এ সময় হযরত হাজী ছাহেব (রহ.)কে কোনো চিঠিপত্রও লিখেননি। এক সময় হাজী সাহেব (রহ.) নিজেই চিঠি লিখলেন যে, বেটা এতদিন হল তোমার কোনো সংবাদ পেলাম না, কেমন আছো? উত্তরে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) লিখলেন, হযরত! বারবার লেখার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু এজন্য লিখতে পারিনি যে, নিজের অবস্থা আপনার খেদমতে আর কী বলব।

তবে আপনার সোহবতের বদৌলতে এটুকু অনুভব করি যে, শরীয়তই তবীয়তে (স্বভাব) পরিণত হয়েছে, নিন্দুক ও প্রশংসাকারী সমান হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কেউ প্রশংসা করুক বা নিন্দা করুক, কোনো পার্থক্য অনুভূত হয় না এবং শরীয়তের কোনো মাসআলায় আলহামদুলিল্লাহ কোনো অস্পষ্টতা নেই।

এ স্তরতো আমারও লাভ হয়নি

হাজী ছাহেব (রহ.) যখন এ চিঠি পেলেন তখন তা পড়ে মাথার উপরে রাখলেন এবং বললেন, এই মাকামতো আমারও হাসিল হয়নি, অথচ তা এক যুবকের হাসিল হয়ে গেল! কেমন ছিলেন শায়েখ এবং কেমন তার মুরীদ!

শরীয়ত অভ্যাসে পরিণত হল

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)-এর প্রথম কথা– শরীয়ত তবীয়তে (স্বভাব) পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ এক কণা 'দর্দে দিল' শরীয়তের বিধানকে স্বভাবের প্রেরণায় পরিণত করে দিয়েছে। যতদিন মুদাররিস ছিলেন এবং দরস-তাদরীসে মশগুল ছিলেন তত দিন তো শরীয়তের প্রতি আকর্ষণ ছিল বুদ্ধি ও বিশ্বাসগত। আর যখন শায়েখের কাছে নিজের ইসলাহ করালেন তখন তা পরিণত হল স্বভাবের প্রেরণায়। এখন স্বভাবগতভাবেই সে কাজ করতে ইচ্ছে হয় যা শরীয়তেরই আদেশ। শরীয়তের পরিপন্থী বিষয়গুলো এখন স্বভাবেরও পরিপন্থী হয়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য যে, এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। কুরআন মজীদে এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরামকে এই নেয়ামত দান করা হয়েছিল। ইরশাদ হয়েছে–

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ

অর্থ : আল্লাহ ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে ঈমানকে সুসজ্জিত করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীকে তোমাদের অন্তরে অপসন্দনীয় করে দিয়েছেন।

বলা হল যে, তাদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের দাবিকে স্বভাবের প্রেরণায় পরিণত করেছেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই নেয়ামত দান করুন। আমীন।

সাহাবায়ে কেরাম ও স্বভাবজাত মহব্বত

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে মহব্বত, ভালবাসা দান করা হয়েছিল তা তাদের

স্বভাবের প্রেরণায় পরিণত হয়েছিল এবং তা এতই গভীর ছিল যে, এর বিপরীতে পৃথিবীর সকল বস্তু তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

এজন্যই আল্লাহ এই আয়াতের শেষে তাদের প্রশংসা করে বলেছেন :

أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

অর্থাৎ, তাদেরকে 'হেদায়েতপ্রাপ্ত' হওয়ার সনদ দিয়ে দিলেন।

এই সনদ তারা লাভ করেছেন মুজাহাদার বদৌলতে। তারা তাদের কামনা-বাসনাকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিলুপ্ত করেছিলেন। এই মুজাহাদার দ্বারাই আল্লাহর প্রতি চিরস্থায়ী ভালোবাসা জন্মে এবং এটা এমন এক নেয়ামত যে, এর তুলনায় দুনিয়ার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ ও ভালবাসা অতি তুচ্ছ।

ইশক তো তাঁর প্রতিই হওয়া চাই

কবি ইকবাল মাঝে মধ্যে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেন। এক কবিতায় তিনি বলেছেন–

وہ عشق جس کی آگ بجھا دے اجل کی پھونک
اس میں مزہ نہیں تپش انتظار کا

অর্থাৎ, পার্থিব প্রেম-ভালবাসাকে তো সময়ের ফুৎকার নির্বাপিত করে দেয়। সুতরাং এমন ক্ষণস্থায়ী প্রেমের আগুনে দগ্ধ হয়ে কোনো মজা নেই। ইশক তো ওই এক সত্তার সঙ্গেই হওয়া চাই যিনি চিরঞ্জীব। ঐ ইশক শাশ্বত, যার কোনো ক্ষয় নেই, লয় নেই। এই ইশক শুধু তখনই হাসিল হয় যখন মানুষ নিজের কামনা-বাসনা আল্লাহর জন্য কুরবানী করে দেয়। সকল ইচ্ছা ও প্রবণতাকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবারণ করে, অন্তরকে আল্লাহর জন্য খালি করে দেয়। তখনই মানুষ ইশকে হাকীকীর নেয়ামত অর্জন করে।

এবার আসুন, এবার তো হয়েছি নির্জন

হযরত মাজযূব (রহ.)-এর একটি পংক্তি আছে, যার সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, আমার কাছে যদি এক লাখ রূপী থাকত তাহলে আমি তোমাকে এই পংক্তির জন্য তা দিয়ে দিতাম। এই আশ্চর্য পংক্তি না জানি কোন হালতে আবৃতি করেছিলেন–

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئی - اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی

হৃদয়ের সব কামনা-বাসনা বিদায় নিয়েছে। এবার আসুন বন্ধু, এখন তো নিরালা হয়েছে।

এই পংক্তিতে আল্লাহ পাকের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, আমার অন্তরে যত কামনা ছিল, যত চাহিদা ও বাসনা ছিল সবই আমি বিদায় করে দিয়েছি। এখন তো কোনো চাওয়া আর বাকী নেই, হৃদয়ের নির্জনতায় শুধু আপনারই 'আবির্ভাবে'র অপেক্ষায় আছি।

সারকথা

সারকথা এই যে, যার অন্তরেই ঈমান আছে, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বুদ্ধিগত ভালবাসার চেয়েও অধিক ভালবাসা তার অন্তরে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই বুদ্ধিগত ভালবাসা স্বভাবের প্রেরণায় পরাস্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাই একে স্বভাবে পরিণত করার চিন্তা করা জরুরি। এর জন্য মুজাহাদা লাগবে। যেখানেই আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সঙ্গে মনের ইচ্ছা ও প্রবণতার সংঘর্ষ হবে সেখানেই এগুলোকে প্রতিহত করতে হবে, হত্যা করতে হবে। এভাবে একসময় এইসব প্রবণতা মৃতপ্রায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রকৃত মহব্বত বান্দাকে দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদের সবাইকে ওই নেয়ামত দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

চৌষট্টিতম মজলিস

পদের লোভ ও তার চিকিৎসা

পদের লোভ ও তার চিকিৎসা

পদের লোভের হাকীকত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

ভূমিকা

বিগত কয়েক দিন যাবৎ দুনিয়ার মহব্বত সম্পর্কে আলোচনা চলছিলো। দুনিয়ার মহব্বতের ব্যাপারে হযরত থানভী (রহ.)-এর বিভিন্ন ইরশাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বয়ান আল্লাহর শোকর হয়ে গেছে। সামনে পদলিপ্সা সম্পর্কে হযরত থানভী (রহ.)-এর ইরশাদাত উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়া ও সম্পদের মোহের ন্যায় পদের লোভও বড় খারাপ বস্তু। আর এটাও অনেক বড় একটি বাতেনী রোগ।

পদমর্যাদা বা 'জাহ' কাকে বলে

'জাহ' শব্দের অর্থ মর্তবা, অবস্থান। যেমন কেউ বড় ডিগ্রী পেল, বড় দায়িত্বের অধিকারী হল, অথবা মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল। মানুষ তার সম্মান করে, প্রশংসা করে। এর নাম 'জাহ'। অর্থাৎ, মানুষের অন্তরে এমন মর্যাদা লাভ করা, যার ফলে তাঁরা তাকে সম্মান করে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

মর্যাদার মোহ একটি ভয়াবহ ব্যাধি

এর সূচনা হয় প্রশংসার মোহ থেকে। অর্থাৎ, অন্তরে এই আগ্রহ জাগে যে মানুষ আমার প্রশংসা করুক, গুণগান করুক। যেন প্রশংসার মোহ থেকে মর্যাদার মোহের সূচনা। এটা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তা সম্পদের মোহের মতো মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

সূচিপত্র

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ (ترمذى، كتاب الزهد حرص المرء على المال والشرف)

অর্থাৎ, দুটো ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হলে তারাও এত ক্ষতি করতে পারে না যতটা ক্ষতি মর্যাদা ও সম্পদের মোহ মানুষের দ্বীনের মধ্যে করে। বাঘ যদি আগে থেকেই ক্ষুধার্ত হয় এরপর তাকে ছাড়া হয় বকরীর পালে তাহলে অনুমান করুন বকরীর পালের কত বড় ক্ষতি সে করবে এবং কতগুলো বকরীকে সে আহত ও নিহত করবে। কিন্তু সম্পদ ও মর্যাদার মোহ মানুষের দ্বীনের এর চেয়েও বেশি ক্ষতি করে। এটা মানুষের দ্বীনদারীকে বরবাদ করে দেয়, অন্তরকে বরবাদ করে দেয়, রূহানী মর্তবা ধ্বংস করে দেয় এবং ইখলাস খতম করে দেয়।

মর্যাদার মোহের প্রথম শিকার ইখলাস

দেখুন, আমলে যদি ইখলাস না থাকে, তাহলে আর কী থাকল। ইখলাস নেই তো ইবাদতও নেই। নামায পড়া হল, রোযা রাখা হল কিন্তু কোনো কাজেই আসবে না। কারণ, ইখলাস নেই। হজ্জ করা হল, উমরা করা হল কিন্তু সব বেকার, কেননা ইখলাস নেই। এজন্য আমল থেকে ইখলাস ছুটে গেলে তখন আর কিছুই বাকী থাকে না। আর মর্যাদার মোহ সর্বপ্রথম হামলা করে ইখলাসের উপর। কারণ, মর্যাদার মোহ পয়দা হওয়ার পর মানুষ যা কিছু করে তা শুধু মানুষের প্রশংসার জন্য করে, তার একমাত্র চিন্তা এই থাকে যে, মানুষ যেন আমার প্রশংসা করে, মানুষের মধ্যে যেন আমি প্রসিদ্ধি পেয়ে যাই, গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যাই। যখন এ সকল উদ্দেশ্যের জন্যই সে ইবাদাত করে তখন আর ইখলাস থাকে না। ইখলাস যখন শেষ তখন সব ইবাদত বরবাদ।

ইখলাস না থাকলে কিছুই থাকে না

এই হাদীসে এজন্যই সম্পদের ও মর্যাদার মোহকে দুই ক্ষুধার্ত বাঘের সমান ক্ষতিকর বলা হয়নি; বরং তার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর বলা হয়েছে। কেননা, বাঘগুলিতো শুধু বকরীর গোশত খাবে, কিন্তু হাড় রেখে দিবে। হতে পারে চামড়া রেখে দিবে, রক্ত রেখে দিবে, পা রেখে দিবে। অর্থাৎ, বেশির ভাগ খেয়ে ফেললেও কিছু না কিছু রেখে দিবে। কিন্তু সম্পদ ও মর্যাদার মোহ যখন কারো দ্বীনদারীর উপর আঘাত করে তখন– আল্লাহর পানাহ– তখন কিছুই আর

অবশিষ্ট থাকে না। কেননা যদি ইখলাস না থাকে তাহলে কিছুই থাকে না। সব আমল বরবাদ হয়ে যায়। এজন্য ইরশাদ হয়েছে, 'সম্পদ ও মর্যাদার মোহ দুই ক্ষুধার্ত বাঘের চেয়েও ক্ষতিকর।' আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন। আমীন।

মর্যাদা একটি ক্ষণস্থায়ী ও এখতিয়ারবিহীন বিষয়

মর্যাদা একেবারে ক্ষণস্থায়ী বিষয়। বলতে গেলে একটি কল্পিত বিষয়। সম্পদের তো কিছু না কিছু বাস্তবতা আছে। টাকা-পয়সা যদি থাকে তাহলে প্রয়োজন হলে বাজার থেকে কিছু কিনতে পারবে, নিজের প্রয়োজন ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ করতে পারবে। কিন্তু মর্যাদা একটি গ্রহণযোগ্যতার (মনে করা করির) বিষয়। আবার গ্রহণযোগ্যতাও নিজের পক্ষ থেকে নয় অন্যের পক্ষ থেকে অর্থাৎ, অমুক আমাকে এ রকম মনে করে, অন্যে আমার প্রশংসা করে। এটা 'জাহ'। আর অন্যের কাজ তো নিজের এখতিয়ারে নেই। আমার জানা নেই, আমার এই কাজের উপর মানুষ প্রশংসা করবে, নাকি করবে না। অথচ আপনার অন্তরে এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষ আমাকে ভালো মনে করুক, আমার প্রশংসা করুক। সেজন্য পদলিপ্সা তথা মর্যাদার মোহ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী ও কাল্পনিক একটা বিষয়।

পদ ও দায়িত্ব দ্বারা মর্যাদা লাভ অপরিহার্য নয়

মানুষের এখতিয়ারে বেশি থেকে বেশি যা রয়েছে তা হল কোনো পদ লাভ করা। কোনো দায়িত্ব লাভ করা। কিন্তু শুধু পদ ও দায়িত্বের দ্বারা মানুষ মর্যাদা পায় না। মর্যাদা তখনই পায় যখন ঐ পদ ও দায়িত্বের ফলে মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়। নতুবা এমন অসংখ্য দায়িত্বশীল রয়েছে যারা পদ ও দায়িত্বতো পেয়েছে কিন্তু তারপরও মানুষের অন্তরে কোনো রকম গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করতে পারেনি। ফলে তার উদ্দেশ্যও সফল হয়নি। এজন্য এই মর্যাদা এমনই অনিশ্চিত ও অস্থায়ী বস্তু যে, এটা সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভরশীল, ব্যক্তির কোনো এখতিয়ার এখানে নেই। এজন্য সর্বপ্রথম মানুষকে ভাবতে হবে যে, আমি কেমন মুসীবতে পড়েছি আর এমন এক বস্তুর পিছে পড়েছি যার সম্পর্ক অন্যের সাথে। যেখানে আমার কোনো দখল নেই।

অন্যের প্রশংসা শূন্যে মিলিয়ে যায়

কেউ যদি আপনার প্রশংসা করেও যেমন কোথাও ভাষণ দিলেন আর মানুষ বলতে লাগল, জনাব! আপনি খুব সুন্দর ভাষণ দিয়েছেন অথবা বলল, আপনি

খুব ভালো একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, কিংবা আপনি খুব সুন্দর ফতোয়া লিখেছেন, আপনি বড় আলেম, আপনি খুব মূল্যবান কথা বলেছেন এভাবে কখনো কেউ আপনার প্রশংসায় একটি কথা বলল আর তা শূন্যে মিলিয়ে গেল আর আপনি ঐ সময় ঐ কথা শুনে আনন্দিত হলেন যে, এ লোক আমার প্রশংসা করেছে। সেই আনন্দও মুহূর্তের জন্য ছিল, এরপর তা-ও শূন্যে মিলিয়ে গেল– তাহলে প্রাপ্তি কতটুকু?

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.) বলতেন, এই আনন্দকে স্থায়ী করার কোনো পদ্ধতি নেই। তবে একটা উপায় এই হতে পারে যে, প্রশংসাকারীকে বলা যে, ভাই! আপনি যা বলেছিলেন তা খুব ভালো ছিল আবার একটু বলুন। এরপর হয়তো তৃতীয়বারের জন্যও অনুরোধ করা যাবে। কিন্তু এভাবে অনুরোধ করলে ফলাফল দাঁড়াবে বিষয়টা হাস্যকর হয়ে যাবে এবং একবার প্রশংসা পেয়ে যে আনন্দটা হয়েছিল তা-ও শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এজন্য একবার প্রশংসা শোনার পর দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করা যাবে না।

প্রশংসার কথা চিন্তা করে স্বাদ গ্রহণ করা

তাই প্রশংসামূলক একটি কথা যা তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে তা আর দ্বিতীয়বার শোনা হবে না। এখন এটা হতে পারে যে, আপনি বসে বসে ভাবতে থাকুন, আহা! কতো মধুর সময় ছিল তখন যখন অমুক আমাকে এই কথা বলেছিলো। আর তা শুনে আমার দারুণ আনন্দ লেগেছিলো। একথা ভেবে ভেবে স্বাদ নিতে থাকুন। 'জাহ' এর পূর্ণ হাকীকত এটাই। এছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য এটা তো খেয়ালী পোলাও ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কোন সারবত্তা নেই, শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া বস্তু।

মর্যাদার মোহ দূর করার উত্তম ব্যবস্থা

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) 'জাহ' এর ব্যাপারে একটি কবিতা পড়তেন, যা স্মরণ রাখার মতো এবং মর্যাদার মোহ দূর করার উত্তম ব্যবস্থাপত্র। তিনি বলতেন :

گرد دہو جاتی ہے جب جاہ دنیا جس کے بعد
اک ذراسی بات ہے ای دل کہ پھر کیا گیا اسکے بعد

অর্থাৎ, মানুষ যদি ভাবে এরপরে কী হবে? তাহলেই সমস্ত মর্যাদার মোহ শেষ হয়ে যাবে। কেননা, সে যদি আমার প্রশংসা করেও দেয় এবং আমাকে ভালো বলেও কিন্তু তার প্রশংসা ও ভালো বলার ফলাফল কী? কিছুই নেই। এই প্রশংসার দ্বারা কি পয়সা পাওয়া যাবে? কোন সম্পদ? কোন জান্নাত পাওয়া যাবে? বা জাহান্নাম থেকে মুক্তির আদেশ? কী পাওয়া গেলো? কিছুই পাওয়া গেলো না। তাই মানুষ একথা যেন ভাবে, কেউ আমার প্রশংসা করলে তাতেই বা কী? না করলেই বা কী?

মাখলুকের প্রশংসার কীইবা মূল্য?

প্রশংসাও এমন মানুষ করেছে যার প্রশংসার ব্যাপারে না কোনো বিশ্বাস আছে না নিন্দার ব্যাপারে কোন নিরাপত্তা আছে। আজ প্রশংসা করছে, কাল হয়তো গালি দিবে। আজতো আপনার প্রশংসা করে ফেললো, কাল যখন আপনার কথা তাঁর মনের বিপরীত হবে তখন সব প্রশংসা মিলিয়ে যাবে আর আপনাকে গালি দিতে থাকবে। যে প্রশংসা করে, সে কখনো না কখনো মন্দও বলে। যে সকল লোক না প্রশংসার ক্ষেত্রে কোনো সীমারেখার তোয়াক্কা করে, না নিন্দার ক্ষেত্রে। অতএব কারো প্রশংসায় খুশী হওয়া একেবারেই বেহুদা।

সুন্দরী কণে তো সে যাকে স্বামী পসন্দ করবে

বরং ঐ জাতের প্রশংসা হাসিলের চেষ্টা করো যার সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। কোন এক কবিতার একটি লাইন হচ্ছে–

پیا جسے چاہے سہاگن وہی

پیا অর্থ প্রেমাস্পদ আর سہاگن অর্থ, যার মাত্র বিয়ে হয়েছে এমন নারী। অর্থাৎ, নববধু। এই লাইনের ব্যাখ্যা হলো, (স্বার্থক) নববধু তো সেই যাকে স্বামী পসন্দ করে। এ পংক্তির পিছনের প্রেক্ষাপট হলো একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছিলো তখন তাঁর বান্ধবীরা তাকে সাজাচ্ছিলো, এ অবস্থায় তাকে যেই দেখছিলো, সেই বলছিলো খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি তো খুব সুন্দরী। ঐ কণে সবার প্রশংসাই শুনছিলো কিন্তু কোনো প্রকারের আনন্দ প্রকাশ করলো না। কেউ বলে ফেললো, তোমার বান্ধবীরা তোমার এত প্রশংসা করছে কিন্তু তুমি মোটেও খুশি হচ্ছো না কেন? মেয়েটি বললো, বান্ধবীদের প্রশংসাতো ভালোই লাগছে কিন্তু এতে আমার কী লাভ? হাঁ যার জন্য আমাকে সাজানো হচ্ছে সে যদি আমার প্রশংসা করে

এবং বলে তুমি খুব সুন্দরী, তবে লাভের কথা, তোমাদের প্রশংসাতো শূন্যে মিলিয়ে যাবে। অতএব সুন্দরী কণেতো সেই যাকে তার স্বামী পসন্দ করবে।

মাখলুকের প্রশংসা দ্বারা জান্নাত লাভ করা যাবে না

এ কথাটা ভাবো! যদি কেউ তোমার প্রশংসা করে যে, তুমি তো খুব ভালো নামায পড়ো, খুব খুশু-খুযুর সাথে নামায পড়ো, মাশাআল্লাহ তুমি বড় নেক মানুষ, বড় পরহেযগার মুত্তাকী, বড় বুযুর্গ, তাহলে লোকের এই প্রশংসায় কি তুমি জান্নাত পেয়ে যাবে? যদি তোমার আমল খারাপ হয়, তাহলে তুমি কি মানুষের প্রশংসার কারণে নাজাত পেয়ে যাবে? শুধু এজন্য যে, যায়েদ, উমর, বকর তোমার প্রশংসা করেছিলো? স্পষ্ট যে যখন তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তখন এই লোকদের প্রশংসার কোন ওযন হবে না, সেখানে তো তোমার নিজের আমলের ওজন হবে যে সব ভালো আমল তুমি করেছিলে।

আলেমের দ্বারা জাহান্নাম উদ্বোধন হবে

হাদীস শরীফে এসেছে সর্বপ্রথম যার দ্বারা জাহান্নামের (শাস্তির) সূচনা করা হবে সে একজন আলেম হবে। যে তার ইলমকে মর্যাদা হাসিল করার জন্য ব্যয় করেছে। ঐ আলেমকে বলা হবে 'তুমি তো প্রসিদ্ধি লাভের জন্য ইলম হাসিল করেছো আর সেই প্রসিদ্ধিতো তুমি দুনিয়াতে পেয়েছো, এখন আমার কাছে তোমার কোন পাওনা নেই।' (নাউযুবিল্লাহ) আর দুনিয়াতেতো কোন প্রসিদ্ধি অর্জিত হয়নি। কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর পর মালিকুল মুলক থেকে যদি এই সুসংবাদ পাওয়া যায়:

يَآ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

অর্থ, হে প্রশান্ত হৃদয়-(এর অধিকারী)

তাহলে তো সফল। নয়তো যায়েদ, ওমর, বকরের বড় আলেম, মুত্তাকী-পরহেজগার বলা কোন কাজে আসবে না।

আলেমের জন্য স্বীয় নফসের তত্ত্বাবধান করা জরুরি

মনে রাখবেন, এই ইলমের মধ্যে বড় হওয়ার শান রয়েছে। যদি কারো কাছে ইলম থাকে তো তাঁর সুগন্ধি ছড়াবে এবং মানুষ তাঁর অভিমুখী হবে। এর ফলে মর্যাদার মোহের বিরাট আশঙ্কা থাকে। তাই যে ইলম অন্বেষণরত বা তাকে আল্লাহ তাআলা ইলম দান করেছেন তাহলে তাঁকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে ঝেড়ে মুছে কদম রাখতে হবে। কেননা, যে কোন সময় শয়তান এসে মেরে দিতে

পারে। এক ব্যক্তি ভালো মতো ইখলাসের সাথে কাজ করে কিন্তু মাঝপথে নফসের ওয়াসওয়াসা তাকে গোমরাহ করে দেয়। তাই প্রতিটি মুহূর্ত নফসের তত্ত্বাবধান করা জরুরি, যাতে কোথাও গিয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে না পড়ো, আর যদি নিজে নফসের তত্ত্বাবধান করতে না পারো তাহলে কোনো শায়েখের দ্বারা করানো জরুরি। তাহলেই এই ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব হবে।

'নেতা'র পরিচয়

বর্তমানে উলামা, বক্তাগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য একটি বস্তু বড় ফিতনার আকার ধারণ করেছে, তাহলো 'জনগণের সন্তুষ্টি'। অর্থাৎ, এ বিষয় দেখা যে মানুষ কোন কথায় সন্তুষ্ট হবে? পরে সেই কাজ করা হবে যা দ্বারা তাঁরা সন্তুষ্ট হবে, যাতে জনগণের মধ্যে পরিচিতি ঘটে যে অমুকে খুব ভালো কাজ করেছে। নেতা তো তাকে বলে যে পথ দেখাবে, আর মানুষ তাঁর পিছে চলবে। প্রকৃত নেতা তো সেই যে মানুষকে পথ দেখায় বলে দেয়, তোমরা ভুল পথে আছো, সঠিক পথ এটা, তোমরা এখানে চলে আসো।

বর্তমান যুগের নেতৃবৃন্দ

আজ নেতার অর্থ বদলে গেছে। এখন নেতা সেই ব্যক্তি যে জনগণের পিছে চলে, যে কাজে তাঁরা সন্তুষ্ট সেই কাজ নেতা করে। অথচ প্রকৃত পক্ষে ঐ নেতা জানে এই জনসাধারণ ভুল পথে আছে। তারপরও তার এই সাহস নেই যে, তাঁদেরকে বলবে যে, তোমরা ভুল পথে চলছো, আমি যে পথের কথা বলছি সেদিকে আসো। আজ একথা বলার সাহস নেই। কারণ সে জানে যদি আমি এই কথা বলি, তাহলে আমার দিকে পঁচা ডিম মারবে, কলার ছিলকা গায়ে নিক্ষেপ করবে, আমার বদনাম করবে। আর যেহেতু জনগণের সন্তুষ্টি অর্জন করাই নেতার উদ্দেশ্য, তাই সে জনগণের ভুল কথাকেও সহ্য করে নেয়, যাতে তাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.)-এর ফরমান

হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) বড় যুতসই কথা বলতেন। বলতেন। তিনি বলতেন, কখনো জনগণের পঁচা ডিম ও কলার ছিলকা আর গালি খাওয়ার থেকে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে জেলে যাওয়া এবং সেখানে বন্দী অবস্থায় থাকাও আসান। কারণ, জেলে গিয়ে এ ক্লাস যদি পাওয়া যায় তো নিরাপদেই সময় পার করা যাবে। আর যখন জেল থেকে বের হবে তখন 'মুজাহিদে মিল্লাত' উপাধী জুটে যাবে। অপরদিকে জনগণের মর্জির বিপরীত

কোন কথা বলা বড় মুশকিলের কাজ। কেননা, তাঁদের বিরুদ্ধে কথা বললে, কখনো তারা হত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। প্রসিদ্ধ ফকীহ হযরত হাকেম শহীদ (রহ.) এভাবেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন, যে তিনি একবার জনগণের বিপক্ষে কোন কথা বলেছিলেন তখন জনতার ভীড় তার উপর চড়াও হয় এবং শহীদ করে দেয়। যদি এতো মারাত্মক কিছু না হয়, তো অন্তত বদনাম হওয়ার এবং গ্রহণযোগ্যতা হারানোর ভয় তো আছেই।

এগুলো সব পদলিপ্সার শাখা

যাইহোক, নেতার মধ্যে জনতার পিছে চলার রোগ দেখা দিয়েছে। এমনকি আলেমগণও ঐ কথা বলতে ইতস্তত করেন যাতে জনগণের দৃষ্টিচ্যুত হয়ে যেতে পারেন। এগুলো সবই পদলিপ্সার শাখা। এজন্য সকল কাজে জনতার প্রশংসা অর্জন করা উদ্দেশ্য। হয় এজন্যই ঢিল দেওয়া হয়, কথা উল্টো করে বলা হয় হককে বাতিল, বাতিলকে হক মনে করা ও বলা হয়। এগুলো সবই কিছুর বুনিয়াদ পদলিপ্সা।

সৃষ্টির সন্তুষ্টির চিন্তা মাথা থেকে বাদ দাও

অতএব, সবার আগে কাজ হলো সৃষ্টির সন্তুষ্টির চিন্তা মাথা থেকে বাদ দাও এবং দিলের মধ্যে একথা বসাও যে, যদি এই সৃষ্টি সকলেই রাজি হয়ে যায়, তাহলেই বা কী? আর নারাজ হয়ে গেল তাতেই বা কী? রাজি তো আল্লাহকে করতে হবে। যেদিন আল্লাহ দিলের মধ্যে একথা পয়দা করে দিবেন, সেদিন এইসব পদলিপ্সা ও মর্যাদার মোহের ফিতনা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তাঁর ফলে ঐ অবস্থা সৃষ্টি হবে যাকে হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেছিলেন, 'প্রশংসাকারী আর নিন্দুক বরাবর হয়ে গেছে।' অর্থাৎ, প্রশংসাকারী এবং নিন্দুক সমান। কারণ, তিনি জানেন, এদের প্রশংসায় না আমার কোন কাজ দিবে, না তাদের নিন্দা আমার কোন ক্ষতি করবে।

পদলিপ্সা অন্তর থেকে বের করার ফিকির পয়দা করো

কিন্তু একথা তো বলা সহজ এই মাকাম ঘষা-মাজা করার পরেই হাসিল হয়। যখন মানুষ কারো সামনে দলিত-মথিত হয় তখন এই নাপাকী দিল ও দেমাগ থেকে বের হয়। এটি বের করার জন্য কিছু মুজাহাদা জরুরি। কিন্তু সর্বপ্রথম কথা হলো, এই ফিকির পয়দা করা যে, আমাদের দিল থেকে পদলিপ্সা বের করা দরকার। যখন এই ফিকির পয়দা হবে তখন মুজাহাদার তাওফীকও লাভ হবে। কারো কাছে গিয়ে ইসলাহ করানোর ফিকিরও পয়দা হবে। আর যদি এই

ফিকিরই না হয়, গাফলত থাকে এবং মাথায় একথা বদ্ধমূল থাকে যে, আমরা আলেম মানুষ। আমাদের কাছে মানুষ আসবে হাতে চুমা খাবে, যদি মাথায় একথা বদ্ধমূল থাকে আর এটাকেই নিজের জীবনের মাকসাদ বানিয়ে নিয়ে থাকে, এর বিপরীত ফিকির না করে, তাহলে যত কিছুই করানো হোক না কেন, সব ব্যর্থ হবে। না ইলম কোন কাজে আসবে, না আমল। কারণ, ইখলাসই তো শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফযল ও করমে আমাদের মধ্যে এই ফিকির পয়দা করে দিন এবং আমাদেরকে গাফলত থেকে হেফাযত করুন এবং ইখলাস দান করুন এবং সম্পদ ও পদলিপ্সা আমাদের অন্তর থেকে দূর করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

পয়ষট্টিতম মজলিস

কোন ধরনের ‘জাহ্’ ক্ষতিকর

কোন ধরনের 'জাহ' ক্ষতিকর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - اَمَّا بَعْدُ!

এক মালফূযে হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

> ঐ পদমর্যাদা ক্ষতিকর যা চেয়ে নেওয়া হয়। চাওয়া ছাড়া হলে তা ক্ষতিকর নয়। এতে আল্লাহর নুসরত আছে। যদি মানুষ তাঁর প্রতি হিংসা করে এবং বদনাম করতে থাকে তাহলে আল্লাহ তাকে শক্তিশালী করে দেন, যাতে কোনো কষ্ট তাঁর কাছে কষ্ট না থাকে। সাথে সাথে ঐ বিপদ থেকে যে বাতেনী উন্নতি হয় আল্লাহ তা কলবে প্রকাশ করে দেন এবং প্রতিটি ঘটনায় হেকমতের উপর অবগত করে দেন। তখন তাঁর কোনো কষ্ট থাকে না। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৮২)

গতকাল বলেছিলাম যে, পদলিপ্সা বাতেনী ব্যাধিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। প্রভাব-প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা এগুলো এমন বিষয় যা অতি ক্ষণস্থায়ী এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল। এর চিকিৎসা হল, এগুলোর ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং তা অন্বেষণের চেষ্টা করার বোকামী সব সময় স্মরণ করতে থাকা।

সমস্যা দূর করতে 'জাহ' জরুরি

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, সব 'মর্যাদা' ক্ষতিকর নয়। আর সব মর্যাদা ও প্রভাব অপসন্দনীয়ও নয়। বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত তা মানুষের জন্য জরুরি। বিশেষ করে সমস্যা দূর করার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু মর্যাদা ও প্রভাব প্রয়োজন তা যদি না থাকে, তাহলে মানুষ তাকে কষ্ট দিবে, জুলুম করবে আর তার কাছে জুলুমের প্রতিকার করার কোনো ব্যবস্থাই থাকবে না। এটা পসন্দনীয় নয়। এটুকু প্রভাব থাকা দরকার যাতে মানুষ তার কথা শোনে এবং তা দ্বারা নিজের সমস্যা দূর করতে পারে।

চেয়ে নেওয়া মর্যাদা ক্ষতিকর

ঐ মর্যাদা ক্ষতিকর যা মানুষ প্রার্থনা করে ও চেষ্টা-তদবির করে অর্জন করে। যেমন কেউ কোনো পদ লাভের চেষ্টা করলো যে, এতে আমার সুনাম হবে তাহলে এটা ক্ষতিকর। কিন্তু কাউকে যদি আল্লাহ তাআলা তাঁর চাওয়া ব্যতীত চেষ্টা-তদবীর ব্যতীত মর্যাদা দান করেন কিংবা কোনো পদে সমাসীন করে দেন কিংবা মানুষের মধ্যে তাঁকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন, তাহলে এটা ক্ষতিকর নয়; বরং উপকারী।

নেতৃত্বের ব্যাপারে হাদীস

এজন্য হাদীস শরীফে নেতৃত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَا تَسْئَلِ الْاَمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ اُتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا

অর্থাৎ, নেতৃত্ব চেয়ো না, যদি তা তোমার চাওয়া ছাড়া আসে তাহলে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি চাওয়ার কারণে আসে তাহলে তোমার উপরই দায়িত্ব চাপানো হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যই আসবে না। কেননা, তুমি তো নিজেই তা চেয়েছ, এখন নিজেই তা সামলাও। আমার পক্ষ থেকে কোন সাহায্য নেই।

আল্লাহ রক্ষা করুন। যদি তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাদেরকে সাহায্য না করার ঘোষণা দেন তাহলে এর চেয়ে বড় আযাব আর কী হতে পারে।

বড়দের পক্ষ থেকে দেওয়া পদ

এজন্য যত পদ ও দায়িত্ব আছে তা হাসিল করতে যাওয়া উচিত নয়। তবে যদি চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ দান করেন তাহলে তা কবুল করুন এবং ভাবুন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ইনশাআল্লাহ এই পদ ও দায়িত্ব ক্ষতিকর হবে না। সুতরাং একথা মনে রাখা দরকার যে, বড় কেউ যদি কোনো পদে কাউকে বসিয়ে দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা উচিত আর নিজের পক্ষ থেকে আবেদন করা যে আমাকে অমুক দায়িত্ব দিন, অমুক পদ দিন এটা অনুচিত। এতে তাহলে যেমন বে বরকতী রয়েছে তেমনি কখনো তা নাফরমানী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.)-এর একটি ঘটনা

আমার ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) বলতেন, আমি যখন দারুল উলূম দেওবন্দে মুদাররিস ছিলাম তখন মানতেকের একটি সূক্ষ্ম কিতাব 'মীর যাহেদ' এক উস্তাদকে দেওয়া হল। তিনি সাদাসিধা মানুষ ছিলেন। ছাত্ররাও খুব দুষ্ট ছিল। কিছু ছাত্র এমন হয় যারা উস্তাদকে পেরেশান করার চেষ্টা করতে থাকে। বিশেষ করে যদি উস্তাদ সাধাসিধে হন, তাহলেতো কথাই নেই। ছাত্ররা তাকে অস্থির করে তুলল। ঐ উস্তাদ দরখাস্ত করলেন যে, ছাত্ররা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাকে অন্য কোনো কিতাব দিন। হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) তখন দারুল উলূমের সদর ছিলেন। এ ধরনের বিষয় তার নিকট পৌঁছত। যখন তাঁর নিকট দরখাস্ত পৌঁছলে তখন তিনি উস্তাদদের মজলিস ডাকলেন এবং সেখানে বিষয়টি উত্থাপন করলেন যে, 'মীর যাহেদ' কে পড়াবে? ছাত্ররা খুব দুষ্ট, প্রশ্নও খুব বেশি করে, তাই এমন কেউ দায়িত্ব নেওয়া দরকার যে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। যেহেতু আগের উস্তাদ পড়ানো থেকে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন তাই এর প্রভাব অন্যদের উপরও পড়েছিল। কেউ নেওয়ার জন্য তৈরি হল না। শেষ পর্যন্ত হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে বললেন, মওলভী শফী! তুমি এই কিতাব পড়াবে? আমি বললাম, হযরত! আমার যোগ্যতা যদি জানতে চান তাহলেতো আমি মীযানুস সরফ পড়ানোরও উপযুক্ত নই। আর যদি আপনি পড়াতে দেন তাহলে বুখারী শরীফও দিতে পারেন। অর্থাৎ, আপনার পক্ষ থেকে যদি দেওয়া হয় এবং দুআ করেন, তাহলে আমি তাও পড়িয়ে দেব। কী চমৎকার উত্তর দিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, তাহলে তুমিই পড়াও।

চাওয়া ব্যতীত পাওয়া বস্তু

যাইহোক, হযরত ওয়ালিদ ছাহেব (রহ.) যে কথা বললেন যে নিজেকে যোগ্য মনে করি না কিন্তু যখন কোনো কাজ বড়রা অর্পণ করেন তো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে। এ অবস্থায় আল্লাহর রহমতের আশা রাখি যে, আল্লাহ এতে তাওফীকও দিবেন এবং নুসরত করবেন।

অতএব, আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করুন। এখন যে কাজ করবেন তার পেছনে না নিজের যোগ্যতার অহংকার কার্যকর হবে আর না তাতে পদলিপ্সা থাকবে। না তাতে অহংকার হবে, না আত্মগরিমা, না লোক দেখানো হবে।

چیز یکہ بے طلب رسد آں دادہ خداست
آں را تو رد مکن کہ فرستادۂ خداست

অর্থাৎ, চাওয়া ছাড়াই যা পাওয়া যায় তা আল্লাহর দান। তাকে ফিরিয়ে দিও না। কারণ, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো।

যাইহোক, এ ধরনের মর্যাদা ও প্রভাব যা চাওয়া ব্যতীত অর্জিত হয় তা নিন্দিতও নয়, ক্ষতিকরও নয়।

আল্লাহর ওলীগণ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন

যত ওলী, বুযুর্গ, আলেমে দ্বীন গত হয়েছেন সকলেই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁদের প্রসিদ্ধিও ছিল, লোকেরা সম্মান করত, হাত-পা চুম্বন করত, আল্লাহ তাদের এমন ইজ্জত ও সম্মান দান করতেন যা কোনো বাদশাহেরও থাকত না।

হিন্দুস্তানের উপর একজনের রাজত্ব

এক ইংরেজ হিন্দুস্তানের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। সেখানে সে লিখেছে, হিন্দুস্তানের শাসক যেই হোন না কেন প্রকৃত শাসক একজনই। তিনি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহ.)। অর্থাৎ, মানুষের দিলের উপর যে রাজত্ব সেটা তাঁরই।

দিলের বাদশাহ

যাইহোক, যে মর্যাদা আল্লাহ তাআলা ওলী-বুযুর্গদেরকে দান করেছেন তা বড় বড় বাদশাহেরও নসীব হয়নি। তাদের পক্ষে এ রকম সম্মান লাভ করা সম্ভবও নয়। কারণ, তারা তো বাইরের জগতের বাদশাহ, অর্ন্তজগতের বাদশাহ হলেন অলী-আওলিয়া।

বাংলাদেশের এক বুযুর্গ

বাংলাদেশের সিলেট শহরে এক বুযুর্গের মাযার রয়েছে। যাকে 'দরগাহ শরীফ' বলে। এখন ঐ এলাকার নামও দরগাহ। ওখানকার এক মসজিদের নামও দরগাহ। ঐ বুযুর্গের নাম হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রহ.)। বড় মাপের ওলী ছিলেন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর সমকালীন। বলা হয়ে থাকে যে, সিলেটের বিজয় প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতেই হয়েছিল। তিনি ইয়ামেনের বাসিন্দা ছিলেন এবং চিরকুমার ছিলেন। ইয়েমেন থেকে এখানে এসে জিহাদ করেন। এখন অবস্থা এই যে, বাঙ্গালীর যে ভক্তি ও মহব্বত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রতি রয়েছে, তা আর কারো প্রতি হতে পারে না। একবার শবে বরাতে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। তার মাজারে যিয়ারতকারীদের এমন ভীড় ছিল যে, কয়েক মাইল জুড়ে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না।

এ রকম মর্যাদা ক্ষতিকর নয়

যাইহোক, এঁরা মানুষের অন্তরের উপর রাজত্ব করেন। তাই তাঁদের চেয়ে অধিক মর্যাদা দুনিয়াতে আর কারো নেই। কিন্তু এই মর্যাদা যেহেতু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিনা প্রার্থনায় লাভ হয়, তাই এটা ক্ষতিকর তো নয়ই; বরং উপকারী হয়ে যায়। এর দ্বারা দ্বীনের কালিমার প্রচার-প্রসার ঘটে, মানুষের ইসলাহ হয় এবং ফয়েয ছড়ায়। তাই নিজে প্রসিদ্ধি কামনা করবে না এবং এই ফিকির করবে না যে, আমি প্রসিদ্ধ হয়ে যাব।

খ্যাতি থেকে আত্মরক্ষা করুন

খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করবে আল্লাহ তাকে আখেরাতে লাঞ্ছনার পোশাক পরিয়ে দিবেন।

প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করার অর্থ হল, প্রসিদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টা করা।

খ্যাতি মানুষকে বিড়ম্বনায় ফেলে

সামান্য চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, খ্যাতি, কামনা করার মতো কোনো বিষয় নয়, বরং এটা তো মানুষকে পেরেশানিতে ফেলে দেয়, মানুষ যখন খ্যাতিমান হয় তো সর্বদা সে চিন্তাগ্রস্ত থাকে। একদণ্ড শান্তিতে ঘরে থাকতে পারে না। একজন এই কাজের জন্য আসে, আরেকজন আরেক কাজ নিয়ে। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আটকা থাকে। কোনো কাজ সে করতে পারে না। আর যে প্রসিদ্ধ নয় তাঁর কাছে কেউ আসে না, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা চায় তাই করে।

খ্যাতি কামনা করা

আমার এক বন্ধু চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার মনে চায় আমারও প্রভাব-প্রতিপত্তির গণ্ডি গড়ে উঠুক। আর কিছু ভক্ত হোক।' আমি তাকে উত্তর দিলাম, তোমার অন্তরে মুসীবতে পড়ার শখ জন্মেছে! এটাতো এক মুসীবত! যখন তোমার প্রভাব-প্রতিপত্তির গণ্ডি গড়ে উঠবে, তখন কিন্তু তুমি না দিনে শান্তি পাবে, না রাতে। এটা কোনো চাওয়ার, জিনিস হল? হাঁ আল্লাহ যদি চাওয়া ছাড়া দিয়ে দেন তখন তার দাবি পুরা করবে। কিন্তু নিজে নিজে এটা চাওয়া যেন কোনো ষাড়ের কাছে আবেদন করা যে, আমাকে শিং দিতে গুতা মার। খ্যাতি চাওয়া আর মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ হওয়ার কামনা করার হাকীকত এটাই।

আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন

আমাকে জিজ্ঞাসা কর। না ভোরে শান্তি, না সন্ধ্যায় শান্তি, না রাতে আরাম। আমার বন্ধু-বান্ধব খুব বেশি নয়। কিন্তু তবুও কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে লোকেরা চলে আসে। একদিকে এই ব্যস্ততা। এরপর বেশি যেটা হয়, তাহল লোকেরা তাদের ব্যক্তিগত ও জটিল বিষয় নিয়ে আসে এবং এসেই পেরেশানী প্রকাশ করে যে সে কত মুসীবতে রয়েছে। তাদের কথা শুনে তবিয়তের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে যে, এই বেচারা এই মুসীবতে, ঐ ব্যক্তি ঐ পেরেশানীতে আছে। ফল এই দাড়ায় যে, সর্বদা অন্তর পেরেশান থাকে।

নির্জন ব্যক্তি শান্তিতে থাকে

যে নির্জনে থাকে তাকে কেউ জানে না, তার কাছে কেউ আসে না, একাকী আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখে, সে অত্যন্ত আনন্দে আছে। এই জীবনের কথা কী বলব। সুতরাং খ্যাতি, চাওয়ার মতো কোনো বস্তু নয়।

খেদমতের হক আদায় করুন

আর যদি আল্লাহর নিজের পক্ষ থেকে কাউকে খ্যাতি দান করেন তাহলে তার হক আদায় করুন। অহংকার করা উচিত নয় যে, আরে! আমি এত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছি! আমার কাছে এত লোক আসে! বরং এর হক পুরোপুরি আদায় করুন আর ভাবুন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এত লোকের খেদমত করতে দিয়েছেন, এতো লোকের খাদেম বানিয়েছেন। সুতরাং এই খেদমতের হক আদায় করুন।

দুনিয়াবী দায়িত্বের অবস্থা

আমাদের শায়খ ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বড় ভালো কথা বলতেন যে, দুনিয়ার যত পদ আছে সবগুলোর অবস্থা এই যে, প্রথমত এগুলো হাসিল করাই নিজের এখতিয়ারে নেই। যদি কোনোটা মিলেও যায় তাহলে শত শত লোক তাকে হিংসা করা শুরু করে এবং তাকে ঐ পদ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। উদাহরণত, তোমার অন্তরে এই কামনা জাগল যে, আমি প্রধানমন্ত্রী হব। এখন প্রধানমন্ত্রী হওয়া তো তোমার এখতিয়ারে নেই। বরং অন্যান্য চাকুরীর চেয়ে এটা অর্জন করা কঠিন। কেননা চাকুরি দানকারী কর্তৃপক্ষ এক হয়। এখন তাকে তোষামোদ করে বা ঘুষ দিয়ে খুশি কর সে তোমাকে চাকুরি দিয়ে দিবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীত্বতো এমন পদ যা দেওয়ার লোক একজন নয়। কোটি কোটি। এখন কোটি কোটি লোককে তোষামোদ কর, যে তারা যেন তোমাকে ভোট দেয় এবং প্রত্যেককে রাজী করানোর চেষ্টা কর। এখন কতটুকুই রাজী করাতে

পারবে। তাদের রাজী হওয়াতো তোমার আওতায় নেই। এরপর যদি কোনোভাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েও গেলে তাহলে এখন শত সহস্র লোক তোমাকে সরানোর ফিকিরে থাকবে। এ কেন প্রধানমন্ত্রী হল, প্রধানমন্ত্রী তো আমার হওয়ার কথা। সুতরাং হিংসা করার জন্য অসংখ্য লোক, এ পদ থেকে হঠানোর জন্যও অসংখ্য লোক থাকবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেও সব সময় এই চিন্তায় থাকতে হয় যে, না জানি কখন সংসদে অনাস্থা বিল পাশ হয়ে যায়, আর আমার প্রধানমন্ত্রীত্ব শেষ হয়ে যায়। এজন্য সর্বদা তাকে সংসদের সদস্যদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। সুতরাং যখন তুমি প্রধানমন্ত্রী হবে তখন তোমার প্রাপ্তি হবে মানুষের হিংসা ও চক্রান্ত। দুনিয়ার সকল পদের অবস্থাই এ রকম।

খাদেমের পদ গ্রহণ করুন

অতঃপর হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলেন, আমি তোমাদের এমন পদের কথা বলব যা লাভ করা তোমাদের সবার পক্ষেই সম্ভব এবং এজন্য কেউ তোমাকে হিংসা করবে না এবং কেউ তোমাকে ঐ পদ থেকে নামানোর চেষ্টাও করবে না। ঐ পদ হল খাদেমের পদ। অতএব তোমরা খাদেম হয়ে যাও। খাদেমের পদ গ্রহণ কর। আমি খাদেম হয়ে মানুষের খেদমত শুরু করে দিব। কে আমাকে বাধা দেবে? কেউ না। কেউ বলবে না যে সে কেন খাদেম হল? আর এখান থেকে বরখাস্ত হওয়ারও আশঙ্কা নেই। এটা তোমার ইচ্ছাধীন পদ।

অন্য পদে থেকে খেদমতের জযবা

যখন তুমি কোনো দুনিয়াবী পদের অধিকারী হবে সেটাকেও খেদমতের একটা শাখা মনে কর। যতক্ষণ এই পদ থাকবে আমি মানুষের খেদমত করতে থাকব, আর যখন তা থাকবে না, তখন অন্য পদ্ধতিতে খেদমত শুরু করব। এভাবে খাদেমের পদ কখনোই তোমার হাত থেকে ছুটবে না। এজন্য যখন কোনো পদ লাভ হবে তখন আল্লাহর শোকর করে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করো এবং নিজেকে খাদেম মনে করো।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখন প্রশ্ন হল, আমরা যখন কোনো ভালো কাজ করব, তখন লোকজন অবশ্যই এর প্রশংসা করবে আর তাতে খুশি লাগবে। কেননা মানুষের স্বভাবই এই যে, কেউ তার প্রশংসা করলে সে খুশি হয়। অতএব যে ভালো কাজই করি না কেন তাতে পদমর্যাদার লোভ থাকছেই।

এর উত্তর এই যে, কাজের পূর্বে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করুন যে, হে আল্লাহ! আমি এই কাজ করছি আর লোক এই কাজে প্রশংসা করবে। এতে তো

আমার অন্তরে খুশি লাগবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রশংসা আমার নয় আপনার। কারণ, যা কিছু আমি করব তা তো আমার ক্ষমতায় নয়, আপনার তাওফীকে করব। অতএব সব প্রশংসা তো আপনারই, আমার কিছু নয়। তাই হে আল্লাহ! এই প্রশংসাকে আমার জন্য ফিতনার কারণ বানাবেন না।

নিজের প্রশংসা শুনে হাসতেন

আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি যে, এক বুযুর্গের অভ্যাস ছিল যখন কেউ তাঁর প্রশংসা করত বা প্রশংসামূলক কোনো কথা বলত, যেমন, কেউ বলল হযরত! আপনি বহুত বড় আলেম। তিনি শুনে খুব খুশী হতেন, তাকে বাহবা দিতেন এবং বলতেন, তুমি ঠিক বলেছ। একজন তাঁকে প্রশ্ন করল হযরত! কারো প্রশংসা করা হলে সে লজ্জা পায়, কিন্তু আপনাকে ব্যতিক্রম দেখছি। আপনার প্রশংসা করা হলে আপনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাকে বাহবা দেন। মনে হয় আপনার প্রশংসা করানোর খুব ইচ্ছা। এটা তো ঠিক নয়।

এটা তো আমার আল্লাহর প্রশংসা

বুযুর্গ উত্তর দিলেন, এই প্রশংসাকারী আসলে অবুঝ। সে যে প্রশংসা করছে তাতো আসলে আমার প্রশংসা নয়; বরং আল্লাহর প্রশংসা। তখন আমি এই ভেবে খুশি হই যে, এ লোকটি আমার আল্লাহর প্রশংসা করছে। তাই তাঁকে বাহবা দেই। আমি তো কিছুই না। আমার অস্তিত্বই বা কী? আমার যোগ্যতাই বা কী? আমার মধ্যে প্রশংসাযোগ্য কিছুই নেই। মনে কর, এক লোক একটা দেওয়ালের প্রশংসা করে বলছে এই দেওয়ালটা খুব শানদার। তাহলে এই প্রশংসা দেওয়াল নির্মাতার হয়, রাজমিস্ত্রীর হয়, তদ্রূপ যদি কেউ কোনো কিতাবের প্রশংসা করে যে এই কিতাব খুব ভালো, তাহলে কিতাবের প্রশংসা হয় না বরং লেখকের প্রশংসা হয়, কিংবা প্রকাশকের হয়। তদ্রূপ আমার যা কিছু প্রশংসা হচ্ছে তা মূলত আমার নয়। এটা তো আল্লাহর প্রশংসা, তাই আল্লাহর প্রশংসা শুনে আমি খুশি হই।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য

কুরআনে কারীম শুরু হয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা। অর্থাৎ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। এর উদ্দেশ্য হল, জগতে তোমরা যত কিছুরই প্রশংসা কর না কেন সব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রশংসা।

সুতরাং কেউ প্রশংসা করলে চিন্তা করুন, আল্লাহ আপন ফযল ও করমে আমাকে এই গুণ দান করেছেন। অতএব এই প্রশংসা আমার নয় আল্লাহর। এই চিন্তার দ্বারা খ্যাতির মোহ দূর হয়ে যায়।

অপরের প্রশংসায় আল্লাহর শোকর করুন

দ্বিতীয় কথা হল, যখন কেউ আপনার প্রশংসা করে তখন দিলে দিলে শোকর করুন যে, হে আল্লাহ! আপনার শোকর! আপনি এই লোকটার সামনে আমার ভালো দিক প্রকাশ করেছেন। তাই সে আমার প্রশংসা করছে। যদি আপনি তার সামনে আমার ত্রুটি প্রকাশ করে দিতেন তাহলে সে আমাকে ঘৃণা করতো। হে আল্লাহ! আপনার মেহেরবানী যে, আপনি আমার দোষ ঢেকে দিয়েছেন এবং গুণ প্রকাশ করেছেন।

'খ্যাতি' দ্বারা আসল উদ্দেশ্য অসুবিধা দূর করা

এক লোক হযরত থানভী (রহ.)কে চিঠি লিখেছেন যে, 'অধীনের ইচ্ছা হল অপরিচিত থাকব। কিন্তু হাদীসে এসেছে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

ইয়া আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ, আর অন্যের দৃষ্টিতে বড় বানিয়ে দিন।

এতে মানুষের কাছে সম্মানিত হওয়ার দুআর আদেশ এসেছে। এতে তো খ্যাতির স্বাদ নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা আমার ইচ্ছার খেলাফ।

এ কথার উদ্দেশ্য হল, এক লোক চিঠি লিখেছে যে, আমার তবিয়ত তো চায় যে, আমি নিরিবিলি থাকি। কোনো সুনাম-সুখ্যাতি না হোক, মানুষ আমাকে না চিনুক। কেননা, সুনামের মধ্যে খ্যাতির মোহের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু তাঁর অন্তরে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হলো, যা যৌক্তিক ছিল। প্রত্যেকের অন্তরেই তা হতে পারে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দুআর কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি দুআ এই–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

হে আল্লাহ! আমাকে নিজের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বানিয়ে দিন আর মানুষের চোখে বড় বানিয়ে দেন।

নিজের চোখে ছোট হওয়ার বিষয়টিতো বুঝে আসে। এটা বিনয়ের জন্য প্রার্থনা। কিন্তু এই দুআ করা যে, আমি যেন অন্যের দৃষ্টিতে বড় হই, এটা তো 'হুব্বে জাহ' (পদ মর্যাদার লোভ)। প্রশ্ন জাগে যে, এই দুআতে মান-মর্যাদা চাওয়া হচ্ছে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানিয়ে দিন, যাতে মানুষ আমাকে

বড় মনে করে। আর মানুষের কাছে বড় হওয়ার কামনাই তো 'মর্যাদার মোহ'। সুতরাং এই দুআর তাৎপর্য কী?

মান-মর্যাদার জায়েয স্তর

হযরত থানভী (রহ.) উত্তর দিলেন 'জাহ' বা মান-মর্যাদার দুটি স্তর রয়েছে। একটি জায়েয ও কাম্য। আরেকটি নাজায়েয ও বর্জনীয়। জায়েয স্তর কামনা করাও জায়েয। জায়েয স্তর হল, মানুষের চোখে এতটুকু মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন হওয়া যাতে সে তাদের দুর্ব্যবহার থেকে বাচতে পারে। কেননা, কেউ একেবারে হীন হয়ে পড়লে, মানুষ তাকে কষ্ট দিবে। কেউ ঠাট্টা করবে, কেউ ঢিল ছুঁড়ে পালাবে, কেউ গালি দিবে, কেউ বদনাম করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ মর্যাদা ও সম্মান কামনা করলে তা জায়েয।

একটি সূক্ষ্ম কথা

আমাদের শায়খ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী ছাহেব (রহ.) একটি সূক্ষ্ম কথা বলতেন। এক মাওলানা সাহেব নিজের এলাকায় খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। সবাই তাকে সম্মান করত। একবার তিনি কোনো গ্রামে গেলেন, রাত্রে গ্রামের নবাবের হাবেলীতে থাকলেন। রাত্রে কোনো এক সময় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কামরা থেকে বের হলেন। বাথরুম বেশ দূরে ছিল। সেদিকে যখন যাচ্ছিলেন তখন পাহারাদার মনে করল চোর এসেছে। সে লাঠি নিয়ে আসলো এবং জোরে জিজ্ঞাসা করল কে ওখানে? তিনি উত্তর দিলেন আমি একজন বড় মাওলানা। এতে পাহারাদার থেমে গেল। তিনি পরে বললেন, আমি যদি ঐ মুহূর্তে বিনয় দেখাতাম তাহলে লাঠি আমার মাথায় পড়ত। বড় মাওলানা বলে তিনি জান বাঁচালেন।

এই অবস্থায় নিজের মর্যাদা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে অন্যের হাত থেকে বাঁচানো। এজন্য এটা জায়েয ছিল। কেননা, মাওলানা সাহেব যদি বিনয় দেখিয়ে বলতেন যে, 'আমি তো এক নগণ্য মানুষ' তাহলে তাকে লাঞ্ছিত হতে হত।

মানুষের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য মর্যাদা হাসিল করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে নিজের দৃষ্টিতে ছোট বানাও কিন্তু অন্যের দৃষ্টিতে বড় বানিয়ে দাও। এর উদ্দেশ্য তাদের উপদ্রব থেকে, অনিষ্ট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। এই উদ্দেশ্যে মর্যাদা হাসিল করা খারাপ নয়। সুতরাং হযরত থানভী (রহ.) বলতেন,

> ‘খ্যাতি নিজে মাকসুদ নয়। এটা দুর্ভোগ দূর করার মাধ্যম এবং সেই দুর্ভোগ হল মানুষের উপদ্রব। তাকে দমনকারী হল মান ও মর্যাদা। কেননা এটা জুলুমকারীদের অন্যায় থেকে বাঁচায়।’ (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ১৮৩)

মোটকথা, মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মর্যাদা অর্জন করা খারাপ নয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে আমাদের সবাইকে একথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত
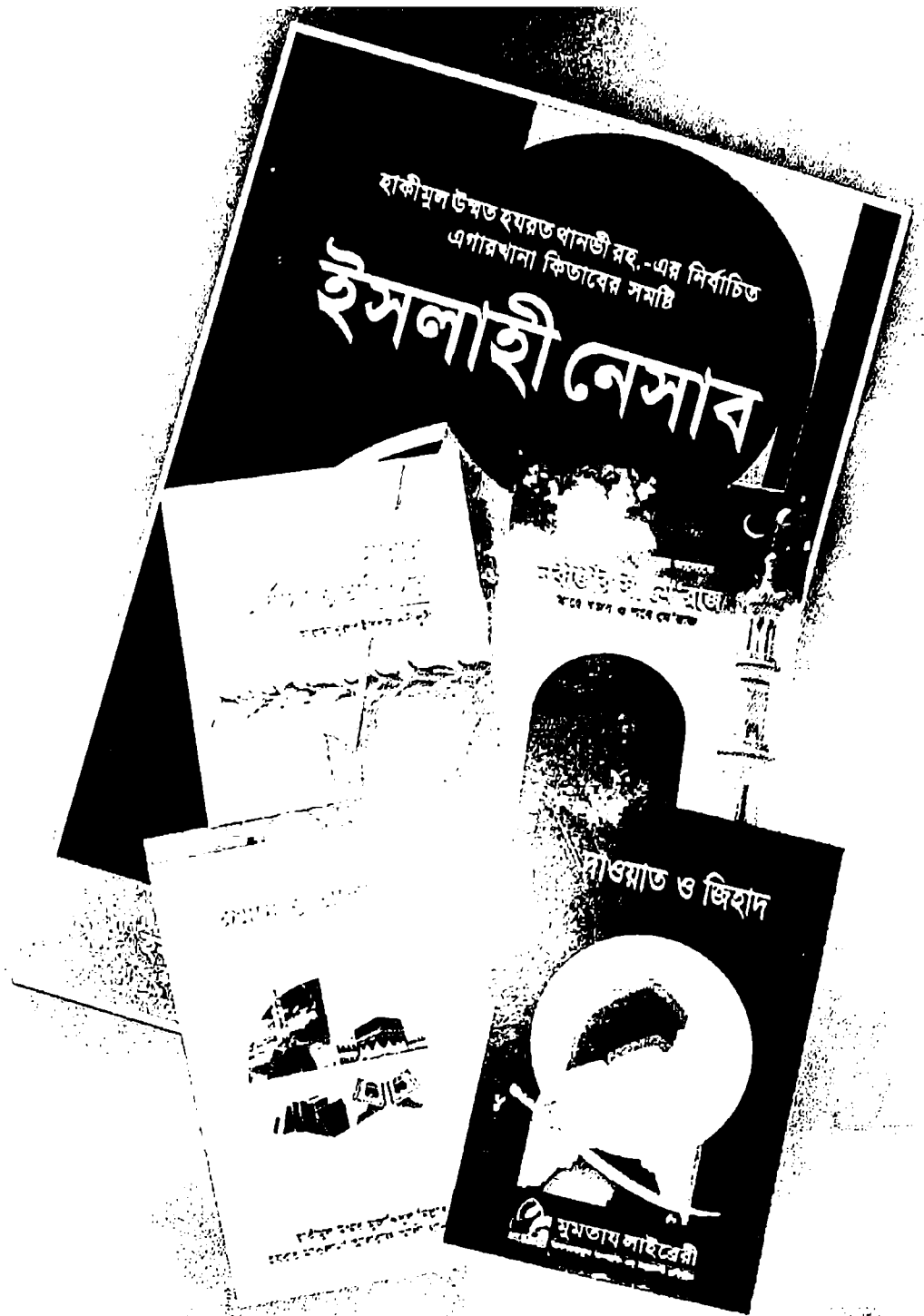
হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর নির্বাচিত
এগারখানা কিতাবের সমষ্টি
ইসলাহী নেসাব
দাওয়াত ও জিহাদ
মুমতায লাইব্রেরী
মুমতায লাইব্রেরী
মাকতাবাতুল আশরাফ-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০